উত্তর আধুনিকতা

ফাহ্‌মিদ-উর রহমান

উত্তর আধুনিকতা

ফাহ্‌মিদ উর রহ্‌মান

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিকতা
ফাহমিদ উর রহমান

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, (ডাক্তারের গলি)
ঢাকা-১২১৭,
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৬

লেখক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

বাসাপপ্র ১৩৩

প্রচ্ছদ
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক্স, ঢাকা

মুদ্রক
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ২০০ টাকা মাত্র

Uttar Adhunikata
Written by : **Fahmid Ur Rahman.**
Published by Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410, 0171581255

Price Tk.200.00 Only.

ISBN-984-485-103-3
BSP-133-2006

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মাগুরা জেলার মরহুম **মৌলভী খন্দকার তাজাম্মুল আলী** ও **মরহুমা আসিয়া খাতুন** স্মরণে যাদের পুণ্য স্মৃতি আজও আমার চেতনাকে নাড়া দেয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সাহিত্য সংস্কৃতি সামাজিক পদ্ধতি রাষ্ট্রনীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবক্ষেত্রে আধুনিকতা একটা প্রবল আকর্ষণ, শক্তি ও প্রগতির মাত্রা বহন করছে। কিন্তু আধুনিকতার হাজারো কারুকাজ তার পেছনে লুকানো সাম্রাজ্যবাদের চেহারা অস্পষ্ট করতে পারেনি। আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি এমন একটা দেশ বা জনগোষ্ঠীর নাম বলা যাবে না। তেমনি উত্তর আধুনিকতাও। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও জীবনের তাগিদে অগ্রসরতা—সবকিছু মেনে নিলেও তার পেছনের চেহারাটা ঝাপসা হয়ে যায়নি।

মানুষ এবং মুসলমান হিসাবে আমরা সত্যকে অকপটে স্বীকার করি এবং মানি তার চেহারা বদল হয় না। সত্য আধুনিক অত্যাধুনিক এবং উত্তর আধুনিকও। কিন্তু তার পেছনে কোনো কপট লুকিয়ে নেই। ঊনিশ ও বিশ শতকে যে প্রলোভন আমাদের তাড়িয়ে ফিরেছে একুশেও তার খপ্পর থেকে কি আমাদের বাঁচোয়া নেই? সত্যের যে নিখাদ চেহারা কুরআনে পেয়েছি অতি উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে তার অংশ বিশেষও নেই। আধুনিকতার পরে উত্তর আধুনিকতাও আমাদের কোনো যাদুর পরশ দিতে পারছে না। একথা আমাদের অবশ্যই বিচার করতে হবে। আমাদের নিক্তিতে আমাদের মূল্যমান ও জীবনবোধ বিচার বিশ্লেষণের মতো অন্যদেরগুলোও বিচার পর্যালোচনা করতে হবে। আবার কালেরও একটা নিক্তি আছে যেটাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয়েছে ফিতরাত। এই ফিতরাতের দৃষ্টিতেও একে উতরে যেতে হবে। ইসলামকে নূর বা আলো এবং কুফর ও জাহেলিয়াতকে জুলমাত বা অন্ধকার বলা হয়েছে। আলোর সন্ধান আমাদের করতে হবে। অন্ধকার থেকে দূরে থাকতে হবে।

'উত্তর আধুনিকতা'য় ফাহমিদ উর রহমান এই প্রচেষ্টাটি চালিয়েছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে। আমরা মনে করি তাঁর এ আলোচনা অনেক তরুণ ও প্রবীণের সামনে প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে মেলে ধরবে।

আমাদের জাতীয় চিন্তাকে আবিলতামুক্ত ও স্থিতধি করার উদ্দ্যেশ্যেই বাংলা সাহিত্য পরিষদ এ গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমরা একটি জটিল ও দুর্বোধ্য সময়ে বাস করছি, যে যুগের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বুঝতে আমাদের প্রতিনিয়ত হোঁচট খেতে হচ্ছে। মরুভূমির মরিচীকা যেমন করে মুসাফিরকে বারবার বিভ্রান্ত করে তেমনি এ যুগ আমাদেরকে রীতিমত এক সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ যুগের প্রলোভন যেমন অতিক্রম করা কঠিন তেমনি এর মুখোমুখি হওয়াও রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার। এই বই আমাদের সময়কে বোঝার একটা প্রচেষ্টা। বিশেষ করে যে যুগে ইসলাম পাশ্চাত্যের প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বইয়ে আমি ইসলামের অবস্থানে থেকে ঘটনা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সন্দেহ নেই এটি একটি কঠিন কাজ, বিশেষ করে যে বিষয়টি দেড় হাজার বছরের পুরনো এবং যা সবসময়ই ছিল বিতর্ক ও মতানৈক্যের কেন্দ্রে। কিন্তু আজকের দিনে এটি একটি জরুরি আলোচনার বিষয় হতে পারে যখন নাকি সাম্রাজ্যবাদীরা 'সভ্যতার সংঘাত' ও 'ইতিহাস ফুরিয়ে যাওয়ার' তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, বলা হচ্ছে 'প্রোজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরীর' কথা তখন এটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে বলে মনে হয়। এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে যেয়ে আমি আজকের দিনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান ইস্যুতে বিতর্কে শরীক হয়েছি এবং প্রচলিত ধারণার বাইরে একটা বিকল্প মতামত দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমার এ মতামতের সাথে সবাই একমত হবেন এমন নয়, কিন্তু উত্তর আধুনিকতার ক্ষেত্রে যে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে সেটাই আমি বুঝাতে চাই।

বলাবাহুল্য এ লেখাগুলোতে আজকের উত্তর আধুনিক বাস্তবে তথাকথিত সভ্য পশ্চিমের শোষণ-শাসনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় পাওয়া উত্তর আধুনিকতা কিভাবে ধরা দেয়, পাশাপাশি সেই পশ্চিমী আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমের ভাষায় 'মধ্যযুগীয়' ইসলাম কিভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এ বইতে যে যুক্তি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে, তা প্রচলিত উত্তর আধুনিক মূল্যবোধের সাথে হয়তো সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, কিন্তু এটাও সত্য একই সময় একই সাথে এরা পরস্পরের সাথে অবস্থান করছে। এসব যুক্তি কোন ধারাক্রম অনুসরণ করেনি, শুধু প্রকৃত ঘটনা কিংবা তার তাৎপর্যের বর্ণায়নে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন কোন ঘটনা এখানে সৃষ্টি করা হয়নি। যে সব ধারণা, মতামত ও নাম এখানে উঠে এসেছে, যে সব ছবি একটার পর একটা স্তূপীকৃত হয়েছে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতির সীমা ও ক্ষমতা পরস্পরের মধ্যে এখানে যেমন করে একাকার হয়ে গেছে– যা আসলে উত্তর আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য তারই একটি রূপচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এটি করতে যেয়ে আমার যুক্তিকে তাই অনেকের কাছে অস্পষ্ট ও অনেকটা বিপরীতধর্মী মনে হতে পারে কিন্তু আসলে এটি এ যুগের চারিত্র্য লক্ষণ। যে যুগে কিনা একই সাথে ইমাম খোমেনীর পাশে ম্যাডোনার নাম উঠে আসছে, বিন লাদেনকে বুঝতে হলে মনিকা লিউনস্কির খোঁজ নিতে হচ্ছে, বিল ক্লিনটনের যৌন কেলেংকারী ঢাকার জন্য সুদানের ওষুধ কারখানাগুলো ক্ষেপণাস্ত্রের বলি হচ্ছে সে যুগের দুর্বোধ্যতার কাছে আমরা নিতান্তই অসহায় হয়ে উঠেছি। উত্তর আধুনিকতাকে

www.pathagar.com

বুঝতে হলে আগে যুগের এই দুর্বোধ্যতার সূত্রগুলো বোঝা চাই। এ বইয়ে এ দুর্বোধ্য যুগকেই নানা দিগন্ত থেকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা যে যুগে বাস করছি সেটি চরিত্রগতভাবে হতাশা, নাস্তিকতা ও ভোগবাদকে লালন করছে। স্বভাবত এরকম বৈশিষ্ট্য ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ও বৈরিতাপূর্ণ এবং এখানেই আজকের মুসলমানদের কর্তব্য নির্ধারণের বিষয়। এখনও এ যুগের রোগ নিরাময়ে ইসলামের ভূমিকা পালনের বৃহত্তর সুযোগ রয়েছে। মুসলমানরা তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও আদর্শের মধ্যে নিজেদের নিয়তি নির্মাণ করতে পারে। তেমনি এর মধ্যে পেতে পারে গভীর উজ্জ্বল এক প্রেরণা। এ বই যদি কাউকে এরকম উজ্জীবিত করে তবে সেটিই হবে আমার সার্থকতা। এ দেশের কোন কোন তরুণের মনে হতে পারে উত্তর আধুনিকতা হচ্ছে নির্ভেজাল এক সাহিত্য আন্দোলন। এটা একটা বড় রকমের ভুল ধারণা। হ্যাঁ, উত্তর আধুনিকতা প্রাথমিকভাবে একটা স্থাপত্য কেন্দ্রীক আন্দোলন হলেও বর্তমানে এর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিতগুলো দেখবার মতো, বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব উত্তর আধুনিকতার ক্যানভাসে যেমন করে ফুটে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য। উত্তর আধুনিকতার পশ্চিমী প্রেক্ষাপট না বুঝেই এখানের কেউ কেউ এতে মজে উঠেছেন বলে মনে হয়। এ যে নিছক অনুকারিতা এটা বলবার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিকতা যেমন আমাদের এখানে একটা মরীচিকার সৃষ্টি করেছিল, উত্তর আধুনিকতাও বুঝি তারই পুনরাবৃত্তি করতে চলেছে।

এ বইয়ের লেখাগুলো তৈরির পিছনে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী জনাব আকবর এস. আহমদ ও দৈনিক ইনকিলাবের সাহিত্য সম্পাদক জনাব ইউসুফ শরীফের রয়েছে নীরব অথচ এক গভীর ভূমিকা। এদের প্রেরণা ছাড়া এ লেখাগুলো কখনোই হয়তো সম্ভবপর হতো না। এ বই লেখার পিছনে তারা আমাকে ঋণী করে রেখেছেন।

প্রথমজন আকবর এস. আহমদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী। দেশের বাইরে যাওয়ার পর তার লেখালেখির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ও যোগাযোগ হয়। তিনি আমার কল্পনাকে প্রসারিত করেছেন এবং উত্তর আধুনিকতার যে ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে তার দিকে ইংগিত দিয়েছেন। তার লেখালেখিও আমাকে এ ব্যাপারে ঋণী করে রেখেছে।

দ্বিতীয়জন কথাশিল্পী ইউসুফ শরীফ প্রথম আমাকে বাংলায় এ রকম লেখালেখির উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেন। তারই তাগিদে এ বইয়ের লেখাগুলো একরকম লেখা হয়েছে এবং তার অশেষ আগ্রহে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দৈনিক ইনকিলাবের সাহিত্য পাতায় এগুলো প্রকাশ করেছেন। আরও মোবারকবাদ জানাই বাংলা সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য পরিচালক জনাব আবদুল মান্নান তালিব এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমানকে—এ বইয়ের প্রকাশে যাদের আগ্রহ ছিল সবার চেয়ে বেশি। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মীনি ডাঃ মীরা মমতাজ সাবেকাকে যার নীরব সমর্থন ছাড়া হয়তো এ বই লেখা সম্ভবপর হতো না।

ফাহমিদ উর রহমান
ঢাকা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

উ ত্ত র আ ধু নি ক তা

উত্তর আধুনিকতা ১৩
উত্তর আধুনিকতার সংকট ২৯
উত্তর আধুনিকতার চোরাবালি ৪২
উত্তর আধুনিকতা ঃ সাম্রাজ্যবাদের গোপন ইচ্ছা ৫৪
আমাদের উত্তর আধুনিকতা ৬৫
ইসলাম ও উত্তর আধুনিকতা ৭৮

ও রি য়ে ন্টা লি জ ম

ওরিয়েন্টালিজম ১০১
ওরিয়েন্টালিজমের ভিন্ন পাঠ ১০৭
ওরিয়েন্টালিজমের আগে ১১৩
ওরিয়েন্টালিজম ঃ আমাদের প্রতিক্রিয়া ১২২

উ ত্ত র আ ধু নি ক ভা ব না

সভ্যতার দ্বন্দ্ব ১৩৫
বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ ১৫৭
সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ১৮২
ক্রুসেডের মুখ ১৯৩
সভ্যতার স্কুল, ইরাক যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ ২০৮
তথ্য সন্ত্রাসের যুগে ইসলাম ২২২
মেকলের ভূত ও ঔপনিবেশিক মানসিকতা ২৪৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিকতা

১

উত্তর আধুনিকতার ধারণাটা প্রথমে চালু হয় শিল্প সাহিত্যের জগতে। আধুনিকতার সংকট, অনিশ্চয়তা ও এক ধরনের বিপন্নতা বোধ থেকে এ ধারণার জন্ম। কিন্তু প্রতিটি ধারণাই যেমন কালে কালে পুষ্ট হয়, সময় ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে অনেক কিছুর সংযোজন ও বিয়োজনেরও দরকার হয়, উত্তর আধুনিকতার ক্ষেত্রেও কথাটা অনেকখানি সত্য।

উত্তর আধুনিকতার ধারণাটা এখন আর শিল্প সাহিত্যের জগতে সীমাবদ্ধ নেই, রাজনীতি ও সমাজ চেতনার গভীরেও এটা প্রবেশ করেছে এবং বৈশ্বিকভাবে চিন্তা করলে পৃথিবীর মানুষকে এটি এখন নানা প্রান্ত থেকে ছুঁয়ে দেখছে।

আমরা এখন এক উত্তর আধুনিকতার যুগে প্রবেশ করেছি, যে যুগের চাহিদা, সংকট, তীব্রতা ও মানবিক মনের গতিপ্রকৃতি কার্যতই ভিন্ন। এ যুগের স্বরূপ বুঝতে হলে আগে আমাদের আধুনিকতার গতি-প্রকৃতি ভালভাবে বুঝতে হবে। কেননা, উত্তর আধুনিকতার জন্ম আধুনিকতার জরায়ুতেই। একইভাবে উত্তর আধুনিকতার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নিরূপণ করতে হলে প্রথমেই বুঝা চাই ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও তফাৎটা। কেননা আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতা যাই বলি না কেন মোটের উপর এগুলো অনেকটা পাশ্চাত্যের সম্পদ; এর উপর যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্যের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রভাব। তাই উত্তর আধুনিকতাকে যখন আমরা চোখ বুজে আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে চাই তখন উত্তর আধুনিকতার ধারণা-Conceptটাই অনেকটা এলোমেলো হয়ে যায়। কেননা পাশ্চাত্যের যে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল উত্তর আধুনিকতা তার সাথে অন্য সংস্কৃতির কোন সরলীকৃত সমীকরণ করা যেমন সম্ভব নয় এবং সে প্রচেষ্টাও হবে একটা মস্ত বড় ভুল।

উত্তর আধুনিকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে এখনও রয়েছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অনেকটা নানা মুনির নানা মত। অনেক ক্ষেত্রেই এর লক্ষ্য এখনও পরিষ্কার নয়, উদ্দেশ্যও অনির্দিষ্ট। উত্তর আধুনিকতাকে কেন্দ্র করে জমা হয়েছে অনেক প্রশ্ন, এ সব প্রশ্নের অনেক কিছুই যুগের সংকট, অনিশ্চয়তা ও দুর্নীরিক্ষতাকেই নির্দেশ করে। উত্তর আধুনিকতা (Post Modernity) কি একটি ঐতিহাসিক সময়কে চিহ্নিত করে, না উত্তর আধুনিকতা (Post Modernism) একটি সাম্প্রতিক প্রবণতা। অনেকেই

www.pathagar.com

প্রশ্ন করেন এটা কি একটা সাহিত্য শিল্পগত ধারণা, না দার্শনিক পরিমন্ডলের বিষয় অথবা একটা স্থাপত্য বিষয়ক প্রবণতা। অনেকে আবার এটিকে নান্দনিকতার সাথে যোগ করে দেখেন, কেউ মনে করেন এটি হচ্ছে বিশ্বায়নের (Globalisation) নীরব প্রতিবাদ, আর কারো কারো ধারণা এটা হচ্ছে সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত। উত্তর আধুনিকতাকে যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, হয়তো এর প্রত্যেকটাই সত্য, এর প্রত্যেকটাই উত্তর আধুনিকতা ধারণ করে থাকে। উত্তর আধুনিকতা যেহেতু আধুনিকতার পরবর্তী পর্যায়, আগেই বলেছি আধুনিকতার স্বরূপ চিহ্নিত না করে উত্তর আধুনিকতার প্রবণতাগুলো ধরা যাবে না। আধুনিকতা মানে কি? এক কথায় বিজ্ঞান, প্রগতি, পরিকল্পনা ও ধর্মনিরপেক্ষতা (ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে সোজা কথায় ধর্মহীনতা)। আধুনিকতার এ সব প্রবণতাগুলো বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে চড়ে পৃথিবী শাসন করতে চেয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে শাসিতদেরকে এসব জোর করে হজমও করানো হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই আধুনিকতা বিশেষ করে বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার কথা বিবেচনা করে আধুনিকতার অন্যান্য লক্ষণগুলো পূর্বীয় দেশগুলোর মানুষেরা অবহেলা করেছে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না আধুনিকতা পাশ্চাত্যকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সমৃদ্ধি দিয়েছে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আইন, শৃংখলা ও গণতন্ত্রায়নের পথকেও পরিষ্কার করেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি আধুনিকতা কি পাশ্চাত্যকে মাদক, গর্ভপাত ও বিষণ্ণতার (Drug, Abortion and Depression) অভিশাপে জর্জরিত করেনি? আধুনিকতার এসব প্রেক্ষাপটগুলো না ধরতে পারলে আমরা উত্তর আধুনিকতার সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করতে পারব না।

এখন কথা হলো উত্তর আধুনিকতাকে আমরা যারা পশ্চিমী দুনিয়ার জীবন ও সংস্কৃতির দেয়ালের অন্য পাশে অবস্থান করছি তারা কিভাবে গ্রহণ করবো! আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, জীবন ভাবনা ও মূল্যবোধ পশ্চিমীদের মত নয়। সুতরাং পশ্চিমী সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা ধারণা ও চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের জীবনে কতখানি প্রয়োগিক মূল্য রাখে তা ভাববার বিষয়। এটা না মেনে উপায় নেই পশ্চিমী সভ্যতা এখন দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সভ্যতা এবং এর প্রভাবের আওতায় আমরা কোন না কোনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। সাম্রাজ্যবাদের যুগে আমরা আধুনিকতার ধারণা পেয়েছিলাম; পরাজিত জাতির কাছে আধুনিকতার স্পর্শ সেদিন কতখানি মধুর মনে হয়েছিল তা অবশ্য বিতর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু এ যুগে উত্তর আধুনিকতা ও আমাদের জীবনে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই যাচাই করে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

২

এ যুগের প্রবণতাগুলোকে বিবিসির এক সিরিজ চিত্রে (The Late Show) এভাবে বলা হয়েছে ঃ We do'nt live in a world of clear images- আমরা কোনভাবেই স্বচ্ছতার যুগে বাস করছি না। ফরাসী বুদ্ধিজীবী Lyotard উত্তর আধুনিকতাকে বর্ণনা করেছেন অন্য আঙ্গিকে ঃ incredulity toward metanarratives-চূড়ান্ত বিশ্বাসে সন্দেহবাদী। ফুকো লিখেছেন ঃ an enigmatic and troubling post modernity-দুর্বোধ্য ও বিড়ম্বিত উত্তর আধুনিকতা। Barthes এর ভাষায় ঃ a moment of gentle apocalypse- এক প্রশান্ত পয়গম্বরীয় মুহূর্ত। আর অন্য কেউ কেউ এটিকে বলেছেন ভীতিকর সংস্কৃতি যা এ যুগের আবেগ ও মূল্যবোধকে ধারণ করে বিকশিত হয়েছে। অন্য কথায় এ হলো ঃ It is a panic book : panic sex, panic art, panic ideology, panic bodies, panic noise and panic theory. (Post Modern Scene-Arthur Kroker and David Cook)

এখন আমরা উত্তর আধুনিকতার কয়েকটি বিশেষ দিক ও প্রবণতাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো। যদিও উত্তর আধুনিকতার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও স্থাপত্যগত যোগ সুস্পষ্ট, তবুও এর সামাজিক দিকটাই ব্যাখ্যার দাবি বেশি করে। কেননা, সাম্প্রতিক সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতাই এরকম এবং সেটা আমাদের মনে রাখা চাই।

১. উত্তর আধুনিকতার যুগকে বুঝতে যাওয়ার পূর্বশর্ত হলো কতকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ঃ বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি, সংশয়ী আধুনিকতা, বহু মতবাদে অনাস্থা, ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীনতা, এক বিশ্বের সার্বজনীনতার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা এবং সর্বতোভাবে এসব প্রশ্নের সমাধান ও উত্তর প্রত্যাশা। উত্তর আধুনিকতা বুঝবার জন্য আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে তাই এর গভীরে প্রবেশ করা চাই এবং বহুমাত্রিক অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্যে এর ব্যাপকতা ও গভীরতা নিরূপণের চেষ্টা করা উচিত। মূলত উত্তর আধুনিকতা বহু ধারণা ও চিত্রের সমন্বয়ের নাম। যেহেতু এর সম্ভাবনা সার্বজনীন, তাই দুর্বোধ্য, দুর্ণীরিক্ষ, ভাসমান সর্বমতবাদই এই পাত্রে জমা হয়েছে এবং এটি উচু নীচু, সরল ও গভীর সকল বিষয়কে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী আকবর এস. আহমদের মতে ঃ

For postmodernists, ideology, Marxist or Buddhist, is just one brand of many available in the shopping mall. (Post Modernism and Islam)

একটি জনপ্রিয় উপন্যাস The New Confessions এর নায়ক এ যুগের অনুভূতিকে বিবৃত করেছে এভাবে যা কিনা উত্তর আধুনিকতার দিকচক্রবালহীন দুর্ণীরিক্ষতাকে নির্দেশ করেঃ As I stand here on my modest beach,

www.pathagar.com

waiting for my future, watching the waves roll in, I feel a strange, light headed elation. After all, this is the Age of Uncertainty and Incompleteness. John James Todd, I said to myself, at last you are in tune with the universe. (The New Confessions- William Boyd)

এই শান্ত সমুদ্র সৈকতের ধারে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের দোলা দেখতে দেখতে যখন আমি আমার ভবিষ্যতের অপেক্ষা করছি তখন আমার মধ্যে এক অপরিচিত সুখানুভূতি জেগে উঠছে। শেষ কথা হলো এ হচ্ছে এক অনিশ্চয়তা ও অসম্পূর্ণতার যুগ। যে যুগে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে নিজেই বলছি, জন জেমসটড, অবশেষে তুমি এই বিশ্বের সুরের সাথে একাত্ম হতে পেরেছ।

২. উত্তর আধুনিকতা এ যুগের মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের সাথে জড়িত; কোন না কোনভাবে মিডিয়া এ কালে উত্তর আধুনিকতার চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। শক্তিশালী মিডিয়া এখন শুধু আমাদের আনন্দের সামগ্রী নয়, এটি এখন আমাদের আদেশ-উপদেশ দাতা, শিক্ষক— অবশ্যই বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করার কখনো কখনো উত্তম কারিগর। এ কালে মিডিয়ার শক্তিশালী অবস্থান যেমন একটি সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি নির্ধারণে বাধ্য করছে, তেমনি এর প্রভাব বিস্তার করার দুঃসাহস আজ আর কেউ উপেক্ষা করতে পারছে না। যার হাতে যত শক্তিশালী মিডিয়া, সে তত সুনিপুণভাবে দুনিয়াকে হাতের কব্জায় নিয়ে আসছে। টেলিভিশনের একটি ছবি কখনো কখনো এতই ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে যা আধুনিক মিসাইল বা বোমারু বিমান দিয়েও সম্ভব নয়। পশ্চিমী দুনিয়া উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মিডিয়াকে এত সুকৌশলে ব্যবহার করেছে যে তাতে মনে হয়েছে সাদ্দাম হোসেন হিটলারকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং তাকে ধ্বংস করাই হচ্ছে দুনিয়ার তাবৎ শান্তিপ্রিয় মানুষের কাজ। অথচ এর মতো অসৎ কথা আর হতে পারে না। একই কথা আজকের ওসামা বিন লাদেনদের জন্য প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে সালমান রুশদী প্রমুখেরা মিডিয়ার সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি সত্য, কিন্তু আমরা যে নতুন যুগে এসে পড়েছি তা হলো মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের যুগ, যা কিনা উত্তর আধুনিকতার সাথে ভয়ানকভাবে জড়িত।

একই ভাবে চলচ্চিত্র কখনো কখনো একটি শক্তিশালী মিডিয়া মাধ্যমের কাজ করে, বিশেষ করে যখন এটি প্রভাব বিস্তারকারী সভ্যতাগুলোর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে এবং তার প্রভাব থেকে কম প্রভাব বিস্তারকারী সভ্যতাগুলো নিজেদেরকে আর রক্ষা করতে পারে না। হলিউডের কথা ধরা যাক। গত কয়েক দশক ধরে হলিউড আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিশালী মুখপত্র হয়ে কাজ করছে ঠিক কিন্তু এর প্রভাব থেকে কি আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছি। হলিউড শুধু আমেরিকার নয়, বিশ্বের অসংখ্য নর নারীর চিন্তা-চেতনাকে নাড়া

www.pathagar.com

দিয়ে চলেছে আর একইভাবে হলিউডের এক একজন নায়ক-নায়িকা হয়ে উঠছে- বিশ্বের নায়ক নায়িকা।

এ প্রসঙ্গে মার্শাল ম্যাকলুহানের Global Village ধারণা তাই উত্তর আধুনিকতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; এটাই এ যুগের বাস্তবতা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, মুসলিম-অমুসলিম কেউই মিডিয়ার দুর্বার উপস্থিতিকে আর উপেক্ষা করতে পারছে না।

৩. উত্তর আধুনিকতার যুগে এসে দুনিয়া জুড়ে ধর্মীয় ও স্থানিক সংস্কৃতির এক পুনরুজ্জীবনের স্রোত লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ধর্মীয় জাগরণের গতি ও ধারা স্পষ্ট ইংগিত দেয় এ হচ্ছে নতুন সময় ও চাহিদার সাথে ধর্মের এক ধরনের বোঝাপড়া মাত্র। আধুনিকতা এ কালের মানুষের মনে যে অনিশ্চয়তা ও শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, একটি আদর্শিক চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মানুষ সেই শূন্যতার অনুভূতি দূর করতে চাচ্ছে। উত্তর আধুনিকতার যুগে ধর্ম তাই এক নতুন গতি ও মাত্রা পেয়েছে। এ কালের মানুষ যেমন নতুন করে আত্মানুসন্ধানে উৎসাহী হয়ে উঠেছে; ধর্ম ঠিক অনেকাংশেই হয়ে উঠেছে এ আত্মপরিচয়ের হাতিয়ার।

মিডিয়ার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হবে অতীতে কখনোই ধর্মীয় পুনর্জীবনবাদের আলোচনা এত বেশি করে হয়নি। মিডিয়াই বাস্তবতার চেয়েও দেশে দেশে ধর্মীয় পুনর্জীবনবাদকে মহাশক্তিধর বানিয়ে ছেড়েছে। মজার ব্যাপার হলো এ কালে ধর্মের এই নব অভ্যুত্থানকে মিডিয়া মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যদিও মৌলবাদ শব্দটা এসেছে ইতিহাসের একটা বাঁকে খ্রিস্টানদের একটা অংশের খ্রিস্টীয় মূলনীতির ভিত্তিতে সংস্কার ও পুনরুত্থান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, তবুও মিডিয়ার দৃষ্টিতে এ কালে যে কোন ধর্মীয় জাগরণ, আরো বিশেষ করে বললে ইসলামের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাকেই মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ইসলামকে মৌলবাদের আড়ালে একটা কুশ্রী, অসহিষ্ণু ও ধর্মোন্মাদ জনগণের বিশ্বাস হিসেবে চিত্রিত করার পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিরামহীন প্রচেষ্টা চোখে পড়বার মতো। মিডিয়ার ক্ষমতা এতই অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে যে, কোন মুসলমান ইসলাম চর্চা করলেই মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ছে। অথচ এই মিডিয়ার বৈষম্যমূলক প্রবণতাও বুঝে দেখবার মতো। আরব্য উপন্যাসের এক চক্ষু দৈত্যের মতো মিডিয়া যুক্তরাজ্যের খ্রিস্টান, ভারতের হিন্দু ধর্মীয় জাগরণ এবং বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের ধর্মীয় প্রচেষ্টাসমূহকে একইভাবে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দারুণ অনীহা ও উপেক্ষা দেখিয়ে আসছে। এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার, উত্তর আধুনিকতার যুগে ইসলামের যেমন এক ধরনের আত্মজাগরণ শুরু হয়েছে তেমনি ইসলাম পাশ্চাত্যের এক ধরনের অসহিষ্ণুতার মুখোমুখিও হয়েছে। আমরা খুব ভাল করেই জানি মধ্যযুগে খ্রিস্টানদের চাপিয়ে দেয়া ক্রুসেডের যুদ্ধগুলো ছিল ইউরোপের নিরন্তর অসহিষ্ণুতা

www.pathagar.com

ও ধর্মোন্মাদতার নজীর। সে কালের ক্রুসেডের যুদ্ধ ও প্রকৃতি একালে এসে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু অসহিষ্ণুতার মাত্রা আগের মতোই রয়ে গেছে। আর এ কারণেই ইসলাম উত্তর আধুনিকতার যুগে এসে নতুন করে মিডিয়া ক্রুসেডে জড়িয়ে পড়েছে।

৪. উত্তর আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যবাদিতার একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। যত কথাই বলা হোক না কেন, উত্তর আধুনিকতা কিন্তু আধুনিকতার সবগুলো গুণকেই আত্মস্থ করে বিকশিত হয়েছে এবং এ কারণেই সহিষ্ণুতার ধারণা, পছন্দের স্বাধীনতা, তথ্য ব্যবহারের সুবিধা, সাধারণ মানুষের জীবনের গণতন্ত্রায়ন ইত্যাদি ধারণাগুলো কিন্তু আধুনিকতার স্তর অতিক্রম করে উত্তর আধুনিক যুগে এসে পড়েছে। হয়ত এ জন্যই একালের বার্থিসের মধ্যে ফ্লবেয়ারকে, ফুকোর মধ্যে নীটশেকে এবং দারিদার মধ্যে হেগেলের ছবি আর সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। এমনকি উত্তর আধুনিক যুগের যাদু বাস্তবতার (magical realism) মধ্যে সেই সুদূর অতীতের গ্রীক ও সেমিটিক ঐতিহ্যের ঘ্রাণ আমরা পেয়ে থাকি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পিছনের টানকে উত্তর আধুনিকতা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেনি। একালের উত্তর আধুনিক উপন্যাস John Fowles এর The Magus, সালমান রুশদীর Midnight's Children এবং পিটার এ্যাকরয়েডের Hawksmoor হচ্ছে পুনরাবৃত্তি ও অতীতচারিতার বড় নিদর্শন। সার্ভেন্টসের Don Quixote এবং লরেন্স স্টার্নের The life and opinions of Tristram Shandy'র ছায়া উপরোক্ত উপন্যাসগুলোতে পুরোপুরি দৃশ্যমান। বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবী আকবর এস.আহমদ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে সালমান রুশদী যে কিনা ইসলাম ও তার রসূলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অযাচিত ও অযৌক্তিক আক্রমণ চালিয়েছে, সেও তার উপন্যাস বিশেষ করে Midnight's Children রচনার সময় আরব্য উপন্যাস ও মধ্যযুগের মুসলিম স্পেনের সাংস্কৃতিক মেজাজ ও বুদ্ধিমত্তাকে সুকৌশলে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি।

তাই অনেক বুদ্ধিজীবী উত্তর আধুনিকতাকে নিছক আধুনিক ইতিহাসের একটি সম্প্রসারিত বলয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঃ there is much more continuity than difference between the broad history of modernism and the movement called postmodernism. (Post Modernism and Islam-Akbar S. Ahmed)

কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন উত্তর আধুনিকতা হলো আধুনিক সংস্কৃতির এক সংকটাপন্ন চেহারা মাত্র ঃ postmodernism represents a new type of crisis of that modernist culture itself (Andreas Huyssen উদ্ধৃত : Uncommon Cultures : Popular Culture and Post Modernism-Jim Collins)

www.pathagar.com

৫. উত্তর আধুনিকতার সূচনা মূলত নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে; যেহেতু শহরের বাসিন্দারা উত্তর আধুনিকতার ধারণা দ্বারা বেশিমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে থাকে, সেহেতু শহরই হচ্ছে উত্তর আধুনিকতার প্রাণ ভোমরা ঃ শহরের সমৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে উত্তর আধুনিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এ কালের শহরগুলোর উন্নতি ও বিকাশের সাথে কোন আদর্শিক কিংবা নৈতিক যোগ আছে বলে মনে হয় না। Le Corbusier ও Max Weber শহরগুলোকে যে রকম সভ্য ও যুক্তিবাদী মানুষের কেন্দ্র হিসেবে পরিকল্পনা করেছিলেন অথবা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে যে রকম নগরকেন্দ্রিক আদর্শ রাষ্ট্রের নমুনা আমরা দেখতে পাই, এ কালের শহরগুলো সে চেতনাকে আদৌ ধারণ করে না। এমনকি মুসলিম ইতিহাসে কর্ডোভা, গ্রানাডা কিংবা বাগদাদের যে রূপময় চিত্র আমরা পাই, আজকালকার মুসলিম প্রধান শহরগুলো যেমন ঢাকা, করাচী কিংবা কায়রো কি সেই রূপৈশ্বর্য ও রোমান্টিক আবহ ধারণ করে থাকে! এর উত্তর হবে মোটেই না।

এ কালের শহরগুলো মোটের উপর আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতেই ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে। শহরের জমিন থেকে দয়া ও মুহব্বতের মতো মানবীয় গুণগুলো ঝরে পড়ছে আর সেখানে জায়গা নিচ্ছে বিশৃংখলা ও সন্ত্রাসের দৈত্য। শহর বলতেই একালে বুঝায় ঃ In the city, man is tense, rushed, aggressive, harassed, neurotic, in short, de-humanized. (Post Modernism and Islam-Akbar S. Ahmed)

উনিশ শতকে রুডইয়ার্ড কিপলিং নগর জীবনের এক কুৎসিত ছবি এঁকেছিলেন তার The City of Dreadful Night কবিতায়। একালে সে শহরগুলোর ভয়ানক ছবিই যেন ধরা পড়েছে কিপলিং-এর উচ্চারণে–

The City is of Night, but not of sleep
There sweet sleep is not for the weary brain;
The pitiless hours like years and ages creep,
A night seems termless hell.

ধারণা হিসেবে উত্তর আধুনিকতা এই অমানুষিক (de-humanized) শহরের সৃষ্টি। শহরের দুর্গন্ধ, আবর্জনা, ধ্বংস, বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও অনিশ্চয়তা তাই উত্তর আধুনিকতার শরীরে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

৬. উত্তর আধুনিকতার একটা শ্রেণীগত উপাদান আছে এবং গণতন্ত্র হচ্ছে উত্তর আধুনিকতা বিকাশের পূর্বশর্ত ঃ অনেক বোদ্ধা মনে করেন উত্তর আধুনিকতা হচ্ছে মধ্যবিত্তীয় ঘটনা (Middle class phenomenon)। কেননা স্থপতি, নাট্যকার, সমাজবিজ্ঞানী এরাই হচ্ছেন আধুনিক নাগরিক জীবনের চালিকা শক্তি, যারা নাকি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত এবং প্রকারন্তরে এরাই আবার উত্তর আধুনিকতার কারিগর। এ শ্রেণীর শক্তির উৎস হচ্ছে জ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তারা তাদের চিন্তার বিস্তার ঘটান।

www.pathagar.com

কিন্তু ধারণা হিসেবে উত্তর আধুনিকতা এখনও এতই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট যে এর আবেদন শুধু চোখের কাছে, হৃদয়ের কাছে ঠিক ততটা নয়। মার্ক্সবাদ যেমন তার সরলতা দিয়ে মানুষের অন্তরের খুব গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল, উত্তর আধুনিকতা ঠিক তেমনটি পারেনি। হৃদয়হীন শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের অধিকারের কথা শুনতে যেমন শ্রুতিমধুকর তেমনি এর আবেদনও সর্বব্যাপী, উত্তর আধুনিকতা সেরকম কোন অনুভূতিও সৃষ্টি করেনি। এটা সত্য একালের সভ্যতার এক দারুণ সংকটের মুখেই উত্তর আধুনিকতার উদ্ভব। প্রতিটি ধারণারই জন্ম হয় সংকট মোকাবেলা করার অভিপ্রায় থেকে। তাই এ কালের সংকটকে মোকাবেলা করতে হলে উত্তর আধুনিকতার নেতৃত্ব যেমন মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে থাকা চাই, তেমনি এর ভবিষ্যৎ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হলে জনগণের অংশগ্রহণ ও সমর্থন থাকাও জরুরি। আর সেজন্য এক গণতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে উত্তর আধুনিকতা বিকাশের পূর্বশর্ত; আর তখনই উত্তর আধুনিকতা হয়ে উঠতে পারে জনগণের মতবাদ।

৭. উত্তর আধুনিকতা প্রকৃতিগতভাবে সমন্বয়মূলক। নানা দেশের নানা চিন্তা ও চিত্রকে একই পাত্রে পরিবেশন করা হচ্ছে উত্তর আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নানা দেশীয় মানুষের সহাবস্থান, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদান প্রদান আর তথ্যের বিনিময় একালের মতো আর কখনো হয়নি। দেশে দেশে বহির্গমন আইনের কড়াকড়ি (Immigration controls) সত্ত্বেও মানুষ আজ সকল বাধা অতিক্রম করে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে চলেছে। মানবতার এই ভ্রাম্যমানতা নানা সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে আজ সহায়ক হয়ে উঠেছে। তাই উত্তর আধুনিক চিত্র হয়ে উঠেছে একটা মনটাজ (Montage) চিত্র— নানা দেশের, নানা সংস্কৃতির ছবি যেখানে এসে মিলিত হয়েছে। উচ্চ মার্গীয় বুদ্ধিজীবী এখানে মিলিত হয়েছেন জননেতার সাথে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময় ও কালের গতিকে উত্তর আধুনিক বোদ্ধারা একই খাতে বহাবার চেষ্টা করেছেন আর উত্তর আধুনিক শিল্পীরা চেষ্টা করছেন নানা অসংলগ্ন চিত্রকে যুক্ত করে পরিবেশন করতে এবং তার মধ্যেই এ কালের সংকটকে উন্মোচন করার প্রয়াস লক্ষ্য করবার মতো। বহুমাত্রিকতার এই যুগে এ কারণেই হয়তো আমরা নির্দ্বিধায় একই সাথে ফরাসী সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারি, মার্কস স্পেনসারের কাপড় পরি, ম্যাকডোনাল্ডে যেয়ে লাঞ্চ করি, বিকেলে ওয়েস্টার্ন ফিল্ম দেখি আর রাতে হয়তো বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে যেয়ে তন্দুরীর স্বাদ নেই। এই বহুমুখীনতা ও জটিল গ্রন্থি উত্তর আধুনিকতার নিজস্ব সম্পদ।

একজন উত্তর আধুনিক বোদ্ধার ভাষায় : Postmodernist philosophers tell us not only to accept but even to revel in the fragmentations

www.pathagar.com

and the cacophony of voices through which the dillemas of the modern world are understood. (The Condition of Post Modernity-David Harvey)

টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়া শব্দ কিংবা তীব্র, কর্কশ কোন আওয়াজের মধ্যে উত্তর আধুনিক বোদ্ধারা মত্তোৎসবে মেতে ওঠেন। কেননা, এরি মধ্যে বর্তমান দুনিয়ার দুর্বোধ্যতা মূর্ত হয়ে ওঠে।

আর একটু ব্যাখ্যা করা যাক ঃ উত্তর আধুনিক মনটাজে আমরা মাঝে মাঝে অসংলগ্ন ও অযাচিত চিন্তা ভাবনার মিশ্রণ দেখি। বোদ্ধাদের ধারণা এ হচ্ছে যুগের চিত্র, যুগের সংকটের প্রকৃত রূপ। যেমন এক প্রশান্ত ও সুদৃশ্য গ্রামীণ প্রকৃতির ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ভাবতে শুরু করলাম গরুর পশ্চাৎভাগ থেকে নির্গত মিথেন গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট ওজোন স্তরের হুমকির কথা, কিংবা কোন এক মনোরম সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য যেখানে টিভির মডেল কন্যারা সাঁতার কাটছে আমাদের মন তখন নিবদ্ধ হলো অন্য চিন্তায় ঃ সমুদ্র কি পরিমাণ তৈল, আবর্জনা ও ময়লাকে ধারণ করে আছে অথবা ফাস্টফুডের দোকানে বার্গার খাবার সময় আমাদের মনে হচ্ছে কি পরিমাণ বিষাক্ত preservatives-এর সাথে আমরা গ্রহণ করছি। এর নাম উত্তর আধুনিকতা।

৮. দুর্বোধ্যতা হচ্ছে উত্তর আধুনিক শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। উত্তর আধুনিক শিল্পীরা ভাষার জটাজাল ও রহস্যময় অথচ অবোধ্য এক চিন্তার জগতে বন্দী হয়ে আছেন। তাই সে জগতে সাধারণের প্রবেশাধিকার নিতান্তই সীমাবদ্ধ। উত্তর আধুনিক শিল্পীরা তাই মনে করেন দুর্বোধ্যতার মধ্যে যুগের সংকটকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তা অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়। দুর্বোধ্যতা তাই উত্তর আধুনিক শিল্পীর ক্যানভাসও বটে।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে উত্তর আধুনিকতা ধারণা হিসেবে এখনও বিকাশমান, এর পূর্ণত্ব প্রাপ্তি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং একে ঘিরে জন্ম নিয়েছে অনেক অসংগতি, বৈযুজ্য ও মতানৈক্য। উত্তর আধুনিক সাহিত্যে যেভাবে এ কালের বিশৃংখলা, শিকড়হীনতা ও হতাশার এক ছবি ধরা পড়েছে ঠিক সেভাবে জীবনের মহৎ মূল্যমানগুলো ফুটে উঠতে পারেনি, যেমন পারেনি জীবনের বৈচিত্র, একে অন্যকে আবিষ্কার করবার সম্ভাব্যতা আর মুক্তির পথগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার উপায়সমূহ খুঁজে দেখা। উত্তর আধুনিকতা এখনও অনেকটা রয়ে গেছে জীবন বিচ্ছিন্ন একাডেমিক আলোচনার বিষয়। অথচ উত্তর আধুনিকতা হতে পারতো মানব ইতিহাসের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়, যা এ যাবৎকাল সম্ভব হয়নি, সেই সম্ভাবনাসমূহ উত্তর আধুনিকতার মাধ্যমে হয়তো বাস্তবায়িত হতে পারতো, আর পারতো নানা দেশীয় সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে এক ঐক্যভাব সৃষ্টি করতে।

www.pathagar.com

৩

এ আলোচনার শুরুতেই যে কথা বলেছিলাম উত্তর আধুনিকতা এ কালের মুসলমানদের কাছে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করে কিনা, ঠিক সেখানেই আবার ফিরে আসা যাক। পাশ্চাত্যে উত্তর আধুনিকতা কেন্দ্রিক বিপুল লেখালেখি ও সাহিত্যের বন্যা বয়ে গেলেও মুসলিম চিন্তার জগতে উত্তর আধুনিকতা তেমন কোন প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না। এর একটা কারণ হলো, উত্তর আধুনিকতা পাশ্চাত্যের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল, সেই প্রয়োজন মুসলিম দুনিয়ার কাছে ঠিক প্রয়োজন মনে হয়নি। উল্টো উত্তর আধুনিকতা মুসলিম দুনিয়ার কাছে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে এনেছে। কোন কোন মুসলিম বুদ্ধিজীবী উত্তর আধুনিকতাকে উপনিবেশ উত্তর মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতি ও অর্থনীতিসৃষ্ট নতুন অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর কেউ কেউ ধারণা করেছেন এ হচ্ছে সেই পুরনো পশ্চিমী আধুনিকতার সম্প্রসারিত এক রূপ। অন্য কেউ কেউ উত্তর আধুনিকতাকে তুলনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রীয়করণ (Americanization), নিরীশ্বরবাদ, বিশৃংখলা ও ধ্বংস হিসেবে। উত্তর আধুনিকতা সম্বন্ধে এ ঢালাও মন্তব্য আংশিক সত্যকে ধারণ করে, পুরোটা নয়। এর কারণ হচ্ছে পাশ্চাত্য ও মুসলিম চিন্তার জগতের মধ্যে একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে। এ কারণেই উত্তর আধুনিকতা এই দুই জগতের মানুষের কাছে দুই ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি আধুনিকতার ধারণা মুসলিম দুনিয়ায় প্রবেশ করেছিল সাম্রাজ্যবাদের কালে। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবেই বলি আর যে কোন কারণেই হোক সেকালেই মুসলমানদের মধ্যে দুটো ভাগ দেখা দিয়েছিল। একদল বিশুদ্ধপন্থী ইউরোপীয়দের সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে চাননি, অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অন্যদল আপোষকামী যারা ইউরোপীয়দের সাথে একটা ভারসাম্যমূলক সমন্বয় চেয়েছিলেন; অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক উপাদানও নিজেদের সমাজে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টাও করেছিলেন। এই সমন্বয় পন্থীরাই মুসলিম ইতিহাসে আধুনিকতার ধারণা নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান খুব একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এরকম আরব জগতে আধুনিকতার ধারণা নিয়ে আসেন মুফতী আবদুহু ও তার শিষ্য রশীদ রিদা। এদের পথ ধরেই মুসলিম দুনিয়ায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত অনেক শাসকের আবির্ভাব হয় যারা পাশ্চাত্যকে অনুপ্রেরণার উৎস মনে করতেন এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের সমাজকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়তে চাইতেন। এদের মধ্যে তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ, ইরানের রেজা শাহ পাহলবী, মিসরের নাসের, জর্দানের বাদশাহ হোসেন প্রমুখের নাম বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

তাই উপনিবেশ ও উপনিবেশ উত্তর প্রথম পর্যায়ে আধুনিকতা বলতে মুসলিম দুনিয়ায় বুঝিয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তার প্রসার, পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রযুক্তির বিকাশ। উত্তর আধুনিক কালে এসে মুসলিম দুনিয়া শিকড়ে ফেরার টান অনুভব করছে। ইসলামী আদর্শ ও ইতিহাসের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যকে সোজাসুজি অস্বীকারের কথা তারা এখন ভাবতে শুরু করেছে। পাশ্চাত্য প্রভাবিত রাজনীতি শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে পোষাক-আষাক, স্থাপত্য প্রতিটি পর্যায়ে এই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। তাই মুসলিম সমাজে উত্তর আধুনিকতার অর্থ দাঁড়িয়েছে আমদানীকৃত পাশ্চাত্যের মাল মশলার বাইরে ইসলামের মধ্যে নিজের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান, পাশ্চাত্যকে আর অনুকরণের উৎস না মনে করা এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত মিডিয়ার ভয়ংকর ভূমিকা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন।

পাশ্চাত্যে উত্তর আধুনিকতার আলোচনা বলতে বুঝায় একটা সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়, অবস্থা কিংবা বৈশিষ্ট্যসমূহ। লেখক শিল্পীরাও সেভাবেই পর্যায়ভূক্ত হন। যেমন জেমস জয়েস আধুনিক, জাঁ বদ্রিআর উত্তর আধুনিক। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে আগেই উল্লেখ করেছি এটি অন্য অর্থ ও মাত্রা পেয়েছে। উত্তর আধুনিকতাকে মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করে দেখেছে বেশি করে। এর কারণ মুসলিম সমাজে আধুনিকতার পর্যায়টা খুব একটা সুখকর হয়নি। স্বৈরাচার, অভ্যুত্থান, দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি, শিক্ষার স্বল্প হার ও মান, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও বিভীষিকা, সম্পদের অসম বণ্টন এগুলোই হচ্ছে মুসলিম সমাজের আধুনিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কর্তৃক মুসলিম দেশগুলোর অসৎ নেতৃত্বকে পৃষ্ঠপোষকতাদান, শহরমুখী জনতার ভিড় এবং ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ভাঙন। এসব মিলিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে যে সার্বিক অনাচার ও অপচারের উদ্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবেই ভাবতে শুরু করেছে এ সব কিছুর মূলে আছে তাদের তথাকথিত আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসকবর্গের দেউলিয়াপনা ও অপকীর্তিসমূহ। উপনিবেশ উত্তর কালেও যখন মুসলমানরা দেখল তাদের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি, আল্লাহ ও তার রসূলের আদর্শ অনুযায়ী একটা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের চিন্তাও যখন সুদূর প্রসারী ভাবনা হয়ে আছে, তখন তাদের মধ্যে সবকিছু পুনর্মূল্যায়নের একটা তাগিদ জেগে ওঠা স্বাভাবিক। মুসলিম সমাজের এই আত্মোপলব্ধির পর্যায় হচ্ছে উত্তর আধুনিকতার কাল, যাকে পাশ্চাত্য মিডিয়া নাম দিয়েছে 'মৌলবাদ'।

৪

সাম্প্রতিক ইতিহাসের কতকগুলো ঘটনা মুসলিম সমাজদেহকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। ৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং আফগান জেহাদ।

www.pathagar.com

আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের হার হয়েছিল ঠিক কিন্তু এর মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছিল। এর আগের যুদ্ধগুলোতে আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিকতার শ্লোগান উঠানো হতো। এই প্রথম বাদশাহ ফয়সলের নেতৃত্বে এই যুদ্ধকে একটি ইসলামী জেহাদের রূপ দেয়ার চেষ্টা চলে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাদশাহ ফয়সল কর্তৃক তৈলাস্ত্র প্রয়োগ করে পশ্চিমা বিশ্বকে ধরাশায়ী করা যুদ্ধের অন্য একটি দিক মাত্র।

১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত ইরানের ইসলামী বিপ্লব, ইমাম খোমেনীর উত্থান এবং বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে উপর্যুপরি চপেটাঘাত সারা দুনিয়ায় আলোড়ন তোলে।

জেনারেল জিয়াউল হকের নেতৃত্বে আফগান জেহাদ, কমিউনিস্ট রাশিয়ার পরাজয় এবং পরাজয় পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন সমকালীন ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা।

এই তিনটি ঘটনা মুসলিম মানসে সঞ্জীবনী সুরার কাজ করেছে। এতকাল যে মুসলমানরা তাদের পরাজয় দেখে এসেছে, পরাজয় দেখতে দেখতে তাদের এমন অবস্থা হয়েছিল যে পাশ্চাত্যের সামনে পরাজয়কে তারা একরকম নিজেদের ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল। এসব ঘটনা হঠাৎ করেই তাদের যেন দিব্য দৃষ্টি দিয়েছে যে তারাও পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোকে নাকানি চুবানি খাওয়াতে পারে। রাজনীতি ও যুদ্ধের ময়দানে এসেই মুসলিম কর্মকাণ্ড সীমিত থাকেনি। উত্তর আধুনিক কালে এসে দেখছি মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির জগতেও বড় ধরনের সাড়া পড়ে গেছে।

১৯৭৭ সালে মক্কায় প্রথম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে অসংখ্য বই ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এ কালে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মরহুম অধ্যাপক ইসমাইল রাজ আল ফারূকী কর্তৃক 'জ্ঞানের ইসলামীকরণের' ধারণার প্রসার এবং এই ধারণা এ কালে অনেক প্রতিষ্ঠিত চিন্তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এভাবে অধ্যাপক আলী আশরাফ ইসলামী শিক্ষার নীতি প্রণয়ন করেছেন। খুরশীদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতির ধারণা দিয়েছেন। একইভাবে আমরা এ কালে ব্যাংকিং, সমাজনীতি, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছি। এ কালে মুসলিম চিন্তার জগতের এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। একই সাথে পশ্চিমা চিন্তার জগত থেকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এই সরে আসার নীতি তাদের আত্মপরিচয় ও আত্মউন্মোচনের ঘোষণাও বটে।

বুদ্ধিবৃত্তির জগৎ ছাড়িয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যমূলক এই চিন্তা চেতনা এখন স্থাপত্য জগতেও আছড়ে পড়েছে, কেননা পাশ্চাত্য ধরনের স্থাপত্য নকশা স্থানীয়

www.pathagar.com

প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার প্রাচীন ঐতিহ্যমূলক স্থাপত্যকে আধুনিকীকৃত করার পথে এক বড় মাইল ফলক। সাম্প্রতিক কালে আরব আমিরাতের আল আইন ও পাকিস্তানের ইসলামাবাদে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য নকশা এ নবচেতনার স্পষ্ট ইংগিত দেয়। উত্তর আধুনিক কালে মুসলিম সমাজে এই যে স্বাতন্ত্র্যমূলক চিন্তা চেতনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্থাপত্যজগতের মিলিত প্রচেষ্টাসমূহ একে আমরা কি বলব; এক কথায় ইসলামের নবজাগরণ।

৫

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদ তার Orientalism বইতে দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যের একধরনের ইসলামের প্রতি নিষ্ঠুর শত্রুতার ছবি। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি উত্তর আধুনিক কালে ইসলাম পাশ্চাত্যের সাথে নতুন করে ক্রুসেডে জড়িয়ে পড়েছে। কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্য ইসলামকে এখন তার পয়লা নম্বরের শত্রু হিসেবে বিবেচনা শুরু করেছে। (সাম্প্রতিক এক জরিপে প্রকাশ পেয়েছে বৃটেনের আশি ভাগ লোক ইসলামকে শত্রু হিসেবে মনে করে।) অন্য দিকে মুসলিম দুনিয়ায় এরকম জরিপ না হলেও পাশ্চাত্যের অসহিষ্ণু ও শত্রুতামূলক আচরণে তারাও ভাবতে শুরু করেছেন পাশ্চাত্য তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি দিয়ে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহকে প্রভাবিত এবং বিচ্যুত করতে চায়। ইতোমধ্যেই পাশ্চাত্য তার শক্তিশালী মিডিয়ার কারণে সেখানকার মানুষের মনে একধরনের মুসলিম ভীতি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে মুসলমানদের সম্পর্কে এক কাল্পনিক বৈরী ধারণা গড়ে তোলার সাফল্যও মিডিয়ার। পাশ্চাত্য মিডিয়া মুসলমানদেরকে নিতান্তই Terrorist ও Fundamentalist এর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত ইসলামের জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের মত নয়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত প্রাচীন গ্রীসের উত্তরাধিকার যা কিনা বড় বেশি বস্তু নির্ভর (materialistic) । আর আছে দুই সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য। পোষাক-আসাক, খাবার এমনকি আচরণগত তফাৎও চোখে পড়বার মতো। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সাম্যাবস্থা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। রসূল (স) বলেছেন তাড়াহুড়া করা হচ্ছে শয়তানের কাজ। কিন্তু উত্তর আধুনিক যুগ পুরোপুরি গতি নির্ভর, বিশেষ করে মিডিয়া ও গতি পরস্পরের পরিপূরক। নীরবতা, ধ্যান আর চিন্তাশীলতা-যাকে নাকি সকল বড় বড় ধর্মগুলো উৎসাহিত করেছে-মিডিয়ার কাছে একালে তা মূল্যহীন। অবিরাম শব্দ, (Unceasing noise) চোখ ধাধানো রং, (Dazzling colour) এবং শ্রান্তিহীনভাবে পরিবর্তিত ছায়া বা অনুভূতি (Restlessly shifting images) হচ্ছে মিডিয়ার চরিত্র।

www.pathagar.com

এমনকি লজ্জা, ভদ্রতা, গৃহমুখীনতা (domesticity) যা কিনা মুসলিম নারী ও পুরুষের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্যে তারও অপব্যাখ্যা করা হয়। কারণ মুসলমানের কাছে স্থায়ী পারিবারিক বন্ধনের মূল চাবিকাঠিই হচ্ছে গৃহ। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজে পারিবারিক বন্ধন দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে; সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে মাদক, শিশু নিগ্রহ (child abuse), গৃহবিবাদ (Domestic Violence), বিচ্ছেদ আর গর্ভপাত। ফলে পাশ্চাত্য সমাজ হয়ে উঠছে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত, হতাশাবাদী, অনির্দিষ্ট ও দুর্নীরিক্ষ যা ইসলামী বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। মিডিয়ার ভূমিকা ছাড়াও যে ঐতিহাসিক কারণ পাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যে বিবাদের জারক হয়ে কাজ করছে তা হচ্ছে ক্রুসেড। ইউরোপ আজও তার অতীত ইসলাম বিরোধিতার কথা ভুলতে পারেনি। ভূমধ্যসাগরীয় যে সব দেশ (স্পেন, ইতালী, গ্রীস) মুসলমানরা অতীতে শাসন করেছে, আজও এরা মুসলিমদের পরাজয়ের দিন নিজেদের বিজয়োৎসব হিসেবে পালন করে। সুতরাং এই ইউরোপের পক্ষে ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আদৌ সম্ভব কি!

বহুযুগ ধরে পাশ্চাত্য ইসলামকে বুঝবার চেষ্টা করছে, তাদের নিজেদের বুদ্ধিজীবী, গ্রন্থাগার আর বর্তমানের উন্নত কারিগরী ব্যবস্থা প্রয়োগ করে— কিন্তু তারপরেও তারা মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা ধরতে পারেনি। কারণ তারা যেভাবে ইসলামকে দেখতে চেয়েছে সেভাবে তারা ইসলামকে কখনো পায়নি। তারা ইসলামকে দেখতে চায় Secularized religion হিসেবে। তার মানে ইসলামের আদর্শিক শক্তিকে ফেলে দিলে যা থাকে সেই ইসলাম-যে ইসলাম পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আর সক্ষম হবে না। এ জন্যই তারা মিডিয়ার জোরে কিছু তৃতীয় বিশ্বের মুখপত্র (Third world scholar) তৈরি করেছে যেমন ভি.এস. নৈপাল, ফুয়াদ আজামী ও সালমান রুশদী। এদের জন্ম তৃতীয় বিশ্বে হলেও চিন্তা ভাবনা, রুচি আর মস্তিষ্কের দিক দিয়ে এরা পুরোপুরি পাশ্চাত্যের। তাই এরা বিভিন্ন কৌশলে এমন কথা বলে যা পাশ্চাত্য শুনতে চায় অথবা পাশ্চাত্যই তাদের মনের কথা তাদের দিয়ে বলায়। সে কারণে মুসলিম দুনিয়ার যারা নির্ভরযোগ্য মুখপত্র হতে পারেন পাশ্চাত্য মিডিয়ার কাছে তাদের কোন কদর নেই।

পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধিতার আর একটা নজীর হচ্ছে New World Order-এর ধারণা যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে Globalization-বিশ্বায়ন। এর মানে হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি দিয়ে পুরো দুনিয়া বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়াকে জিম্মি করে ফেলা। আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

এমনিতেই ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের রয়েছে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা। নতুন বিশ্বব্যবস্থার সাথে আরো কতকগুলো উপাদান যুক্ত হয়ে এ অসহিষ্ণুতাকে দিয়েছে উচ্চমাত্রা।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ কালের স্বঘোষিত পুলিশ ও বরকন্দাজের দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং ইরানের মরহুম ইমাম খোমেনী, গাদ্দাফী, সাদ্দাম ও ওসামা বিন লাদেনকে শান্তির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বৃটিশের ভূমিকা একালে যুক্তরাষ্ট্রের তল্পীবাহক হিসেবেই স্বীকৃত। রাশিয়া তার চেচেন ও মধ্যএশীয় মুসলমানদের নিয়ে চিন্তিত, যেমন চীন তার মুসলিম অধ্যুষিত সিংকিয়াংকে নিয়ে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন। ইসরাইল যে কিনা মুসলিম নীতি নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবান্বিত করে সে তার আরব প্রতিবেশী ও জনগণকে নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে আছে। তেমনি হিন্দু অধ্যুষিত ভারত কাশ্মীরের সম্ভাব্য ইসলামী জাগরণকে সামরিকভাবে দমন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এ সব দেশের একটা সাধারণ সমস্যা হচ্ছে 'মুসলমান' এবং মুসলমান সমস্যাই তাদেরকে যৌথভাবে ইসলাম বিরোধিতায় নিয়োজিত করেছে। এই যৌথ বিরোধিতা ও মিডিয়ার নেতিবাচক ভূমিকা ইসলামকে আজ অমুসলিম দুনিয়ার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। একেই বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক হান্টিংটন Clash of Civilizations-সভ্যতার দ্বন্দ্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন; এই দ্বন্দ্বে ইসলাম বাকি বিশ্বের এক নির্দয় আক্রমণের শিকার হয়েছে মাত্র।

৬

উত্তর আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের অবস্থান আমরা আলোচনা করেছি এবং সে প্রেক্ষিতে মুসলিম দুনিয়ার প্রেক্ষাপটও কিছুটা আলোচনায় এসেছে। কিন্তু যা আলোচনায় আসেনি তা হলো মুসলমানদের নিজ হাতে সৃষ্ট বিষফোড়াগুলি। এটা সত্য সাম্প্রতিককালে অমুসলিম দুনিয়া মুসলমানদের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নতম মানবীয় ব্যবহারটুকুও করতে পারছে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজস্ব অবস্থানকে কি কোনক্রমে দায়মুক্ত বলা যাবে!

মুসলিম শাসকরা অনেক ক্ষেত্রেই আজকে তাদের গরীব জনগণের খাওয়া ও পরার নিশ্চয়তা বিধান না করে নিজেরা বিলাস ব্যাসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ মুসলমান দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা আজও গড়ে ওঠেনি। দুনিয়ার গরীব, অশিক্ষিত, স্বাস্থ্যহীন ও পরাজিত লোক বলতে আজ মুসলমানকেই বুঝায়। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে আজ মুসলমানের হাতেই মুসলমানের রক্ত ঝরছে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ এগুলো কি বড় উদাহরণ নয়? এ সব যুদ্ধের ক্ষেত্রে আদর্শ নয় বরং ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থই প্রধান ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে।

অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম শাসকরা একালে স্রেফ পাশ্চাত্যের বরকন্দাজ হয়ে কাজ করছেন এবং তাদেরই স্বার্থে নিজের জনগণের রক্তে নিজেদের হাত রাঙিয়ে চলেছেন। পাশ্চাত্য মিডিয়া আজ মুসলিম সমাজকে পুরো দুভাগ করে

www.pathagar.com

ফেলেছে–Progressive ও Fundamentalist। এই কৃত্রিম বিভাজন করা হয়েছে পাশ্চাত্যের স্বার্থে মুসলিম দুনিয়াকে দুর্বল করে ফেলবার লক্ষ্যে এবং এই হতবুদ্ধি শাসকরা পাশ্চাত্যের এই স্বার্থ জিইয়ে রেখেছেন নিজেদের অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য। মুসলিম উম্মার ধারণাটা চমৎকার, এর মধ্যে একটা মহৎ আদর্শের সুঘ্রাণ আছে। কিন্তু বাস্তবে মুসলিম উম্মার আংশিক অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাও দেখা যাচ্ছে কোন দৃঢ় বন্ধনে স্থিতিশীল নয়।

৭

ইসলাম ধর্ম হিসেবে নিরাপোষ, বিশ্বাস হিসেবে অনড়। অন্যান্য বড় ধর্মগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ও সময়ে secular অবস্থান নিয়েছে কিন্তু ইসলামের পক্ষে সেটা কখনো সম্ভব হয়নি। এ কারণেই আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের প্রচণ্ডতা আজও ব্যাপক এবং জীবন সমস্যার সমাধানে এর বলিষ্ঠ ভূমিকা চোখে পড়বার মতো—অন্যান্য বড় ধর্মের ক্ষেত্রে সেটা তেমন সম্ভব হয়নি, এদের ভূমিকা শুধু আজ পারলৌকিক মুক্তি লাভের মধ্যেই সীমিত হয়ে গেছে।

যে যুগে আমরা এসে পড়েছি সে হচ্ছে এক অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তার যুগ। এ কালের এই অসুস্থতা দূর করতে হলে চাই এক নিরাপোষ বিশ্বাসের দাবি নিয়ে বুক পেতে দাঁড়ানো এবং তা কেবল ইসলামের পক্ষেই সম্ভব। প্রযুক্তি ও ভোগবাদ বিকাশের মাধ্যমে এই অবিশ্বাসের অসুখ সারানো সম্ভব নয়, সেটা যদি সম্ভব হতো তাহলে পাশ্চাত্য দুনিয়া এতদিন তা করতে পিছ পা হতো না।

আজ ক্ষুদ্রতা ও হীনতার বাইরে মুসলমানরা যদি তাদের আদর্শের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হতে পারে তবে তাদের পক্ষে পুনরায় প্রচণ্ড এক শক্তিতে জ্বলে ওঠা সম্ভব এবং পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবার তারা তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারবে। কিন্তু মুসলমানরা নিজেরাই যদি নিজেদের উদাহরণযোগ্য ও অনুকরণীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে তবে অন্যরা তাদের কথা শুনবে কেন?

উত্তর আধুনিক যুগে এসে মুসলমানদের সে কথাই ভাববার সময় এসেছে।

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিকতার সংকট

১

এখন উত্তর আধুনিকতাতত্ত্ব চর্চার যুগ। সবকিছুকে উত্তর আধুনিকতার ফ্রেমে বন্দী করে দেখা বা বোঝার চেষ্টা এ কালের রীতি হয়ে উঠেছে। কালিক বিচারে উত্তর আধুনিকতা, আধুনিকতার পরবর্তী পর্যায় এবং সে সূত্রে এটি উত্তর ঔপনিবেশিকতার সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। একই বিচারে উত্তর আধুনিকতার সাথে বিশ্বায়ন ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণা ও চিন্তা-ভাবনাও সম্পৃক্ত। এই যে নানা তত্ত্ব ও চিন্তা-ভাবনার কথা এখন আমরা শুনছি বা বলছি তা মূলত একই প্রক্রিয়ার বহুমাত্রিক চেহারা। এই বহুমাত্রিকতা যেমন উত্তর আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য তেমনি একটি গভীর সংকটের ইংগিতবহ।

আমরা যে যুগে এসে পড়েছি সে যুগে সভ্যতার প্রগতি ও দুর্গতি একই সাথে চলছে, বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীলতার সাথে এর ধ্বংসকামিতা এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি মানুষের অপরিসীম সম্ভাবনা ও মুক্তির ভাবনার সাথে মানবিকতার সংকট ও বিপর্যয় যেন ধেয়ে আসছে। এই আলো আঁধারির বিমিশ্র সমাহার, আশা ও ধোঁয়াশার অপূর্ব সমন্বয়, সংকট ও মুক্তির সহাবস্থান উত্তর আধুনিকতার মধ্যে একই সাথে একই সময় অবস্থান করছে।

উত্তর আধুনিকতা শব্দের উত্তর অংশটা বহন করে সময়ভেদের অর্থ, যেন ইতিহাস বিচ্ছেদের একটা গভীর গ্রীক ট্রাজেডি নাটক। তার মানে আধুনিকতাকে অতিক্রম করে উত্তর আধুনিকতার যাত্রারম্ভ। এই তত্ত্ব চর্চায় একটা স্পষ্ট ঐতিহাসিক অতীত, আধুনিকতার ঐতিহ্য, আর তার থেকে একটা স্পষ্ট ছেদ উত্তর আধুনিকতা। উত্তর আধুনিকতার তত্ত্ব চর্চা মানে একটি বিষয় কেন্দ্রিক কোন আলোচনা নয়, এর মধ্যে আছে হাজার হাজার মত, প্রচুর তাদের মতভেদ, মতানৈক্য, সাযুজ্য ও বৈযুজ্য। কিন্তু তাদের কোন মতানৈক্য নেই এই এক জায়গায়, ইতিহাস ছেদের Line of demarcation এর ক্ষেত্রে। মানে মডার্ন আর পোস্টমডার্ন, যেমন কলোনি আর পোস্ট কলোনি। কিন্তু এই বিচ্ছেদ রেখাটা কি এতই ঋজু ও স্পষ্ট যা কিনা নদীর এপার ওপারের মতো। আমরা ইতিহাসের এই ছেদটাকেই এখন জেরা করে দেখতে চাই।

এখন যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া যায় আধুনিকতার ঐতিহ্য ভেঙে আমরা পুরোপুরি উত্তর আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছি, তাহলে কি কথাটা পুরোপুরি সত্য বলা হবে। আমরা কি এখনও আধুনিকতার অনেক উপায় উপকরণকেই ব্যবহার করছি না? যেমন আমরা কলোনির যুগ পার হয়ে এলেও কলোনির ঐতিহ্য

www.pathagar.com

পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারিনি। তার মানে সময়ের নিরিখে এই ছেদ টানাটা একান্তই যান্ত্রিক, অস্পষ্ট, ধোঁয়াশা ও হেয়ালীপনায় পূর্ণ। মডার্ন ও পোস্টমডার্ন সময়ের নিরিখে কোন বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ পরস্পরবিরোধী সত্তা নয়। কিন্তু উত্তর আধুনিক বোদ্ধারা এটিকে ঠিক যেন দুটি ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট– পানি নিরুদ্ধ কামরার মতো করে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। আসলে পোস্ট মডার্নিজমের মধ্যেই যেমন ট্রাডিশন রয়েছে আবার ট্রাডিশনের মধ্যে আছে পোস্ট মডার্নিজম। সময়ের ধারাবাহিকতা– কন্টিনিউয়িটি বলে তো একটা কথা আছে।

এটা সত্য লাল মুখো কলোনাইজার সাহেবরা এখন আর আমাদের দেশে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেন না বা তাদের দেখে আমরাও এখন নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আশ্রয় নেই না। কিন্তু এখনও কি আমাদের অনেক ক্ষেত্রে একটা ভীষণ রকমের দুর্লক্ষ্য বিদেশী পুঁজির বিদেশী বাজারের আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর শাসনের কাছে মাথা নত করতে হয় না? আগের দিনের সাম্রাজ্যবাদীরাই তো নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ব পুঁজির তহবিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর আইএমএফ। এ সব প্রতিষ্ঠানের শাসন কি সাহেবদের ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে কোন অংশে কম? শুধু পার্থক্য সেদিন শাসকের চেহারাকে আমরা স্পষ্ট করে আঙ্গুল তুলে দেখাতে পারতাম, এখন পারছি না। একটা নামহীন, আকারহীন শাসন আমাদেরকে শাসন করছে। আমাদের সম্পদ তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এই শাসনের সূক্ষ্মতা ও দুর্লক্ষ্যতার ঘোরে আমরা একটা মায়াজালের মধ্যে আটকে গেছি। আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি এই মাদকতা আমাদেরকে আলোকপ্রাপ্ত ও নবজাগরণের পথে তুলে দেবে। এই সুযোগে আমাদের মতো গরীব দেশগুলোতে ছুড়ে দেয়া হচ্ছে নানা রকমের তত্ত্ব ও আলোচনার ঝড়। দারিদা, ফুকো, আপ্পাদুরাই প্রমুখের সব জটিল জটিল তত্ত্বে আমাদের মগজ এখন কিলবিল করছে। তেমনি করে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এখন পশ্চিম থেকে ছুঁড়ে দেয়া বিশ্বায়ন, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, জেন্ডার ইস্যু প্রভৃতি তত্ত্ব নিয়ে গরম গরম বক্তৃতা বিবৃতি তৈরি করছেন।

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের অন্যতম পরিকল্পক ও স্থপতি লর্ড মেকলে পশ্চিমের চিন্তা-ভাবনায় প্রাণিত একদল নেটিভ সাহেব তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে তিনি ভয়ানক রকমভাবে সফলও হয়েছিলেন। মেকলের পরিকল্পনা মতো এইসব নেটিভ সাহেবরা গাত্র বর্ণে ভারতীয় হলেও চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে পুরোপুরি সাহেবদের মতো হতে পেরেছিলেন এবং সাহেবদের সাম্রাজ্যবাদ রক্ষায় প্রাণপণ খেটেছিলেন। মেকলে আজকে নেই, কিন্তু তার উত্তরসূরীরা কি হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন? দৃশ্যমান কলোনি আজকে নেই সত্য, কিন্তু এক অদৃশ্য কলোনি আমাদেরকে আজ অক্টোপাসের মতো ঘিরে আছে। পুরনো ঔপনিবেশিক শাসনের জায়গা নিয়েছে আর এক শাসন।

www.pathagar.com

আলোচনার শাসন, তত্ত্বের শাসন, বিদ্যার শাসন, চিন্তার শাসন। আমরা এখন এক চিন্তার কলোনির মধ্যে বাস করছি।

আধুনিকতার ধারণা আমরা পেয়েছিলাম ঔপনিবেশিকতার দিনগুলোতে। একটি উপনিবেশিত জাতির কাছে আধুনিকতার শ্লোগান তাই কি মূল্য বহন করে এনেছিল সেটা নির্ণয় করা যেতে পারে। আধুনিকতা আমাদের শিখিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের শ্লোগান সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, বিজ্ঞান আর তার আত্মা রিজনকে। সেই আধুনিকতার তত্ত্বে আমাদের কেউ কেউ প্রাণিত হয়েছিলেন, অনেকে তা হজমও করেছিলেন। এভাবে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া তত্ত্বের মাধ্যমে একটা Colonial equality-ঔপনিবেশিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই যুগে ঔপনিবেশিক জুলুম ও অনাচারের মধ্যেও আমরা সাম্যের বড়ি খেয়েছিলাম। আসলে এটি ছিল অনুকরণের সাম্য, চাপিয়ে দেয়া সাম্য। উত্তর আধুনিক বোদ্ধারা একে বলেছেন মিমিক্রি বা নকল। এরা বলছেন উপনিবেশিত মানুষ সাহেবদের নকল করেছে, কিন্তু সাহেব হতে পারেনি। তার মানে উপনিবেশিত মানুষ না সাহেব না নেটিভ। এক ধরনের অবাস্তবতার সাম্যে প্রলুব্ধ হয়ে উপনিবেশের মানুষ ঘুরপাক খেয়েছে, দিকবিদিশাহীন গন্তব্যের ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে। উত্তর আধুনিক বোদ্ধাদের এই ব্যাখ্যা মেনে নেয়া গেলেও উত্তর আধুনিকতা সম্বন্ধে তাদের মতামত অগ্রহণযোগ্য। এরা বলছেন, উত্তর আধুনিক-উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে এসে এক হাইব্রিড বা সংকর কালচারের অভ্যুত্থান ঘটেছে। এর মানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি তাদের নিজের নিজের পার্থক্য বজায় রেখেই পরস্পরের সঙ্গে দর কষাকষি করছে। একে তারা বলেছেন নেগোশিয়েশন– Negotiation। এভাবে তাদের ভাষায় উত্তর আধুনিক পৃথিবীতে সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

আসলে এই পৃথিবীর বর্তমান বাস্তব অবস্থা কি সে রকম কথা বলে? Negotiation-এর স্থলে বিভিন্ন সংস্কৃতির Confrontation-টাই কি এখন চূড়ান্ত ও মূখ্য হয়ে উঠছে না? বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে Thesis-এর স্থলে Anti thesis-এর প্রবণতা কি মাথা চাড়া দিচ্ছে না? একে আমরা বলতে পারি Synthetic hegemony-সমন্বয়ের আগ্রাসন। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে মেলামেশা ও যোগাযোগ আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে ঠিক, কিন্তু যোগাযোগ প্রক্রিয়ার এই ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিকভাবে অগ্রসর দেশগুলো তাদের পুরনো ঔপনিবেশিক চেতনার ভাল রকম বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে। পশ্চিমের আগ্রাসী সংস্কৃতি ও অর্থনীতির তোপের মুখে দুর্বল দেশগুলোর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। আজ পৃথিবীর যাবতীয় ধন-সম্পদের আশিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কব্জায়। এর প্রাযুক্তিক অগ্রগামিতাও অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে এই সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য, অর্থনৈতিক ব্যবধান কি উত্তর আধুনিক যুগের বহুল প্রচারিত Synthesis বা সাম্যের ধারণার সাথে

www.pathagar.com

মানানসই? আর একটা উদাহরণ দেয়া যাক। এখন নাকি বিশ্বায়নের যুগ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'র যুগ। কথাটা কি সে রকম। ধনী ও উন্নত বলে পরিচিত দেশগুলোর মধ্যে এখন Immigration Control বলে তেমন কিছু নেই। পাসপোর্ট ও ভিসার কড়াকড়িও কার্যত এখন বহু দেশ থেকে উঠে গেছে। ইচ্ছা করলেই ইউরোপের যে কেউ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকতে পারে। আবার আমেরিকানরাও একইভাবে অন্য দেশগুলোতে অনায়াসে যেতে পারে। কিন্তু কঠিন সত্য হলো এই ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি বরাবরের মতো গরীব দেশগুলোর মানুষের জন্য অত্যন্ত ভয়ানক রকমভাবে কার্যক্ষম রাখা হয়েছে। কেউ পাশ্চাত্যের সুযোগ-সুবিধায় প্রলুব্ধ হয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে এসব দেশে ঢুকে পড়লেও যদি একবার ধরা পড়ে যায় তবে রক্ষা নেই। বছরের পর বছর জেলের ভাত খেতে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় তো এসব অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বিরান মরুভূমির মধ্যে অত্যন্ত প্রতিকুল আবহাওয়ায় শক্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বন্দীশিবির তৈরি করা হয়েছে। ভাবটা এমন জেলের ভাততো খাবেই, পালাতে গেলেও মরুভূমিতে পথ হারিয়ে মরবে। এ কেমন সাম্য? প্রকৃত অবস্থা হলো উন্নত দেশগুলো তাদের সুযোগ-সুবিধার একটি ক্ষুদ্র অংশও ত্যাগ করতে রাজি নয়। বরং নিজের সুযোগ-সুবিধাকে স্থায়ী করতে নিগৃহীতকে আরো নিগৃহীত, নিষ্পেষিতকে অধিকতর বঞ্চিত করতে তাদের দ্বিধা জাগে না। উত্তর আধুনিকতা তত্ত্ব চর্চার ঘোরে পড়ে এই পৃথিবীর বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। উল্টো আমাদের বুঝতে হবে ধেয়ে আসা এই আসন্ন ঝড়কে আমরা কি ঠেকাতে পারব, না সেই উটপাখির মতো আমাদের অবস্থা গিয়ে ঠেকবে যে কিনা মরু বালুতে মুখ গুঁজে মনে করে মরুঝড় বুঝি ঠেকিয়ে দিলাম।

২

আধুনিকতার প্রবণতাগুলো নাম বদলে এখন উত্তর আধুনিক হয়ে গেছে। উচ্চারণে, আর্টিকুলেশনে, চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে মনে হবে এ বুঝি নতুন নির্মাণ। ঠিক আধুনিকতার মতোই ধারণা করা যায় এ যেন পাশ্চাত্যের এক নতুন মতাদর্শগত প্রকল্প–Ideological project। মননের আর উচ্চারণের রকমফেরের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যের পুরনো পরিচিতিগুলো বদলে গেছে ঠিক, কিন্তু এ কালে এসেও প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্কটা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। আধুনিকতার সাথে আমরা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চেহারা প্রত্যক্ষ করেছি, ঠিক তেমনি উত্তর আধুনিকতার মধ্যে পাশ্চাত্যের দুর্বীনিত চেহারা ভেসে উঠেছে। ইরাকে ও আফগানিস্তানে পাশ্চাত্যের সম্মিলিত হামলা, হত্যা, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের যে ছবি আমরা দেখেছি তাকি আঠার আর উনিশ শতকের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের কথা

www.pathagar.com

মনে করিয়ে দেয় না? মূলগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণের দিক দিয়ে উত্তর আধুনিকতা যদি আধুনিকতার ছায়া বা প্রতিবিম্ব হয় তবে কেন আধুনিকতার এই নতুন পরিচিতি গ্রহণ— তা একটু আমরা বিশদভাবে তলিয়ে দেখতে পারি। আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যকে আমরা কখনো কখনো পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করি। কেননা আধুনিকতা বলতে আমরা যা বুঝি তা মূলত পাশ্চাত্যের সম্পদ। আধুনিকতা বা পাশ্চাত্য সভ্যতা যাই বলি না কেন, প্রতাপ ও প্রাচুর্যের দিক দিয়ে এটি আজ যেমন শীর্ষ স্পর্শ করেছে তেমনি এটি একটি প্রান্তিক বিন্দুতে এসেও দাঁড়িয়েছে যার বাইরে অগ্রসর হওয়ার মতো অবস্থা এখন আর এ সভ্যতার নেই। সভ্যতার সৃষ্টিশীলতা অনিয়ন্ত্রিত নয়। মানবিকতার ইতিহাসে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান বিপুল হলেও তা কখনো চিরন্তনতা লাভ করেনি। প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যেও আজ স্থবিরতা ও জড়ত্ব আভাসিত হয়ে উঠেছে। তারই লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর আধুনিকতার মধ্যে। উত্তর আধুনিকতা হলো একটি রূপান্তরকালীন সময়ের ধ্যান-ধারণা। আধুনিকতার প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের মানুষ আজ এক নতুন সময় ও যুগের জন্য অপেক্ষমান। কিন্তু সেই প্রত্যাশিত যুগ তাদের সামনে এখনো অনুপস্থিত। পুরো পাশ্চাত্যের মানুষ আজ তাই ছুটে চলেছে এক দিকবিদিশাহীন অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ সর্বস্ব ও আদর্শবোধ বর্জিত জীবনধারার দিকে। যার ফলে সেখানে দেখা দিয়েছে এক সর্বব্যাপী অস্থিরতা, অনাচার, অপচার, বিশৃংখলা, হতাশা ও বিপর্যয়বোধ। মননের জগতের এই অনাচারের নামই উত্তর আধুনিকতা। কোথাও কোন স্থিত ধারণা নেই, কোনো হায়েরার্কি নেই, কোন গুরুত্বের ক্রমভেদ নেই। তাই ফলত উত্তর আধুনিক এই পৃথিবীর পথে কেহ নাই কিছু নাই গো।

একজন উত্তর আধুনিক বোদ্ধার লেখা উদ্ধার করছি। উত্তর আধুনিকতার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে তিনি যা বলেছেন তা এরকম ঃ

The inventory of features assigned to postmodernism includes : heterodoxy, eclecticism, marginality, death of utopia (read: communism), death of the author, deformation, disfunction, deconstruction, disintegration, displacement, discontinuity, non-lineal view of history, dispersion, fragmentation, dissemination, rupture, otherness, decentering of the subject, chaos, rhizoma, rebellion, the subject as power, gender/difference/power (probably the most positive as a revision of patriarchy), dissolution of semiotics into energetics, auto-proliferation of signifiers, infinite semiosis, cybernetics, pluralism (read: freedom versus 'totalitarianism'),

www.pathagar.com

critique of reason, procession of simulacra and representations, dissolution of legitimizing 'narratives' (hermeneutics, emancipation of the proleteriat, epic of progress, dialectics of the spirit), a new episteme or sign system. (Zavala [1988] cited in Fardon 1992 : 25)

উত্তর আধুনিকতা সম্বন্ধে এটি একটি যুৎসই বর্ণনা বলে মনে হয়। এ কালের দুর্লক্ষতা, অস্পষ্টতা, বৈযুজ্যতা ও ভঙ্গুরতার কথা তার লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তেমনি উত্তর আধুনিক এ তত্ত্বের তলায় পাশ্চাত্যের এক নৈরাজ্যিক ছবিও যেন এখানে ক্রম আভাসিত হয়ে উঠেছে।

এটা সত্য গত শতাব্দীর আশির দশকের দিকে আমরা প্রথম উত্তর আধুনিক তত্ত্বের সাথে পরিচিত হই। প্রথম দিকে এটি সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের জগতের একটি বিষয় ছিল, যার চরিত্রায়ন করা হতো এমনি ভাবে : A series of broadly aesthetic projects। কিন্তু সময়ের যাত্রায় এটি এখন social, political and cultural configuration এর মাত্রা লাভ করেছে। সে সূত্রেই উত্তর আধুনিকতা এখন আগ্রাসী পাশ্চাত্যের বড় রকমের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এ তত্ত্বের ছাদের তলায় আমরা এখন যতসব তত্ত্ব, মত-মতান্তর, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের কথা শুনি না কেন, তা মূলত সেই পুরনো সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও আয়োজন মাত্র। পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সমরনেতারা এই একটি ব্যাপারে ভয়ানক রকমভাবে একমত হয়েছেন যে কোন প্রকারেই হোক তাদের এতকালের অর্জিত বস্তুগত সুযোগ সুবিধা, ধন সম্পদ ও প্রতাপকে টিকিয়ে রাখা চাই। তার জন্য প্রয়োজন অতীতের মতো সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন। কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্বে দেশ দখলের পুরনো ইম্পেরিয়ালিজম এখন অচল বিধায় পাশ্চাত্যের নেতারা তাদের কৌশল পাল্টিয়েছেন। এই জন্য তারা বলছেন নেগোশিয়েশনের কথা, ডায়ালগের কথা উপর্যুপরি সাম্যের কথা। এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষকে তারা বরাবরের মতো কলোনির মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করেন। শুধু পার্থক্য সেকালে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ সশরীরে, সমূর্তিতে এ সব দেশে হামলে পড়েছিল, এখন নেগোশিয়েশন ও সাম্যের শ্লোগানের তলায় চলছে শাসন ও শোষণ। আঠার আর উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাদের ভ্রষ্টাচারী নীতি ও পন্থাকে কখনো বলতো White Men's Burden, কখনো Civilizing Mission। এ দিয়ে তারা যুক্তি তৈরি করতো, তাদের অপচারকে রেশনালাইজ করার চেষ্টা করতো। এ রেশনালাইজেশনের প্রক্রিয়া বরাবরের মতো আজও অব্যাহত রয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ছুড়ে দেয়া হয়েছে বিশ্বায়ন ও নতুন বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব। উত্তর আধুনিকতাকে বিশ্লেষণ করতে হলে এগুলো আমাদের গভীর ভাবে বোঝা চাই।

www.pathagar.com

৩

এখন আমাদের বলা হচ্ছে বিশ্বায়নের কালে আমরা যেমন বাকী পৃথিবী থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারি না তেমনি দ্বীপের মতো কোন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়েও আমাদের পক্ষে চলা সম্ভব নয়। এই ধারণার বিপরীতে যথার্থ যুক্তি তুলে ধরা যায় এভাবে, আমরা তো বরাবরের মতো বিচ্ছিন্নই আছি, আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, কেন তাহলে এই কৃত্রিম সাম্যাবস্থা সৃষ্টির ভাওতাবাজি চলছে?

পাশ্চাত্যের কুশলী রাজনীতিবিদ ও সমরনেতারা বহুকাল ধরেই তো আল্লাহর দেয়া এই অবিভাজ্য পৃথিবীকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে খন্ড-বিখণ্ড করে রেখেছেন। একই পৃথিবীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের ধারণা কি পাশ্চাত্যের চিন্তাপ্রসূত নয়? তৃতীয় বিশ্ব বলতে আমরা বুঝি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অপুষ্টিতে ঘেরা একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ, যাকে প্রথম বিশ্ব মানে পাশ্চাত্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুগ্রহ করে চলেছে। এই অনুগ্রহ কতখানি মানবিক, আর কতখানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যযুক্ত তা আমরা কখনো ভেবে দেখিনি। পাশ্চাত্য মিডিয়াইতো আমাদের শিখিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের ধারণা। আমরা তাদের কাছ থেকেই তো পেয়েছি মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যের মানচিত্র। এই যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার আয়োজন তাকি নিছক ভৌগলিক, না রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়?

একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে এই পৃথিবীকে আমরা আরো নির্মম, আরো যন্ত্রণাবিদ্ধ অবস্থায় বিভাজিত করতে চলেছি। এই বিভেদের দায়ও পশ্চিমের। এই বিভাজন প্রাচীরের একধারে আছে উন্নত বিশ্ব, অন্যধারে অনুন্নত দুনিয়া। এই বিভাজন আমরাও এখন অবচেতনভাবে মেনে নিয়েছি। পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী আকবর এস আহমদ একে বলেছেন Exploding ও Imploding Civilization। Exploding বা বিস্ফোরনোন্মুখ সভ্যতা বলতে তিনি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর দিকে ইংগিত করেছেন। আরো স্পষ্ট করে বললে জি-৭ রাষ্ট্রগুলোর দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। Exploding বলতে তিনি বিকাশমান ও প্রসারণমান এক সভ্যতার কথা বলেছেন যেখানে নব নব বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক চিন্তাভাবনার উদয় হচ্ছে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক দূরদর্শী, ও সাংস্কৃতিক চর্চার নব নব অভ্যুত্থান ঘটছে। অন্যদিকে Imploding বলতে তিনি এক চুপসে যাওয়া সভ্যতার ইংগিত দিয়েছেন যার অন্তর্ভূক্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র ও বিপর্যস্ত দেশগুলো, যাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের ভারে সবকিছু বিকল হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে এবং সবরকমের উদ্যোগী প্রচেষ্টা ও কল্যাণমূলক উদ্যোগ ভেস্তে যাবার অবস্থা হয়েছে। প্রথমটির চোখ আজ যেখানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও আশাবাদের

www.pathagar.com

আগুনে টগবগ করছে সেখানে দ্বিতীয়টি তার ইতিহাস ও প্রাচীনত্বের ভারে কাবু হয়ে পড়ছে।

এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে এইসব চুপসে যাওয়া সভ্যতাগুলোর কারুর পক্ষেই বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে পশ্চিমের মোকাবিলা বা কোন প্রকার বিকল্প হাজির করার অবস্থা নেই বলেই মনে হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম মুসলিম দুনিয়া। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে একমাত্র মুসলিম দুনিয়ার পক্ষেই আজ বিকল্প নেতৃত্ব বা শক্তির যোগান দেয়া সম্ভব, যা পশ্চিমের সাথে বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে সেয়ানে সেয়ানে দাঁড়াতে পারে। এটা অনেকের কাছে বিস্ময়কর ঠেকলেও অবিচিত্র কিছু নয়। সেটি সম্ভব হতে পারে একটি ভিন্ন পথে ঃ যেমন পাশ্চাত্যের চালিকা শক্তির মৌল উপকরণ রফতানী করে অথবা নতুন নেতৃত্বের উত্থান ঘটিয়ে (লক্ষ্য করুন, গাদ্দাফী থেকে খোমেনী, খোমেনী থেকে সাদ্দাম এবং সাম্প্রতিক কালের ওসামা বিন লাদেন যাদের নীতি ও পন্থা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিমের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে।) একমাত্র মুসলিম সভ্যতাই আজ বিস্ফোরণ ও পতনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে চোখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমী সভ্যতার উত্থান ইউরোপে এবং সেই উত্থান পর্বটি কখনোই মধুর ও গভীর গ্রাহী হয়নি। এ পর্বটির সাথে ইতিহাসের বহু হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ একাকার হয়ে আছে। ক্রুসেডের নির্মমতা থেকে শুরু, এরপর ষোড়শ শতকে এসে সভ্যতার বরকন্দাজরা ক্যারিবীয় আদিবাসীদের নির্মূল করে দেয়। প্রায় সমসাময়িক কালেই ইউরোপ থেকে সংখ্যালঘু ইহুদীদের উৎখাত করা হয়, যা নাজী হলোকস্টের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সভ্যতার নামে আফ্রিকায় শুরু হয় ইতিহাসের এক বেদনাবিধুর অধ্যায়, দাস ব্যবসা এবং মৃত্যু পোতে (Death Ships) করে সেই সব হতভাগ্য বনি আদমদের চালান করা হয় নতুন সভ্যতার তীর্থভূমি ইউরোপ ও আমেরিকায়।

অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার সেই সব উপজাতিদের কথা ভাবুনতো যারা সভ্যতার বলি হয়েছে এবং এখন এই সময়ে প্রায় একটি বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। সবশেষে পশ্চিমী সভ্যতাইতো আমাদের অতি কাছাকাছি সময়ে এই পৃথিবীকে দুদুটি বিশ্বযুদ্ধে ভারাক্রান্ত করেছে ও মানবতার ভিতকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে যার ভীষণতা ইতোপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। বেশুমার লোকের প্রাণহানি ও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে এই বিশ্বযুদ্ধ এক বিশ্বট্রাজেডিতে পরিণত হয়। আঠার আর উনিশ শতকে যে প্রলয়ংকরী সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান দেখি তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এশিয়া আফ্রিকার ঐতিহ্যগত সমাজ ও সংস্কৃতিতে আজও দুঃস্বপ্নের মতো ধেয়ে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদ এসব সমাজ ও সংস্কৃতির যা ধ্বংস করতে পারেনি, তা অবলীলায় বিকৃত করেছে। এটা সত্য সাম্রাজ্যবাদের কালেই আমরা পেয়েছিলাম, বিদ্যুৎ,

www.pathagar.com

দূরালাপনী ও রেলওয়ে ব্যবস্থা। এগুলোর সাথে কলোনির প্রভুরা নিয়ে এসেছিল তাদের ভাষা, রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও ক্রিকেটের মতো রাজকীয় খেলা। এই সব ভালগুণাগুণের পাশাপাশি দ্বীপান্তর, কাঁটা তারের বেড়া ঘেরা Concentration camp (কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক কাটাতারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল) কিংবা সাংস্কৃতিক রূপান্তর, বিপর্যয় ও ধ্বংস (Cultural Mutation) কলোনির থেকেই কি আমরা অর্জন করিনি? কলোনির প্রভুরা যখন সবকিছু গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত তখনও তারা চক্রান্তের হাতকে আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারেনি। বিদায় নেবার সময় তারা এসব অঞ্চলকে এমনভাবে ভাগ করে গেছে কিংবা এসব জায়গায় চক্রান্ত ও পরিকল্পনা মাফিক এমন সব জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে যা আজকে দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ ও রক্তারক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর সমস্যার মূলে চোখ ফেরালেই দেখি সাম্রাজ্যবাদের রক্তমাখা চোখ ধক ধক করে জ্বলছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে থাকে তার কোন সাম্রাজ্যবাদী অতীত নেই। যুক্তির খাতিরে কথাটার সত্যতা মেনে নেয়া গেলেও বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশ্চিমী সভ্যতার নেতৃত্ব প্রদানকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তাতে স্পষ্টতই ভাববার কারণ আছে ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে, মানসিক বিবেচনায় এবং ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অর্জন করতে পেরেছে। অধ্যাপক আকবর এস আহমদের ভাষায় ঃ America has begun to acquire the historical, psychological and geopolitical characteristics of an imperial power : an imperial Rome in ancient history and an Imperial Europe in contemporary times, visions of a new world order, dispatching troops all over the world to enforce it, and providing a lead to other nations in allmost every human activity are imperial signs (or neo imperial, if you like). (Post Modernism and Islam)

ইতিহাসের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে যুক্তরাষ্ট্র তার অশ্বেতাঙ্গ, দেশজ ভূমিপুত্রদের সাথে যে ব্যবহার করেছে কিংবা গত শতকে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সাথে শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার কোন রকমেই আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্যতাকে বৃদ্ধি করে না। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা ও নাগাসাকির মহাবিপর্যয়, ষাটের দশকে ভিয়েতনামে নাপাম ও নিবিড় বোমা (Carpet Bombing) বর্ষণ এবং আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ঘটে যাওয়া উপসাগরীয়

www.pathagar.com

যুদ্ধ ও আফগানিস্তানের লোমহর্ষক মারণযজ্ঞ ও ধ্বংসক্রিয়া আর যাই হোক আমেরিকান সভ্যতার বিভূতি বর্ধন করে না। লক্ষ্য করুন ইরাকে মার্কিন সৈন্যদের হঠকারী উচ্চারণ Bomb them into the stone age এর মধ্যে কি আমরা নব্য সাম্রাজ্যবাদীর পদধ্বনি শুনতে পাই না। বিশেষত ইরাক ও আফগানিস্তানে যা ঘটেছে ইতিহাসের কোন বাঁকেই আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগে এত নির্মম ও কার্যকরী ধ্বংসক্রিয়া আর কখনো ঘটেনি। স্টিলথ বোমারু বিমান, ক্রুজ মিজাইল, লেজার নিয়ন্ত্রিত স্মারট বোম্ব, প্যাট্রিয়ট মিজাইল, ক্লাস্টার বোমা প্রভৃতির সামনে ইরাকী ও আফগানীরা রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। যুদ্ধের অবসানে মুসলমানেরা এখন ভাবতে শুরু করেছে এরপর কে হবে সভ্যতার এই পাশব ধ্বংসকামিতার শিকার ঃ লিবিয়া না পাকিস্তান। ছল ও ছুতোর কোনটারই অভাব নেই সভ্যতার বরকন্দাজদের হাতে। প্রথমটির ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের অভিযোগ। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আনবিক প্রযুক্তি অধিকারের প্রচেষ্টা। বিশ্ববাসীর কাছে এর অর্থ পরিষ্কার। আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো আগামী দিনের বিশ্ব ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করবে। এরি নাম নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বা New world order। কঠোর পুলিশ প্রশাসকের মতো এরা মুসলিম দুনিয়ার বিশৃংখলা, আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ এবং দক্ষিণ আমেরিকার দারিদ্র্য ও গণতন্ত্রহীনতার দিকে দৃষ্টি রাখবে। কারো দুর্বিনীত ব্যবহার নজরে আসলে আর রক্ষা নেই, তার উপর সমগ্র শক্তি ও নির্মমতা প্রয়োগ করে অবশ্য অবশ্য শাস্তি দেওয়া চাই (ইরাকের সাদ্দাম ও আফগানিস্তানের তালিবানদের চেয়ে আর বড় উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?)। এর উপর সদা সর্বদা তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা দরকার তার ব্যাপারে কঠোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও উপনিবেশিত করার জন্য পশ্চিমের এই সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ব্যাখ্যা করা সহজ। কিন্তু এর অতিরিক্ত আরো কারণ আছে। পশ্চিমের জীবন যাত্রার মানকে সমুন্নত রাখতে এই গ্রহের সব সম্পদকে সেখানে চালান করা চাই। এই কারণেই আরবদের তেল তাদের কাছে এত প্রিয়। এজন্য যা যা দরকার তা তারা দ্বিধাহীনভাবে নিষ্পন্ন করছে (লক্ষ্য করুন আরবরা তেলের মালিক হলেও তেলের মূল্য নির্ধারণ এখনও কার্যত পশ্চিমের হাতে)। একই ভাবে বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। পশ্চিমের শাসন টিকিয়ে রাখতে এটাও অত্যন্ত জরুরি। একইভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনেকগুলো কারণ ও উপাদান একাকার হয়ে আছে যা পশ্চিমের বিশ্ব নিয়ন্তা হবার মনোভংগীকে ব্যাখ্যা করে। এর পরিণতির কথা কি কেউ গভীরভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করেছে? এটা ভাবা আজ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, দুটি ভিন্ন প্রজাতির মানুষ আজ একই পৃথিবীর দুপ্রান্তে বর্ধিত ও

www.pathagar.com

বিকশিত হচ্ছে। সুযোগ সুবিধা, সম্পদের অধিকার ও জীবনের চাহিদা পূরণের কথা বিবেচনা করলে পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষের মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে তাকি সহজে পূরণ হবার? আফ্রিকার দুর্ভাগ্য-পীড়িত মানুষ আর উত্তর আমেরিকার মানুষকে কি আজ একই প্রজাতির মানুষ বলে অনুমান করা যায়। এর উত্তর স্পষ্ট। এই বিভাজনের তীব্রতা ও তীক্ষ্নতা যত বাড়ছে পশ্চিমের আধিপত্য তত মজবুত ও ধারালো হয়ে উঠছে।

এই সভ্যতার সংকটকে আমরা এমনি ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি ঃ একটি হৃদয় যার অভ্যন্তরভাগ শূন্য। কোন নীতিবোধ নেই। কোন কল্যাণদর্শী এ সভ্যতার প্রাণকে গতিমান করে না। এর শক্তির উৎস প্রচণ্ড রকমের এক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ভীষণ রকমের এক স্বার্থবোধ ও বুদ্ধির তাড়না। অন্যকে প্রভাবিত, উপনিবেশিত করার রিরংসা আর বস্তুগত সাফল্য ও উপকরণ অর্জন করার এক মরিয়া প্রচেষ্টা। এই উন্মাদনাই এই সভ্যতাকে সচল রেখেছে, কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে এই উন্মাদনা হচ্ছে এ সভ্যতার অন্তর্গত দুর্বলতা, ভঙ্গুরতা ও নিঃশেষমানতার ইংগিত বহ, হতাশা ও বিপর্যয়ের এক সর্বস্পর্শী চিত্র মাত্র। প্রায় এক শতাব্দী আগে প্রাচ্যের কবি ইকবাল পাশ্চাত্যের এই সংকটের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলেছিলেন প্রাযুক্তিক সাফল্য যতই চোখ ও মনকাড়া হোক না কেন, এ সভ্যতার নৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। তাই ভিতরের চাপে এটি নড়বড়ে হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। আজ এক শতাব্দী পর ইরাক ও আফগানিস্তান সংকটের প্রেক্ষাপটে সভ্যতারূপী যে চেঙ্গিজ খানের চেহারা আমরা দেখেছি তাতে ইকবালের সেই ভবিষ্যৎবাণী আরও গভীর গ্রাহী হয়ে উঠেছে ঃ

হে পাশ্চাত্যবাসী!
আল্লাহর পৃথিবী একটি দোকানঘর নয়।
আর তোমরা যাকে সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রা মনে করেছ
তা মেকী বলেই প্রমাণিত হবে।
তোমাদের নিজেদের উদ্যত খঞ্জরের উপরই
আপতিত হবে তোমাদের সভ্যতা।
ভঙ্গুর বৃক্ষশাখায় নির্মিত কুলায়
ভেঙে পড়বে– আজ নয় আগামীকাল।
কখনো এ স্থায়ী হবার নয়।

৪

উত্তর আধুনিক পৃথিবীতে বসে পশ্চিমের বিপরীতে আমরা এখন মুসলমানদের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারি। আগেই উল্লেখ করেছি সাম্রাজ্যবাদের চাপে বা প্রভাবে মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ নড়বড়ে হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ

www.pathagar.com

যা ধ্বংস করতে পারেনি, তা সুচারুরূপে বিকৃত ও বিপর্যস্ত করেছে। এর পরিণতিতে মুসলিম সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে তা কখনো পূর্ণাংগ হতে পারেনি বা সেই পরিবর্তন কখনোই আংকিক নিয়মে অগ্রসর হয়নি। বিশ্বব্যাপী আজকের মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজগুলোর দিকে চোখ ফেরালেই এটা স্পষ্ট হবে। এসব সমাজকে যেমন পুরোপুরি ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন বলা চলে না তেমনি পাশ্চাত্যের ব্যাখ্যাত পুরোপুরি আধুনিকতার আলোক সম্পন্নও এটি হয়ে উঠতে পারেনি। এই না ঐতিহ্য ও না পাশ্চাত্যের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মুসলিম সমাজ এখন দ্বিধাগ্রস্ততায় দুলে উঠেছে। এরি মধ্যে যখন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যকামী রাষ্ট্রগুলো উত্তর আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হলো তখন দ্বিধাগ্রস্ত মুসলিম সমাজদেহে তার আঘাতটা হলো আরো প্রচণ্ড ও তীব্রতা সম্পন্ন। এ কালে প্রযুক্তির বদৌলতে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে শুধু আদান প্রদান চলছে না, মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ও কর্মপরিধি এতখানি বিস্তৃত হয়েছে যে পুরনো ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। একজন লেখকের ভাষায় ঃ 'geographical and territorial certainties seem increasingly fragile' (Cultural Anthropology- L. Malkki), সুতরাং এ কালের দ্বিধা ও বিমূঢ়তার কোন 'Stable points of origin, clear and final destinations and coherent group identities (সূত্র : পূর্বোক্ত) দৃশ্যমান নয়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াগুলোই আজ বিশ্বায়িত হয়েছে এবং এই বিশ্বায়িত দ্বিধা ও বিমূঢ়তাকে একজন লেখক বলেছেন Small world– যেখানে বিভিন্ন সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার লোকজন মিলে মিশে এক নতুন ভূমি ও সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। উত্তর আধুনিক বোদ্ধাদের ভাষায় এটি হচ্ছে Third culture বা Third space। আপন সংস্কৃতি থেকে বিশ্লিষ্ট বিচ্যুত এই তৃতীয় ভূমিতে দাঁড়িয়ে মুসলমানরা যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার প্রেক্ষাপটে আজ তাদের 'ঘরে ফেরার উৎকণ্ঠা' গভীর হয়ে উঠেছে। এতকাল মুসলমানরা এক বিমূঢ়তার কাল অতিক্রম করেছে, পাশ্চাত্যের চাপে ও প্রভাবে তাদের ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ও পশ্চিমের ভাবনা চিন্তাকে তারা 'mirror each other at acute or oblique angles, mutually affecting each other's representations, setting off mutating variations (Debating Muslims : Cultural dialogues in post modernity and tradition- M.J. Fischer and M. Abedi)।

নিজের মধ্যে চলা অনবরত এই আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের পারস্পরিক যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে গিয়ে মুসলমানরা আজ হয়ে পড়েছে সাংস্কৃতিক ভাবে de-territorialized। তার মানে আপন সংস্কৃতির জমিনে মুসলমানের পা আজ

www.pathagar.com

গভীরভাবে প্রোথিত নেই। এই de-territorialization এর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মুসলমানরা আজ তাদের সংস্কৃতির সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করতে উদ্যোগী হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী নব-জাগরণকামী মুসলমানদের যে আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি তা এ প্রেক্ষাপটেই আমাদের বিচার করতে হবে। এই আত্মজাগরণকামী মুসলিম প্রবণতাকে পাশ্চাত্য মিডিয়া আজ সন্ত্রাস ও মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এটিকে নির্মূল ও ধ্বংস করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে আয়োজন শুরু হয়েছে পাশ্চাত্য তার নাম দিয়েছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। পাশ্চাত্য তার বিরুদ্ধে কোন চ্যালেঞ্জকে সহ্য করতে রাজি নয়। এ কারণেই তাদের কাছে De-territorialized (যা মূলত de-moralized ও) মুসলমান সংস্কৃতিই কাম্য যা পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। ঠিক যে মুহূর্তে পাশ্চাত্যের ব্যাখ্যাত Third space এর সীমানা ভেঙে নতুন সময়ের মুসলমানরা বেরিয়ে আসতে চাইছে তখনই পাশ্চাত্য অস্থির হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বায়নের নামে মৌলবাদকে ঠেকাতে অগ্রসর হয়েছে। উত্তর আধুনিকতাকে আজ এভাবে ব্যাখ্যা করা জরুরি হয়ে পড়েছে বিশেষ করে এ কালে সভ্যতার দ্বন্দ্ব যে বিশ্বায়ন ও মৌলবাদের আকারে গভীর হয়ে উঠেছে উত্তর আধুনিকতা বুঝতে হলে সেদিকে আমাদের নজর দেয়া চাই।

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিকতার চোরাবালি

১

আধুনিকতার মতো উত্তর আধুনিকতার চিন্তা ভাবনার বিকাশ পাশ্চাত্য দেশে। আধুনিকতা যেমন আমাদের জীবনকে এক সময় নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি উত্তর আধুনিকতাও একালে আমাদেরকে নানা প্রান্ত থেকে শিহরিত করছে। আধুনিকতার মতোই এই শিহরণ আমরা অনুভব করছি কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে, বাকীটা পাশ্চাত্যের প্রভাবে। এসব আলোচনা ও তত্ত্ব চিন্তা আমাদের মনোজগতে কতটুকু আলো ফেলে, আর কতটুকু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে বৈকি! আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতা যাই বলি না কেন এতো অনেকটা পাশ্চাত্যের সম্পদ। এর সাথে আমাদের সম্পর্কটা কি এবং সেই সম্পর্কের বাস্তবতা ও রাজনীতির কি কোন প্রয়োগিক মূল্য আছে আমাদের জীবনে, বর্তমান পৃথিবীর আর্থ-রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির কারণেই সেটা ভাবা আজ জরুরি হয়ে উঠেছে। বহুকাল ধরে কলোনির রাজত্বে বাস করতে করতে আমরা এই বিশ্বাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, পাশ্চাত্য ছাড়া বোধ হয় আমাদের কোন পরিত্রাতা নেই। পাশ্চাত্যের জমিনে যাই ফলুক না কেন তার গুণ ও মূল্য বিচার নির্বিশেষে তাকেই আমরা আমাদের জন্য এতকাল অবধারিত হিসেবে বিবেচনা করেছি। হয়তোবা সেই বোধ থেকেই পাশ্চাত্য ও আধুনিকতাকে আমরা একার্থে দেখেছি এবং আধুনিকতার উল্টোপিঠ হিসেবে পাশ্চাত্যের দিকে সম্ভ্রমের সাথে চোখ তুলেও তাকিয়েছি।

কলোনির প্রভুরা আমাদের শিখিয়েছিল তোমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য বলে তেমন কিছু নেই, যা আছে তা নিতান্তই অগৌরবের। সুতরাং উন্নতি করতে চাও, প্রগতি করতে চাও আমাদের পথ ব্যতীত তোমাদের ভিন্ন কোন উপায় নেই। কলোনির প্রভুদের এ আজ্ঞার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার ঃ To be successful, you must be like us; our way is the only way. (The clash of civilizations and the remaking of world order- Samuel P. Huntington) কলোনির প্রভুদের যুক্তিও ছিল চমৎকার, তোমাদের বোধ, বুদ্ধি ও মুল্যবোধ যেহেতু প্রগতির বাধক, সুতরাং তা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় ঃ the religious values, moral assumptions, and social structures of these, (non-western) societies are at best alien, and sometimes hostile, to the values and practices of industrialism. (সূত্রঃ পূর্বোক্ত)

www.pathagar.com

প্রগতি-উন্নতি করতে হলে তাই চাই ঃ Hence development will require a radical and destructive remaking of life and society, and often, a reinterpretation of the meaning of existence itself as it has been understood by the people who live in these civilizations. (সূত্রঃ পূর্বোক্ত)

কলোনির প্রভুরা তাই আমাদের সমাজ ও জীবনের নব নির্মাণ করবার কথা বলেছিল এবং সে দায়িত্বকে তারা বলেছিল White Men's Burden। প্রভুদের এই দায়িত্বের যথাযথ বিপণন ও বিতরণের মধ্যেই আছে আমাদের আধুনিকতা সচেতন হয়ে উঠবার প্রথম অভিজ্ঞতা। লক্ষ্য করার বিষয় হলো সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পরামর্শ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আমরা আধুনিকতার সবক লাভ করি। আধুনিকতাকে আমরা সেদিন কোন রকম সৃষ্টিশীলতা, বিকাশশীলতা ও স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে উপলব্ধি করতে পারিনি। উপর্যুপরি এ আধুনিকতার কনসেপ্ট তৈরি হয়েছিল ইউরোপে এবং এটি সে অর্জন করেছিল দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। ইউরোপের এই অভিজ্ঞতার ফসলকে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন তাদের মত করে উপনিবেশিত দেশগুলোতে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে চাপিয়ে দিতে শুরু করলো তখন তার ফল হলো মারাত্মক। অভিজ্ঞতা বলে প্রকৃতপক্ষে কোন আমদানীকৃত নীতি ও আদর্শবোধই একটি বিশেষ সমাজের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ফলত মুসলিম সমাজে আধুনিকতা কোন ফলপ্রসু সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারেনি। উল্টো সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতার খোলসে মুসলিম সমাজের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটিয়েছে। এতকাল যে নীতি ও মূল্যবোধ মুসলিম সমাজের সংহতি ও সাম্যাবস্থা রক্ষা করতো সাম্রাজ্যবাদ তা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে গেছে। বলা চলে সাম্রাজ্যবাদ আমাদেরকে আধুনিকতার আফিম খাইয়েছিল, সে আফিমের ঘোরে আমরা বুঝেছিলাম আধুনিকতা মানে হচ্ছে সেকুলারিজম, ইউরোপীয় ভাষাসমূহ (ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি), প্লুরালিজম, আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাসমূহ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কলোনির কর্তারা আমাদের বুঝিয়েছিল এগুলো অবিরাম জপ করতে পারলেই তাদের মতো আমাদেরও রেঁনেসাস আসবে। এনলাইটেনমেন্ট দেখা দেবে, নতুন বিপ্লবের সূচনা হবে। সুতরাং এতকাল আমরা যা প্রোডিউস করেছি, এখন তোমরা তা রিপ্রোডিউস করো। এতেই মুক্তি, এতেই ত্রাণ। কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলে? উপনিবেশিত দেশগুলো বিশেষত মুসলিম দেশগুলো কি তার মুক্তির লক্ষ্য আজও অর্জন করতে পেরেছে?

সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে আংশিকভাবে হলেও মুসলিম জনজীবনকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন ও সেকুলার করে তুলতে পেরেছে। ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পনামাফিক ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা তার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য বদলে

www.pathagar.com

ফেলেছে। ইসলামী শরীয়ার বদলে পশ্চিমী 'পজিটিভিজম' বাদী আইনকানুন, তা ইংরেজ, ফরাসী যা হোক না কেন, প্রবর্তিত হয়েছে।

সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা– সর্বত্র সেকুলার প্রতিষ্ঠানগুলো চালু হয়েছে। এই নবনির্মাণের উদ্দেশ্য কি? গ্লাডস্টোনের সেই বিখ্যাত উক্তি আমরা মনে করতে পারি, কুরআন হাতে নিয়ে কমন্স সভায় তিনি ঘোষণা দেন ঃ So long as there is this book, there will be no peace in the world.

এর অর্থ পরিষ্কার ঃ মুসলমানকে কুরআন থেকে, ইসলামকে তার সাংস্কৃতিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং ইসলাম ও মুসলমানকে জীবনী শক্তিবিহীন করে তোলা এবং তখনই কেবলমাত্র সম্ভব পাশ্চাত্যের পক্ষে মুসলিম জনগণের উপর তাদের প্রভুত্বকে বিস্তারিত করা।

আধুনিকতা পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মনোভংগীকে ব্যাখ্যা করে। এই মনোভংগীকে কোনভাবেই পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় এথিকস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আধুনিকতার অন্যতম উপকরণ সেকুলারিজম হলেও এটি মূলত ইউরোপের খ্রিস্টীয় চার্চ ও রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও পরিণতিতে এক ধরনের আপোসকামিতার ফসল। সেকুলারিজমের অর্থ এই নয়, পাশ্চাত্য তার খ্রিস্টীয় আধিপত্যকামী মানসিকতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। মুলত একই কারণে তারা আজও অন্যকে উপনিবেশিত করার লক্ষ্য থেকে একবিন্দু সরে আসেনি। শুধু কৌশল পাল্টেছে, উদ্দেশ্য অভিন্ন রয়ে গেছে। পৃথিবীব্যাপী পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের প্রভাব ও শাসন বরাবরের মতো অক্ষুণ্ন রাখাই হচ্ছে এর একমাত্র উদ্দেশ্য। মধ্যযুগের ক্রুসেড, আঠার ও উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ এবং হালজামানার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ড একই খ্রিস্টীয় সাংস্কৃতিক মনোভংগীর বহুমাত্রিক পরিচয় মাত্র।

আঠার আর উনিশ শতকে ইউরোপীয়রা এই পৃথিবী নামক গ্রহে চষে বেড়িয়েছে gold and god এর সন্ধানে। এই সন্ধান প্রক্রিয়াতো আজও শেষ হয়নি। একটা উদাহরণ দেয়া যাক ঃ কলোনির যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদেরকে সেকুলারিজমের নীতি ও পন্থা শিখিয়েছে, নবজাগরণের কথা বলে তারা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার তত্ত্ব গিলিয়েছে আমাদের। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই নিয়ে গিয়েছে খৃস্টান মিশনারীর দল। এই মিশনারী ওয়ার্কের সাথে সেকুলারিজমের তত্ত্ব কি একসাথে এক ছাদের নীচে বসবাস করতে পারে? পাশ্চাত্যের ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের এই নমুনা আজও চলছে। পাশ্চাত্যের সরকার ও পুঁজিপতিদের (যারা মূলত সেখানকার সরকার চালায়) প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নে আজও মিশনারীরা ক্ষুধা পীড়িত এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোতে সেবা ধর্মের মুখোশ পরে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করে চলেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য মুসলিম দেশগুলোতে খুঁজে বেড়াচ্ছে মৌলবাদের জুজু। এই খ্রিস্টান

www.pathagar.com

মিশনারী বা মৌলবাদী যাই বলি না কেন, এরা পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ মদদে আজকের তিমুর এবং ফিলিপাইন ও নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টান-মুসলিম রক্তক্ষয়ী সংঘাতের জন্য পুরোপুরি দায়ী। পাশ্চাত্যের মিডিয়া আজ ভীষণভাবে চিন্তিত Political Islam বা Muslim Fundamentalism এর উত্থানে। কিন্তু এই Political christianity বা Christian Fundamentalism এর কথা কে বলবে? খ্রিস্টধর্ম বরাবরই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করেছে। বলা চলে এই খ্রিস্টান মিশনারীরা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের Spiritual Force। আমরা মাদার তেরেসাদের সেবাধর্মের কথা শুনি। কিন্তু এই 'মাদাররা' যে মূলত মানবতার মাদার নন, উল্টো সাম্রাজ্যবাদের 'মাদার' হিসেবে এই গ্রহের নানা প্রান্তে নীরব সাধিকার মতো কাজ করে চলেছেন তা আধুনিকতা নামক বিরাট গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টালে স্পষ্ট হবে। আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত জেমো কেনিয়াত্তার কথা আমরা মনে করতে পারি : 'ইউরোপীয়রা যখন আমাদের দেশে আসে তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমরা ছিলাম এদেশের মালিক। যখন ওদের বিদায়ের সময় এলো তখন দেখছি পুরোপুরি উল্টো চেহারা ঃ দেশটার মালিক বনে গেছে ওরা, আমাদের হাতে শোভা পাচ্ছে বাইবেল।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টবাদ, আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ একাত্ম। এদের মধ্যে পার্থক্য করা মুশকিল। অথচ কলোনির প্রভুরা নিরন্তর আমাদের উপদেশ বিতরণ করেছে ইসলাম ত্যাগের, সেকুলারিজম হচ্ছে সেই পরিত্যাগের মেকানিজম। সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলোতে সৃষ্টি করেছে একটি সাবকালচার। এ সাবকালচারের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সমাজের এলিটশ্রেণী ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, সিভিল ও সামরিক আমলা এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ। এরা সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে প্রাগ্রসর ও আমজনতার উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এরা মুসলিম দেশগুলোর প্রশাসনের নিয়ামক স্থানগুলোতে অবস্থান করছে এবং সকলেই এই একটি ব্যাপারে একমত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা ইসলামের পক্ষে একালে অসম্ভব। এরা পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে এতখানি প্রাণিত যে পাশ্চাত্যের বাইরে দ্বিতীয় কোন বিকল্প হাজির করা তাদের সামনে বাহুল্য। কলোনির যুগ অতিবাহিত হয়েছে, আবার অতিবাহিত হয়নি। কারণ এই এলিটশ্রেণী এখনও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ও মর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণে খেটে চলেছেন এবং এভাবেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আজও কলোনির যাতাকলেই আটকে আছে। এই এলিটশ্রেণীর সাথে আমজনতার সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল, কখনো কখনো একেবারেই 'না' বললে চলে। এলিটদের বোধ, বুদ্ধি, মনন ও সংস্কৃতি চেতনার সাথে আমজনতার দুস্তর ব্যবধান। এমনিভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যেমন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এক প্রচণ্ড ভেদরেখা রচিত হয়েছে

www.pathagar.com

তেমনি পাশ্চাত্যপন্থী ও ইসলামপন্থী হিসেবেও জনগণের মধ্যে বিভাজনের রেখা আভাসিত হয়ে উঠেছে। এই ভেদবুদ্ধি সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি এবং এই বিভাজন যত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী করা যায় ততই সাম্রাজ্যবাদের লাভ। কারণ এর ফলে বিভাজিত, বিচ্ছিন্ন ও বিভেদাপন্ন মুসলিম সমাজে তাদের প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হবে। এরকম একটি ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল সমাজে আগের মতই পাশ্চাত্যের নীতি ও পন্থার এক্সপেরিমেন্ট চলছে। সেকালে সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি এসব এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে, এখন এসব এলিটরা পাশ্চাত্যের প্যাকেজ দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নেমেছে। সেকালে আধুনিকতার নামে রেঁনেসা ও এনলাইটেনমেন্টের কথা বলা হয়েছে। একালে বলা হচ্ছে নারী মুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার এবং রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নানা তত্ত্ব। সেদিন ও এদিনের এ তত্ত্বপ্রয়োগের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন ঃ মুসলিম সমাজের স্থিতিশীলতাকে ভেঙে চুরে বিপর্যস্ত করে দেয়া।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো গত কয়েক শতক ধরেইতো পাশ্চাত্যের এই তত্ত্বপ্রয়োগ চলছে, কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্যের তো কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ একটাই ঃ মুসলিম সমাজের অন্তর্গত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে এসব নীতি ও পন্থার রয়েছে মৌলিক তফাৎ এবং একই কারণে এসব নীতি মুসলমান সমাজের সাথে একাত্ম হতে পারছে না। পাশ্চাত্যের এসব নীতি ও পন্থা হচ্ছে চোরাবালির মতো, যেখানে পা দিলে পা শুধু তলিয়েই যায়, উঠে দাঁড়ানোর মতো শক্তি থাকে না। আর এ কারণেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং পতনের প্রান্ত থেকে ইসলামের উত্থান আভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই 'আল ইসলাম হোয়াল হাল'– ইসলামই সমস্যার সমাধান এই শ্লোগানটি এখন মুসলিম দুনিয়া জুড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মুসলিম সমাজে আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতা বুঝতে গেলে এই প্রেক্ষাপটটি সর্বাগ্রে মনে রাখা চাই।

২

উত্তর আধুনিকতা কেন এলো? পশ্চিমের জীবনদৃষ্টি, সমাজ-সংস্কৃতি ও মনোজগতকে আধুনিকতা অনেক দূর প্রসারিত করে দিয়েছে সন্দেহ নেই। পশ্চিমের তাত্ত্বিকরা এক সময় বলেছিলেন আধুনিকতাই হচ্ছে মানুষের শেষ ভরসা, চূড়ান্ত নিদান। বিজ্ঞান আর রিজন মানুষের সম্ভাবনার দুয়ারকে করেছে অবারিত। মানুষ হয়ে উঠেছে স্বয়ম্ভু, সে আজ নিজেই নিজের নিয়ন্তা। আধুনিকতার স্বভাব হচ্ছে সবকিছুকে অস্বীকার করার পাশাপাশি নিজের নিয়তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত এক সক্রিয়তা। পাশ্চাত্যের ভাবজগত ও মনোজগতের দিকপাল মার্কস-হেগেল-ফ্রয়েড-নীটশে-ফয়েরবাখ থেকে একালের সার্ত্রে-টয়েনবী-রাসেলদের সকলের যুক্তির লক্ষ্য বরাবর এক ঃ মানুষ নিজেই

www.pathagar.com

নিজের ঊর্ধ্বে ওঠে, নিজের অন্তর্গত চেতনার জোরে পৌঁছে যায় অসীমতায়, যার শেষ প্রান্ত স্বাধীনতা। এই আত্মবিনাশী স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মনোভংগির দিক দিয়ে পশ্চিমকে করেছে স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী। এই চেতনা পাশ্চাত্য অর্জন করেছে রেঁনেসা, এনলাইটেনমেন্ট ও শিল্প বিপ্লবের ঐতিহাসিক সময় ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এই আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের উদ্ভব, ইউরোপের মধ্যযুগকে অস্বীকার করেছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হলো একই সময় আধুনিকতা ধর্ম ও এথিকসের বিকল্প হিসেবেও উপস্থিত হলো। এটা সত্য আধুনিকতা জীবনকে সমর্থন করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই সমর্থন ছিল সকল সংযম, শুভাশুভ ও এথিকসের নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। ফলে আধুনিকতার আভ্যন্তরিক কাঠামো হয়ে উঠলো ভঙ্গুর, শিথিল ও আধুনিকতার তাত্বিকদের সামনেই অবিনশ্বর নয়, নশ্বর। আধুনিক মানুষ হয়ে উঠলো অনিয়ন্ত্রিত ও মারমুখো। পশ্চিমের চেতনায় মানুষের চালিকাশক্তি হিসেবে যতই যৌক্তিকতার প্রাধিকারের কথা বলা হোক না কেন আধুনিকতার চরমাবস্থা আজ দেখা দিয়েছে পর্ণো-পপ সংস্কৃতি, ড্রাগ, রক মিউজিক ও যৌনাচারের উত্তুঙ্গ বিকাশের মধ্যে। যৌক্তিকতা দিয়ে আধুনিকতার এই অব্যবস্থা ও বিশৃংখলাকে কি ব্যাখ্যা করা যায়?

আধুনিকতা যেমন মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করেছে তেমনি করেছে নির্বাসিত। আধুনিকতার প্রধান ব্যাপার হলো ঃ আত্মচেতনা। ব্যক্তি কেবল ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়। একাকী জীবন, তার যন্ত্রণা, বোধ, বেদনা, দুঃখ-দাহ কেবলি তার। স্মরণ করুন কোলরিজের কবিতা ঃ

Water, water, everywhere,
And all the boards did shrink;
Water, water, everywhere,
Nor any drop to drink.

কোলরিজ কি আগেই টের পেয়েছিলেন আধুনিকতার মর্মস্বরূপে এই ভয়ংকর নির্বাসনের বেদনা? Isolation ও Aggression উভয়ই যুগপৎভাবে আধুনিকতার কাঁধে এখন সওয়ার। এই হচ্ছে আধুনিকতার চরম পরিণাম বা চরম পর্যায়, যার নাম উত্তর আধুনিকতা। উত্তর আধুনিকতা কি তাহলে আধুনিকতার এক ধরনের প্রতিবাদ? অথবা আধুনিকতাই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে দ্রুত রূপ পাল্টে উত্তর আধুনিক হয়ে যাচ্ছে। হয়তো দুটোই। কারণ আধুনিকতার ডিকাডেন্স স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং যে কোন সভ্যতাই তার ডিকাডেন্সের মূহূর্তে বিমূঢ়তা ও সিদ্ধান্তহীনতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। উত্তর আধুনিক তাত্বিক ইহাব হাসান, একেই হয়তো বলেছেন 'অমীমাংসিতের কাল'।

এই অমীমাংসা ও সিদ্ধান্তহীনতার প্রবণতা প্রথমে আমরা পাশ্চাত্যের শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, সংগীত প্রভৃতিতে মূর্ত হতে দেখি। যে পাশ্চাত্যের নাট্যমঞ্চে

www.pathagar.com

আধুনিকতার প্রথম শুটিং ও অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল, সেই পাশ্চাত্যেই এর বিরুদ্ধে জন্ম হলো প্রতিক্রিয়া। উত্তর আধুনিকেরা বললেন, আধুনিকতা নিজেই এখন একটি সংকট, এর প্রোজেক্ট অসম্পূর্ণ। যেহেতু অসম্পূর্ণ, তাই এর সম্পর্কে আমাদের এতদিনকার মনোভংগি নতুন করে ঝালিয়ে নেয়া দরকার।

লক্ষ্য করবার বিষয় হলো আধুনিকতার বিপক্ষে এই শিল্প সাহিত্যগত প্রতিক্রিয়া মূলত ধনতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধেও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। কারণ আধুনিকতা আর পুঁজিবাদ হচ্ছে দুটি যমজ বোন। চরিত্র বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করা মুশকিল।

এ কারণেই আমরা দেখি প্রথম যুগের উত্তর আধুনিকেরা সবরকমের Institutional art (বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান শিল্প) কে আক্রমণ করেছেন। এসব প্রতিক্রিয়া আমাদের মনে করিয়ে দেয় আভাগার্দ ও পরাবাস্তববাদের কথা। শিল্প সাহিত্যগত এসব আন্দোলন মূলত আধুনিকতার বিরুদ্ধেই এক ধরনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল। এসবের সাথে সেকালের সিভিল রাইট মুভমেন্ট, এন্টিওয়ার মুভমেন্ট, পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন গভীরভাবে যুক্ত। উত্তর আধুনিকতার আলোচনায় এ সব রাজনীতি ভারাক্রান্ত আন্দোলনগুলোর উপস্থিতি এ কারণে প্রয়োজন যে, এগুলো ছাড়া সেদিনের উত্তর আধুনিক এসথেটিকস তৈরি হতে পারতো না। ঠিক যেমন আজকের উত্তর আধুনিকতার আলোচনায় বিশ্বায়ন বিরোধী সংগ্রাম একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিল্প-সাহিত্যগত প্রবণতার পাশাপাশি উত্তর আধুনিকতার শরীরে সমকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতাগুলোও সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

প্রথম যুগের উত্তর আধুনিকেরা প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প চর্চার বিরোধিতা করেছিলেন এই কারণে যে এসব শিল্পকলা ছিল প্রতিদিনের জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। জীবন বিচ্ছিন্ন শিল্পকলা ও নান্দনিকতা যা কিনা ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সব ধরনের এসট্যাবলিশমেন্টের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক তার বিরুদ্ধে ছিল এদের রোষ। এরা সেকালের উচ্চমার্গী শিল্পকলার বিপরীতে এক ধরনের পপুলিস্ট কালচারের কথা বলেছিলেন। ষাটের দশকের আভাগার্দ আন্দোলনের এই ছিল পরিচয় এবং এর উপর বুনিয়াদ করেই উত্তর আধুনিকতার যাত্রা শুরু হলো। পপ ভার্নাকুলার, সাইকেডেলিক আর্ট, এসিড রক, স্ট্রীট থিয়েটার, ফটোগ্রাফী, ফিল্ম-ভিডিও, কম্পিউটার সংস্কৃতির মধ্যে এর বিচিত্র প্রকাশ ঘটে। তবে এ সব নতুন প্রবণতা ও ঝোকগুলো যা কিনা আধুনিকতার সংকট উত্তরণে এসেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে তাকি আসলেই সংকট উত্তরণে সহায়ক হয়েছে? বরং পাশ্চাত্যে উত্তর আধুনিকতার যে চেহারা এখন দেখি তা কেমন যেন দুর্লক্ষ, দুর্লঙ্ঘ্য, দুরপনেয় ও অনধিগম্য। এ যেন এক মিছে মায়া, ধরা দিয়েও ধরা দেয় না, এ যেন আলেয়ার আলো। এতে স্পষ্ট হয় উত্তর আধুনিকতার আসলে নির্ধারণ করে দেয়ার, নির্দেশনা

www.pathagar.com

দেয়ার মতো কোন অমোঘ চরিত্র নেই। হয়তো এ কারণেই উত্তর আধুনিকতার আজও কোন শ্রেণীবদ্ধ সংজ্ঞা নির্মাণ করা যায়নি। কেউই এ যাবৎ পারেননি উত্তর আধুনিকতার একটা প্রকৃত রূপ ও ইমেজ গড়ে তুলতে। যে যার মতো নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে উত্তর আধুনিকতার এসথেটিকস গড়ে তুলেছেন। উত্তর আধুনিকতার যেহেতু কোন রূপ নেই আগেই বলেছি তাই তার শরীরে বহু রূপ ও শ্রীর নাচন লেগেছে।

এটা অবশ্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে না উত্তর আধুনিকতা, আধুনিকতার যে সিনিসিজম (Cynicism-হতাশাবাদ) তার বুক চিরে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। পুরো পাশ্চাত্য আজ তাই আধুনিকতার সিনিসিজম থেকে যেয়ে পড়েছে উত্তর আধুনিকতার সিনিসিজমে। এমনিভাবে এক সিনিসিজম অপর সিনিসিজমকে বুকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তবে একথা সত্য সিনিসিজম হোক আর আশার আলোকবর্তিকা হোক, প্রত্যেক নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই কিছু তত্ত্ব ও চিন্তার খোরাক। এক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতারও কোন তত্ত্বের অভাব হয়নি। পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এদিক দিয়ে বেশ এগিয়ে গেছেন বলে মনে হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন মিশেল ফুকো এবং জাক দেরিদা। এদের সাথে আরও আছেন ঃ য়ুর্গেন হেবারমাস, এ্যান্থনি গিডেনস, রোলা বার্থ, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, জঁ-ফ্রাসোঁয়া লিওতার, বাখতিন, গায়ত্রী চক্রবর্তী, লাঁকা ও আলথ্যুসার। এরা সবাই মোটের উপর সিনিসিজমের শিল্পী। একমাত্র ব্যতিক্রম যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ফিলিস্তিনের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদ। তিনি রীতিমত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আধুনিকতার অন্তঃস্থ সাম্রাজ্যবাদের টেক্সটকে। সাঈদের এই বিশ্লেষণ আধুনিকতার একটা মনোভংগি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে পেরেছে বলে মনে হয়।

সিনিসিস্ট শিল্পী ও সাঈদের প্রাচ্যতন্ত্রের পাশে উত্তর আধুনিকতার জমিনে নতুন আর কয়টি জিনিস যুক্ত হয়েছে। একটি হলো ফেমিনিজম বা নারীতন্ত্র। এ নারীতন্ত্রের লক্ষ্য রেডিক্যালিজমের দিকে। অন্যটি হলো পাশ্চাত্যের সাথে একই সময় তথাকথিত নীরব, শব্দহীন ও জড় প্রাচ্যের শিল্পকলা, রাজনীতি ও মূল্যবোধের ধরনগুলো নিয়ে পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা, যা এতকাল ছিল অনুল্লেখিত।

৩

উত্তর আধুনিকতার উদ্ভট যুক্তিধর্মের প্রধান পরিকল্পক হচ্ছেন মিশেল ফুকো। সিনিসিজম যে মানুষকে কতদূর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ও অব্যবস্থিতচিত্ত করে তোলে মিশেল ফুকো হচ্ছেন তার বড় নজির। তিনি 'পাগলামী ও সভ্যতা' বলে একটা

www.pathagar.com

বই লিখেছেন। এ বইয়ের মর্মার্থ নিতান্তই অভিনব। তিনি বলতে চান ঃ পাগলামী মূলত জ্ঞানের একটা ধরন, যা বুর্জোয়া সংস্কৃতির পক্ষে বোঝা অসম্ভব। বোঝা যাচ্ছে তিনি বুর্জোয়া বা আধুনিক সংস্কৃতির অবসান চান। কিন্তু কোন পথে? ফুকো পাগলামী বিকাশের ভিতর একটা লজিক বের করেছেন যা নাকি জ্ঞানের রূপকল্প হিসেবে আমাদের বিবেচনার যোগ্য। এই পাগলামী সেই জিনিস যা নাকি নিশ্চিহ্ন করে দেয় সমস্ত বেড়ী, শিকল ও সীমা আর হয়তো এভাবেই ফুকোর বিশ্বাস বুর্জোয়া সংস্কৃতি নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। কিন্তু সব বেড়ি কেটে দেয়া, মানুষের শরীর, মন, জৈব ও আধ্যাত্মিক সত্তার অস্বীকার এবং সবশেষে দীর্ঘায়ু মানব সভ্যতার স্বপ্নে অবিশ্বাস এই যদি হয় ফুকোর পোস্ট মডার্নিজমের মুড তাহলে মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? মিশেল ফুকোর চোখে মানুষের অস্তিত্ব মূল্যহীন। এটি সৈকতের পদরেখার মতো যা তরংগাভিঘাতে মুছে যেতে পারে। ফুকো তাই মনে করেন মানুষের আত্মা ও অবয়বের de-construction সম্ভব। এই de-construction কি এক ধরনের destruction নয়?

মানুষের জন্য এই অন্ধকার গন্তব্য নির্ধারণ করে ফুকো কি শুধু নিজের অলীক স্বপ্নের বিবৃতি দিয়েছেন, না এটিই হচ্ছে একালের আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতার চরম নিয়তি বা ট্রাজেডি?

মিশেল ফুকোর উত্তর আধুনিকতার সংস্কৃতি আসলে পাগলামীর সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির একটা চূড়ান্ত প্রকাশ হচ্ছে পর্ণো পপ কালচার। বোঝাই যায় সিনিক ফুকো আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান। উত্তর আধুনিকতার অপর প্রধান সিনিক চিন্তক ইহুদী পিতার পুত্র জাক দারিদা, ফুকোর মতোই যিনি মানুষের অবিনাশী সম্ভাবনায় আস্থাহীন। মানুষের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যিনি হতাশ ঃ বিনাশ ও নৈরাজ্যে তার গোপন আস্থা। মানব জগত বিষয়ে বিতৃষ্ণ এই চিন্তক শুধু টেক্সটের কথা বলেন, কিন্তু টেক্সটের পিছনের মানুষটি তার কাছে অত্যন্ত গৌণ। দারিদা এমন চিন্তক যিনি মানুষের ডি-কনস্ট্রাকশন করে মানুষকে পাঠ করেছেন এবং এই পাঠ প্রক্রিয়ায় তার কাছে মানুষ হয়ে উঠেছে তুচ্ছমূল্য। তাহলে কি শেষ বিচারে উত্তর আধুনিকতা মানুষকে অগ্রাহ্য করতে চলেছে?

অন্যদিকে উত্তর আধুনিকতার গোপন শরীরে সিনিসিজমের ভিন্ন এক ছবি জায়মান হয়ে উঠেছে, এর নাম ফেমিনিজম বা নারীবাদ। নারীবাদ থেকে জন্ম নিয়েছে প্রথাবিরোধী এমন একটা মনোভংগি যা সকল স্থিতিশীল চিন্তাভাবনা বিশেষ করে পুরুষকেন্দ্রিক ভাবনালোককে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনেছে। নারীবাদের মূল কথা হচ্ছে একধরনের রেডিক্যাল চিন্তা ভাবনা, যার মধ্যে ধারণা দেয়া হয়েছে একমাত্র নারী হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য। কেন এই উগ্রপন্থা? আধুনিকতা আমাদের এক মানবিক চৈতন্যের কথা শুনিয়েছিল। এ বোধ বিস্তারিত হয়েছিল নারী পুরুষ নির্বিশেষে। নারী নারী হিসেবে নয়, পুরুষ পুরুষ হিসেবে নয়, একমাত্র

www.pathagar.com

মানুষ হিসেবেই তাদের মূল্য নির্ণিত হওয়া চাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার রথী মহারথীরা তাই এতকাল তীব্র কণ্ঠে দাবি করেছেন আমাদের এখানে কোন Gender discrimination-লিঙ্গ বৈষম্য নেই। ওটা তৃতীয় বিশ্বের বিশেষত মুসলিম দুনিয়ার সমস্যা। এগুলো কি শুধুই কথার কথা। বাস্তবতাতো অন্য রকম কথা বলে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সভ্যতা নারীকে কি আর ১০ টা কমোডিটি'র মতই ব্যবহার করছে না। মডেলিং, ফ্যাশন শো আর সুন্দরী প্রতিযোগিতার মধ্যেই প্রধানত তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আপাত দৃষ্টিতে নারী সকল অধিকারের দাবিদার হলেও, পাশ্চাত্যের সমাজে নারীর স্থান কি পুরুষের মতই? সেখানকার যত রকমের petty job নারীরাই করে, পুরুষরা নয়। নারীদের জন্য বরাদ্দ হলো sales girl, cleaner, typist আর secretary'র মতো কাজগুলো। Free world আর Free society'র দাবিদার পাশ্চাত্যের মতো সমাজেও কয়জন নারী শীর্ষস্থানে পৌঁছুতে পেরেছে। এ সংখ্যা নিতান্তই আণুবিক্ষণিক। আর নারী নিগ্রহের কথা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্যের চেয়ে নারী নিগ্রহ এ গ্রহে কোথায় বেশি হয়? ধর্ষণের হার কি পুঁজিবাদের ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ যাবৎ কেউ অতিক্রম করতে পেরেছে? এ রকম একটা নারী নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার ভূখণ্ডেইতো ফেমিনিজমের মতো উগ্র পন্থা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ফেমিনিজম আধুনিকতার ডিকাডেন্স ও সিনিসিজমের পরিণতি। এরকম অসংখ্য ডিকাডেন্স ও সিনিসিজমের ক্যানভাস মাথায় করে উত্তর আধুনিকতা আজ আমাদের সামনে সটান দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বিচারে তাই মনে হচ্ছে উত্তর আধুনিকতা বুঝি হতাশারই দর্শন।

৪

আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতার যে বিতর্ক আগেই বলেছি তার পুরোটার সূত্রপাত পাশ্চাত্যে। পশ্চিমের এই নিজস্ব বিতর্ক বা ডিসকোর্সে তৃতীয় বিশ্ব বিশেষত মুসলমান দেশ বা জনগনের স্থান কোথায়? পাশ্চাত্য যেভাবে আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতার অন্বেষণ করেছে অথবা যে পটভূমি ও প্রেক্ষাপট সেখানকার চিন্তাশীলদের আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতা সম্বন্ধে প্রাণিত করেছে সে সমস্ত উপাদান মুসলিম দুনিয়ায় বরাবরই অনুপস্থিত। তাহলে কেন এসব মত-মতান্তর নিয়ে আমাদের উৎসাহ অপরিসীম হয়ে ওঠে। নাকি পাশ্চাত্যে কিছু হলেই তার অনুকারিতা আমাদের জন্য অনিবার্য বলে মনে করা হয়।

আগেই বলেছি আধুনিকতার ধারণা আমরা পেয়েছি সাম্রাজ্যবাদের কালে। সাম্রাজ্যবাদ যখন রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমানদের পুরোপুরি কোণঠাসা করে ফেলেছে ঠিক সে মুহূর্তে আমরা আধুনিকতার সবক লাভ করি। একটি পরাজিত জাতির পক্ষে কোন নতুন তত্ত্ব কিংবা মত-মতান্তরকে

www.pathagar.com

যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, কারণ তাদের অন্তর্গত সামর্থ্য ওরকম অবস্থায় কাজ করতে পারে না অথবা সে সামর্থ্য বিলকুল নষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতি বা তত্ত্ব নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। মুসলমান দেশগুলোর অবস্থা এখন পরিণতিতে এমন অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে, যে তারা আধুনিকতাকে গ্রহণও করতে পারেনি, বর্জনও করতে পারেনি। আধুনিকতা এখানে এখনও অসম্পূর্ণ, উন্নত পুঁজিবাদের কোন স্তরেও এসব দেশ পৌঁছুতে পারেনি। হয়ত এ কারণেই গণতন্ত্রের নিরীক্ষা কার্যকর হচ্ছে না, সোশ্যালিজমের এক্সপেরিমেন্ট মুখ থুবড়ে পড়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময়ই আমাদের ইতিহাসকে পশ্চিমের ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল করে দেখার চেষ্টা করি। পশ্চিমের ইতিহাস থেকে নজীর তুলে এনে আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার কথা ভাবি। এ এক মস্ত বড় ভুল। পশ্চিমের জীবন বোধ ও জীবন দৃষ্টি আমাদের থেকে ভিন্ন, তাদের ইতিহাসের তটরেখাও এগিয়ে গেছে ভিন্ন একটি পথে। তাই যে প্রেক্ষিতে সেখানে আধুনিকতার উত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, একই রকম পরিস্থিতি আমাদের দেশে কখনো উপস্থিত হয়নি বা সে রকম পরিস্থিতিতে আমরা আধুনিকতাকে ব্যবহার করতেও পারিনি। এখন আবার উত্তর আধুনিকতার কথা বলা হচ্ছে। কি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখানে যে কারণে উত্তর আধুনিকতার উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের শিল্পী সাহিত্যিক কবিরা উত্তর আধুনিকতার চর্চা করছেন। কিন্তু এ চর্চা কতটুকু সৃষ্টিশীল ও সম্ভাবনাময়? উত্তর আধুনিকতার এ চর্চা তবে কি আজকাল অনেকটা ফ্যাশনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে?

মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোতে আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতার অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্যের থেকে ভিন্ন। তাই এখানকার আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা ও ভাষ্য নির্মাণ জরুরি হয়ে উঠেছে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত উত্তর আধুনিকতার চর্চা ও বোধকে বদলে ফেলে এখানকার মানুষের চাহিদা ও বোধের সাথে ঐক্য রেখে নতুন এক উত্তর আধুনিকতাকে জায়মান করে তোলা এখন সময়ের দাবি। এখানকার বোধ ও মননের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোন উত্তর আধুনিকতা চর্চার পরিণাম আধুনিকতার মতই গিয়ে ঠেকবে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

আমাদের দেশে যখন সাম্রাজ্যবাদ আধুনিকতা নিয়ে এসেছিল তখনকার বিশ্ব পরিস্থিতি আজকের মত ছিল না অবশ্যই। তখন সাম্রাজ্যবাদের সূর্য অস্ত যেত না। পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত ছিল না যেখানে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু একুশ শতকের দোর গোড়ায় পৌঁছে আমরা এখন পৃথিবীর অন্য রকম চেহারা দেখছি। এই প্রথম বিশ্ব রাজনীতির ধরন বিভিন্ন সভ্যতার আন্তঃসম্পর্কের টানাপোড়েনের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত

www.pathagar.com

হচ্ছে। এমন একদিন ছিল যখন সভ্যতা বলতে পাশ্চাত্য সভ্যতা বুঝাতো, আধুনিকতা বলতেও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে জ্ঞান করা হতো। বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবেও পাশ্চাত্যকে সমীহ করে চলতে হতো। এ কথা সত্য বিশ্বের নাট্যমঞ্চে এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড ও আগ্রাসী প্রভাব স্পষ্ট। তারপরেও মানুষের ভাবলোকে রূপান্তর এসেছে। অপাশ্চাত্য বিশ্বের মানুষ এখন আধুনিকতা মানেই পশ্চিমীকরণের সদর্থক ব্যাখ্যা মানতে রাজি নয়, আধুনিকতা ও পশ্চিমীকরণও তাদের কাছে দুটি ভিন্ন জিনিস। পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও তারা এখন বৈশ্বিক সভ্যতা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত। সভ্যতার মধ্যে জায়মান পারস্পরিক ক্ষমতার নিয়ামকটিও এখন ঘুরতে শুরু করেছে। অপাশ্চাত্য বিশ্বের সভ্যতাগুলোও দ্রুত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা অর্জন করছে বিশেষ করে ইসলাম অনুসারীরা সর্বত্র তাদের বিশ্বাস ও ন্যায়বোধের ভিত্তিতে পরিচিত হতে শুরু করেছে। পাশ্চাত্যের এতকালের তথাকথিত বৈশ্বিক অবস্থানকেও চ্যালেঞ্জ করে বসেছে অপাশ্চাত্য সভ্যতাগুলো বিশেষ করে ইসলামী জনগণ। পাশ্চাত্যও তার পুরনো ক্ষমতা ও প্রতাপকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সংহত ও পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার নতুন প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে এবং এভাবেই পাশ্চাত্য ও ইসলাম আজ মুখোমুখি অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো ইসলামী জনগণ আজও পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ নয়, কলোনির প্রভাবও তারা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, নেতৃত্বের সংকটও একটা বড় সমস্যা। তবে মুসলিম দুনিয়া জুড়ে একটা আত্ম উন্মেষের আভাষ স্পষ্ট, পশ্চিম যে তাদের হিতার্থী নয় এ উপলব্ধি আজ তাদের মনে দাগ কেটেছে। মুসলিম সমাজের জন্য এই সময়টাকে বলা চলে হ্যাংওভারের কাল। কলোনির যুগে মুসলমানরা যে আধুনিকতার সুরা পিইয়ে বসেছিল, সেই নেশার বিক্রিয়া শেষে এখন তারা খোয়াড়ি ভাঙতে শুরু করেছে। সেই খোয়াড়ি ভাঙার কালে তাদের আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছে ঃ এ আত্মানুসন্ধান রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই। এ যেন বিখ্যাত রুটস উপন্যাসের নায়ক কিন্তের শিকড় অনুসন্ধানের মতো। আমি কে আর পশ্চিমের সাথে আমার সম্পর্ক কি। পশ্চিমকে বাদ দিয়ে মুসলিম সমাজের এই আত্মানুসন্ধানের কালই হচ্ছে উত্তর আধুনিকতার কাল।

উত্তর আধুনিকতা তাই মুসলমানদের জন্য এক নতুন তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছে। ইসলামের মধ্যে নিজের আত্মপরিচয় খোঁজা আর ইসলামকে চূড়ান্ত মেনে জীবন সমস্যার সমাধান চাওয়া এই হচ্ছে মুসলিম সমাজের উত্তর আধুনিকতার নতুন টেক্সট। পাশ্চাত্য নয়, ইসলামই হবে একালের মুসলমানদের Streamline Philosophy. হয়তো মুসলিম সমাজের উত্তর আধুনিক পরিভাষায় এই হচ্ছে নতুন ডি-কনস্ট্রাকশন।

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিকতা ঃ সাম্রাজ্যবাদের গোপন ইচ্ছা

১

ইউরোপে এক সময় ঘোষণা করা হয়েছিল ঈশ্বর গত হয়েছেন, তার আর এখন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তাকে যথার্থ করে তুলবার জন্য, রেনেসাঁসের কালে, যাকে আধুনিকতার সূত্রপাত হিসেবে ধরা হয় এক তুমুল হৈচৈ শুরু হয়েছিল। ইউরোপের মানুষ ঈশ্বরের জায়গা দখল করে নিল এবং সে তখন নিজেই নিজের ঈশ্বরে পরিণত হলো। রেনেসাঁসের কালে ইউরোপের মানুষ অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে উঠলো, সে নিজের সুপ্ত সম্ভাবনা দেখে চমকে উঠলো। নিজের এই অবারিত সম্ভাবনার সাথে সে আবার যুক্ত করলো মানবিকতা ও যুক্তি বিচারের ধারণা।

কিন্তু দেখা গেলো মানুষ নিজেকে যতখানি মুক্ত, স্বাধীন ও শক্তিশালী মনে করেছিল, আদতে সে ততখানি নয়। রেনেসাঁ মানুষের সম্ভাবনা ও বিকাশশীলতার ইঙ্গিত দিলেও মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটলো না। সে দেখলো তাকে ঘিরে আছে রাষ্ট্র ও সমাজ, সমাজের মধ্যে মাথা তুলে থাকা অসাম্য, বেঈনসাফী, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে দুর্বৃত্তের কর্তৃত্ব। এই শৃংখল ভাঙবার জন্য মানুষ আবার একত্রিত হলো। ইউরোপের মানুষের সেই যৌথ প্রচেষ্টার নাম ফরাসী বিপ্লব। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব সাম্য আনেনি। বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ভাবনা উচ্চারিত হলো বটে কিন্তু পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না। ফরাসী বিপ্লব যে ব্যবস্থা ও স্বাধীনতা সম্ভব করে তুললো তাতে আপামর মানুষের কতটুকু মুক্তি অর্জিত হলো তা আজো প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে আছে। ফরাসী বিপ্লব নতুন করে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মজবুত করে তুললো এবং বলা হয়ে থাকে নেপোলিয়ন হচ্ছেন এ বিপ্লবের মহোত্তম সৃষ্টি।

এ ভাবে ইউরোপে ক্যাপিটালিজম চলে এলো, শিল্প বিপ্লব ঘটলো, শুরু হলো বাণিজ্য যুগের। আবার সেই বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ঘটলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ক্রুর লালসা ও আধিপত্যের পথে। পণ্য ও অর্থের দাপটে মানুষের স্থান নীচে নেমে গেল। মানুষ পরিণত হলো পণ্যে। মানুষ অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো সে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, সে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার নিজের সৃষ্ট ফ্রাংকেনস্টাইন ক্যাপিটালিজমের হাতে। এই ভাবে মানুষের আশা ও স্বপ্ন আবার ভেঙে গেল। পুরো ইউরোপ জুড়ে এক অবিশ্বাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এর মধ্যে ডারউইন বললেন মানুষ ঈশ্বর সৃষ্ট নয়, সে এসেছে বিবর্তিত হয়ে। কি আশ্চর্য কথা! এতদিনকার মানুষের গড়ে ওঠা মূল্যবোধ ও এথিকসের সৌধ ভেঙে

www.pathagar.com

গুড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি। অন্যদিকে কার্লমার্কস এলেন, অবিশ্বাসের পথে-ঈশ্বরদ্রোহের পথে এক নতুন মুক্তির বাণী নিয়ে। সে পথ দিয়ে প্রস্তুত হলো রুশ বিপ্লবের অগ্রযাত্রা। এলো নতুন মূল্যবোধ ও সমাজ প্রতিষ্ঠার নায়কেরা। কিন্তু সাম্য মৈত্রীর এ স্বপ্নও শেষাবধি টিকতে পারলো না।

তাহলে ইউরোপে টিকে গেল কারা? কাদের বিজয় হলো শেষতক। আর কেউ নয় গ্রেট ক্যাপিটালিজম। পুঁজিবাদ ও তার নায়কেরা। অন্তত আপাত রেসে জিতে যাওয়া পুঁজিবাদীরা তাই বলছে, তাদেরই জিত হয়েছে। ইতিহাস পৌঁছে গেছে তার গন্তব্যে। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্ডিত ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তার বহুল আলোচিত বইয়ের নাম দিয়েছেন The End of History। এ বইয়ে তিনি লিবারেল ডেমোক্রাসীকে সামনের পৃথিবীর একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ লিবারেল ডেমোক্রাসীর জন্ম ক্যাপিটালিজমের উদরে এবং ফুকুয়ামার ধারণা লিবারেল ডেমোক্রাসীর সব প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থাই এখন খতম হয়ে গেছে। আর এভাবে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অবধারিত বিজয় প্রমাণিত হয়েছে। তার ভাষায় ঃ

what we may be witnessing is not just the end of the cold war, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such, that is, the end point of mankinds ideological evolution and the universalization of western liberal democracy. (The End of History)

পাশ্চাত্যের এসব পণ্ডিতরা লিবারেল ডেমোক্রাসীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখলেও আসল জয় হয়েছে পুঁজিবাদের। উদার নৈতিকতা কিংবা মানবতাবাদের পক্ষে তেমন কিছু অর্জিত হয়নি। তার মানে মানুষ নায়ক নয়, মানুষ হচ্ছে পণ্য।

রেনেসাঁস যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, মানুষের অপার মহত্ত্ব ও শক্তিমানতার স্বপ্ন, তা আর টিকলো না। যে মৈত্রীর স্বপ্নে মানুষ উদ্বেলিত হয়েছিল তাও আজ অর্জনযোগ্য নয় বলেই মনে হচ্ছে। আঠার আর ঊনিশ শতকের ইউরোপীয় ইম্পেরিয়ালিজম পুনর্বার ফিরে আসছে বলেই ইংগিত দিচ্ছে। সে কালে ইম্পেরিয়ালিজমের নেতৃত্ব দিয়েছে ইউরোপ, একালে আমেরিকা। সেকালের ইম্পেরিয়ালিজম আধুনিকতার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পুরো পৃথিবীকে লুণ্ঠন করেছে, একালেও তার পুনরাবৃত্তি চলছে উত্তর আধুনিকতাকে আশ্রয় করে। ইউরোপীয় ইম্পেরিয়ালিজম মানুষের মহত্ত্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সে ধারণার গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল, দুর্বল করে দিয়েছিল তার ভিত। শেষ বিচারে পুঁজিবাদের আদর্শ এ কালের মানুষকে নিছক পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও ভোগবাদী প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে— তাকে বানিয়ে ছেড়েছে স্বার্থপর প্রাণী। ইতিহাসের বিকাশ ধারায় দেখা যাচ্ছে প্রায় চারশ বছর ধরে প্রথমে ইউরোপ, তারপর আমেরিকা শক্তি ও অর্থনীতির জোরে কেন্দ্রীয় অবস্থানে থেকে পুরো পৃথিবী জুড়ে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য চালিয়েছে। এই আধিপত্যকামিতাকে কখনো আধুনিকতা, কখনো লিবারেল ডেমোক্রাসী কিংবা উদার নৈতিকতার মোড়কে যুক্তি সিদ্ধ করে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়েছে। ঠিক যেমন আজকের আধিপত্যকামিতাকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অন্যদিকে পুঁজিবাদী আদর্শ ও ধনতান্ত্রিক শোষণের চেহারাকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য বিশ্বায়নের তত্ত্ব আনা হয়েছে।

পুঁজিবাদের এই জয় জয়াকারের মধ্যে পুরো পাশ্চাত্যে চলছে এক ধরনের দুর্বৃত্তের শাসন। এ সব দুর্বৃত্তের চেহারাও আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। হিটলার ও মুসেলিনীর বেশে। হিটলারের বিরুদ্ধে সে কালে যারা দাঁড়িয়েছিলেন ট্রুম্যান কিংবা রুজভেল্ট এরাও কম দুর্বৃত্ত ছিলেন না। যুদ্ধে জিতে গিয়েছিলেন বলে এরা ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, ইতিহাস তাদের ইচ্ছা মতো লেখা হয়েছে, তাই এরা মহাপুরুষ বনে গেছেন। হিরোশিমা কিংবা নাগাসাকির ট্রাজেডির পরেও ট্রুম্যান সাহেবরা কি করে মহাপুরুষ বনে যান তা একটা প্রশ্ন। মনে রাখা দরকার ট্রুম্যান, রুজভেল্ট কিংবা চার্চিল এরা সবাই হিটলারের প্রতিপক্ষ ও সমগোত্রীয়। হিটলার ও মুসোলিনীর প্রেতাত্মারা একালেও দর্পিত চিত্তে রাজত্ব করছেন। হিটলার নেই কিন্তু জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়াররা আছেন।

তাহলে ইউরোপে কি নীটশের ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হতে চলেছে? ডেমোক্রাসী, প্লুরালিজম এসব তত্ত্বকথা নিছক ভুল, সুপারম্যানের শাসন চাই। নীটশের অতিমানব নায়ক হিসেবে কেমন? ক্ষমতাবান, স্বৈরাচারী, যার কোন Moralism এর বন্ধন থাকে না। আজকের পৃথিবীর বাস্তবতা কি তাই বলে না? কেউ কোন মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতার ধার ধারছে না। যার হাতে শক্তি তার হাতেই মূল্যবোধ। মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ক্ষমতার সম্পর্কের দ্বারা। আবারও পুঁজিবাদী আদর্শের কথা আসছে, কেননা এটিই নিয়ন্ত্রণ করছে আজকের পৃথিবীর মূল্যবোধের চাবিকাঠি। পুঁজিবাদের এই সংকটের দিকে ইংগিত করে টি এস এলিয়ট তার কবিতায় খবর দিয়েছিলেন মানুষ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে, তার ভিতরে কিছু থাকছে না। এ কালের মানুষকে তিনি বলেছিলেন Hollow Man. আর দেখুন এ কালের শিল্পী, উত্তর আধুনিক শিল্পী কি লিখছেনঃ

'We killed the water.'
'We killed the air.'
'We killed the forests.'
'Die, damned city!'
'Come on and die:
fucked-up city, what are you, waiting for?'
(Fuentes, Carlos 1990 Christopher Unborn, London)

www.pathagar.com

ফুকুয়ামা যাকে End of History বলেছেন তা আসলে ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদী আদর্শের প্রান্তিক চেহারা। নীতিগতভাবে আধুনিকতা বা ধনতান্ত্রিক আদর্শের মানব সভ্যতাকে দেবার মত জীবনী শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে আধুনিকতার প্রয়োজন আজ ফুরিয়ে গেছে এমনকি তা আজ রীতিমত বিপদজনক হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন দার্শনিক তত্ত্ব এসেছে এবং এর নাম হচ্ছে উত্তর আধুনিকতা। পুরনো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে বিশ্বব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা যায় কি না বিশেষ করে দুনিয়া জুড়ে পাশ্চাত্যের সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাযুক্তিক আধিপত্য বরাবরের মতো টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে উত্তর আধুনিকতা তার দার্শনিক তত্ত্ব সরবরাহে উদ্যোগী হয়েছে।

পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী জিয়াউদ্দীন সরদার খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। এটি হচ্ছে, পাশ্চাত্যের আধিপত্যকামিতা, শোষণমূলক চেহারা ও নীতিহীনতা নতুন কোন ঘটনা নয়, গত কয়েকশ বছর ধরেই পাশ্চাত্য দুনিয়া জুড়ে এই 'ঠগীবৃত্তি' চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন তত্ত্ব ও শ্লোগানের অন্তরালে পাশ্চাত্য যেমন এই দুষ্কৃতি চালিয়েছে, তেমনি দার্শনিক তত্ত্ব ও উপাত্তের এক ধোয়াশা সৃষ্টি করে শোষণ ও শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে মাত্র। একালে এসেও পাশ্চাত্য তার আধিপত্যমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে তার মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে উত্তর আধুনিকতাকে বেছে নিয়েছে।

তাই একটা জিনিস আমাদের খুব ভাল করে বোঝা চাই উত্তর আধুনিকতা মানে শুধু স্থাপত্য-সঙ্গীত-চিত্র-সাহিত্যের ব্যাপার নয়, পাশ্চাত্যের কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী ইতিহাস নির্মাণ, বিনির্মাণ কিংবা প্রত্যাখ্যানের এক্সপেরিমেন্টও নয়, উত্তর আধুনিকতা, আধুনিকতার মতোই পাশ্চাত্যের বাইরে নতুন ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের উদগাতা। আধুনিকতার মতোই আমরা এখন তার শিকার। মনে রাখা চাই ইউরোপীয় আধুনিকতাকে আমরা এক সময় আমাদের মুক্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম। প্রকৃত অর্থে এই আধুনিকতা কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব-মন-মননকে ঔপনিবেশিক পঙ্গুত্বে বেধে দিয়েছিল। আমাদের দুঃস্থতার, ইতিহাস ভ্রষ্ট হওয়ার এটা একটা ছিল বড় কারণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপকে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি কিংবা ঔপনিবেশিক পদ্ধতির মধ্যে আমাদের বোঝানো হয়েছে ইউরোপ মানে রেনেসাঁ, এনলাইটেনমেন্ট ও ফরাসী বিপ্লব। কিন্তু এসব তত্ত্বচর্চার ঘোরে এটা আমাদের গ্রাহ্যের বাইরে রয়ে গেছে রেনেসাঁ ও উদার নৈতিকতার গর্ভেই জন্ম নিয়েছে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের ভয়ানক রকমের জুলুম ও বেইনসাফী। তাই আজকে যারা উত্তর আধুনিকতা, দারিদা-ফুকো-চর্চা করছেন তাদের ভাবার সময় এসেছে উনিশ শতকের ইউরোপীয়

www.pathagar.com

আধুনিকের মতোই এই উত্তর আধুনিকতা আমাদের এখানে কোন উচ্ছিষ্ট রেখে যাচ্ছে?

সেদিনের আধুনিকের মতোই একালেও কেউ কেউ উত্তর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ, লেট ক্যাপিটালিজমের আরো চতুর, আরো নির্মম ঔপনিবেশিকতাকে না বুঝে আলিঙ্গন করে বসেছেন। যেখানে দরকার ছিল সুস্পষ্ট প্রতিরোধের, সেখানে আধুনিকের মতোই তৈরি হচ্ছে এখানে উত্তর আধুনিকের সহযোগী, চতুর ঔপনিবেশিকতার কলাবরেটর শ্রেণী। যারা নিজেদের কিংবা নিছক বস্তুগত সুবিধার কারণেই উত্তর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে পৃষ্ঠপোষণা করে চলেছেন। অথচ ল্যাটিন আমেরিকা, ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে যে বর্বরতা উত্তর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ দেখিয়ে চলেছে তাকি চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? আমাদের বোঝা দরকার ইউরোপ কিংবা হালের আমেরিকা মানে শুধু গণতন্ত্র-প্রগতি-বিজ্ঞান নয়, ওদের যুক্তি-মানবিকবাদ-প্লুরালিজম-সেকুলারিজম-ডেমোক্রাসী আমাদের বিশ্বকে শোষণ করার, ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় নিয়ে যাওয়ারও এক তত্ত্ব কাঠামো নির্মাণ করেছে। এটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার, পশ্চিমে গণতন্ত্র, প্রগতি ও প্রযুক্তির যে বিকাশ হয়েছে তা কিন্তু অপশ্চিমী বিশ্বে হয়নি বা হতে দেয়া হয়নি। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যে দর্শন পাশ্চাত্য উচু গলায় এতকাল প্রচার করেছে তাই কিন্তু ইতিহাস ও স্থানের ভেদে মানব শোষণ, অসাম্য ও দমনে পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক উত্তর আধুনিক তাত্বিক দাবি করেন একালে প্লুরালিজম-বহুত্ববাদিতা ও সহাবস্থানের এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে অথবা উত্তর আধুনিকতা সে ধরনের উপযোগী পরিবেশ নির্মাণের চেষ্টায় নিয়োজিত। মূলত এ চিন্তাভাবনাও একটি সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল মাত্র। আমরা যেমন ঔপনিবেশিকতার শিকলে আটকা পড়ে ইউরোপীয় আধুনিকতার ফাঁকি বুঝতে পারিনি, তেমনি উত্তর আধুনিকতার নতুন ও বিপজ্জনক খাদকেও এখন ধরতে পারছি না। উত্তর আধুনিকতা, উত্তর ধনতান্ত্রিক এবং উত্তর সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শূন্য উন্নতি ও প্রগতির ফল। এর পটভূমি একদিনে তৈরি হয়নি। খুঁজলে পরে দেখা যাবে এই পটভূমিতে উপ্ত হয়েছে নাৎসী হলোকস্ট, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ ও বর্বরতা, এক নিরুদ্দেশ যাত্রা ও অর্থনীতির ঘনায়মান সংকটের ছায়া। এই পরিস্থিতিতে উত্তর আধুনিকতা বলছে প্লুরালিজমের কথা। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে এটি হয়ে পড়ছে কথার কথা। কারণ উত্তর আধুনিকতার সামনে কোন নীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ বা মেটান্যারেটিভ নেই। এই মেটান্যারেটিভ বা প্রকৃত আদর্শের অভাবে পুরো পাশ্চাত্য আজ যেয়ে পড়েছে নীতিহীনতা, ভোগ আর কনজুমারিজমের বিবরে। এ কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেও বিশ্বজুড়ে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা কিংবা যুদ্ধ ও ধ্বংসের হুমকি বরাবরের মতোই রয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের নৈতিকতার মানদণ্ড

www.pathagar.com

কোথায় যেয়ে ঠেকেছে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। মার্কিন নেতৃত্বে পুরো পাশ্চাত্য আজ কাল্পনিক শত্রুর সন্ধানে ছুটতে শুরু করেছে এবং অপাশ্চাত্য বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য কাল্পনিক অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিকে আর যাই হোক বহুত্ববাদিতা ও সহাবস্থানের জন্য অনুকূল বলা চলে না। তাহলে প্লুরালিজমের কথাটা কেন উঠেছে? যে প্রক্রিয়ায় আধুনিকতা আমাদেরকে বিধ্বস্ত করেছিল, সত্তাহীন, শিকড়হীন করে তুলেছিল, উত্তর আধুনিকতাও প্লুরালিজমের মোড়কে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলেছে।

পাশ্চাত্যের লোকেরা সেই রেনেসাঁসের কাল থেকেই যখন-ঈশ্বরকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছিল তখন থেকেই তারা যাবতীয় সুনীতি ও মূল্যবোধকেও গুরুত্বহীন বানিয়ে দেয়। রেনেসাঁসের ফলে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে পরিমাণ বিকাশ ঘটেছে ঠিক সে পরিমাণ মরালিজমের বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পাশ্চাত্যের মানুষের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও জীবন যাপনকে অনায়াস সাধ্য করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজেদের জীবনকে অনায়াসসাধ্য করে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একচ্ছত্র করায়ত্ত করার মাধ্যমে অপশ্চিমী বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠনের এক বর্বর প্রতিযোগিতায়ও পাশ্চাত্য নেমে পড়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না পাশ্চাত্যের এই 'ঠগীবৃত্তির' কারণেই আজও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি নিছক বাকচাতুর্যে পর্যবসিত হয়েছে। অনেক বিজ্ঞজন এটিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক ত্রুটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ অবস্থাকে তারা বলেছেন Ethical vacuum. প্রখ্যাত পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী আকবর এস. আহমদ লিখেছেন ঃ

The problem with this civilization is the hole where the heart should be.........; there is no moral philosophy or set of principles that drives it. What gives its dynamic energy is individualism, the desire to dominate, the sheer drive to acquire material items, to hoard.......

[Western] civilization does not have the answers for the planet; indeed in its arsenal of nuclear weapons, its greedy destruction of the environment, its insatiable deavouring of the world's resources, its philosophy of consumerism at all costs, it is set to terminate life on earth in the near future unless it can change its ways fundamentally. (Post Modernism and Islam)

আকবর এস আহমদের কথায় শক্ত যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। প্রাযুক্তিক কিংবা বস্তুগত উন্নতি যে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না তা গত কয়েক শতকের ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যা দরকার

www.pathagar.com

তা হলো একটি নৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে জাতিসমূহের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। পাশ্চাত্য থেকে নৈতিক মূল্যবোধ ছিটকে পড়েছে বলেই হযরত ঈসার খ্রিস্টবাদের মতো প্রেমশীলতার ধর্ম আজ পরিণত হয়েছে জুলুমবাজের সহায়ক শক্তি হিসেবে। জিয়াউদ্দীন সর্দার লিখেছেন ঃ

Christianity changed from an enlightened cosmology to a religion of tyranny and vanity. (The Future of Muslim Civilization)

সর্দার মনে করেন খ্রিস্টবাদকে যেদিন সেকুলারিজম গিলে ফেলল, অন্যদিকে সেন্ট অগাস্টাইনের প্রেরণায় হযরত ঈসার মানবিক মূল্যবোধের বদলে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে হেলেনীয় জড়বাদ ঢুকে পড়লো সেদিন থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা হয়ে পড়লো অনুভূতিহীন মূল্যবোধহীন, ও আধিপত্যকামী। এখন থেকে এক চক্ষু দানবের মতো পাশ্চাত্য সভ্যতা পরসম্পদ লুণ্ঠন ও অপরকে শোষণের মন্ত্রে ভীষণভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। আকবর এস আহমদের মতো জিয়াউদ্দীন সর্দারও তাই অনেকখানি মনে করেন আজকের পৃথিবী যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলা করছে তার মূলে আছে পাশ্চাত্যের এই একচোখা নীতি। উত্তর আধুনিকতা তাই নতুন কথা নয়, এ হচ্ছে পাশ্চাত্যের আধিপত্যকামী মতাদর্শসমূহের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার সাম্প্রতিক সংযোজন। জিয়া উদ্দীন সর্দারের ভাষায়ঃ Contrary to popular belief, secularism did not actually produce a decline in religiosity, it simply transferred religious devotion from the concerns of the church to the rational concerns of this world. Since the Enlightenment, this religiosity has been expressed in nationalism, communism, fascism, scientism, modernism and has now built its nest in post modernism. (Christian-Muslim Relations : Yesterday, Today, Tomorrow)

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে পাশ্চাত্য বিশ্বে এখন চলছে নীতিহীনতার মড়ক। পশ্চিমী বিশ্বে প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-সম্পদের অভূতপূর্ব প্রসারণ ঘটলেও আমেরিকা-ইউরোপের চৈতন্যে চলছে মরুভূমির বিস্তার। এই অশোভন ও নীতিহীনতার খাদে পড়ে পশ্চিমা বিশ্ব এখন দুলছে। আজকের পোস্টমডার্ন প্যারাডাইম এই খাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে।

৩

উত্তর আধুনিকতা তত্ত্ব চর্চার ঘোরে আমরা ইদানিং কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ ও বাগবিন্যাসের সাথে পরিচিত হয়েছি। এসব শব্দ ও বাক কৌশলের মধ্যে

www.pathagar.com

একধরনের রহস্যময়তা ও দুর্নীরিক্ষতার কুয়াশা জড়িয়ে আছে। এই মেঘ-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ আর রোদের তলা থেকে এসব শব্দের অর্থ উদ্ধার করা এবং এর চমক ও অস্পষ্টতা দুটোই বোঝা জরুরি হয়ে উঠেছে। উত্তর আধুনিকতার আলোচনা সূত্রেই এখন আমরা পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, পোস্ট ফেমিনিজম, লোগো-সেন্ট্রিসিজম এমন সব নানা ছোট ও ভাবনার এলাকার কথা শুনতে পাচ্ছি। এটা সত্য দৃষ্টিভঙ্গির এই সব নানা মত-মতান্তর, সংঘর্ষ ও অসংলগ্নতার মধ্যে উত্তর আধুনিকতা বেড়ে উঠেছে। কিন্তু একটা জিনিস এ কালের মানুষকে বড় বেশি করে ভাবতে বাধ্য করছে আসলেই কি উত্তর আধুনিকতা মানবজাতির কোন দীর্ঘস্থায়ী মুক্তির কথা বলে? এটা ঠিক আধুনিকতা কিংবা মার্কসবাদ মানবতার জন্য কমবেশি একটা আশা জাগিয়ে তুলেছিল। অবশ্য এ আশা আজ ম্লান হয়ে পড়েছে, এসব মতাদর্শের অন্তর্গত দুর্বলতা ও নীতিহীনতার কারণে। এর বিপরীতে চলমান এই Ethical vacuum পূরণের জন্য তৃতীয় মত হিসেবে ইসলামের একটা আবেদন অবশ্যই রয়ে গেছে। এর পাশাপাশি উত্তর আধুনিকতার যে ঢেউ আমাদেরকে দোলা দিচ্ছে তাকি আদতেই কার্যকরভাবে কোন আশা জাগাতে সক্ষম, না এর বাচনিক ধুম্রজাল ও নানা রকম তত্ত্বের কচকচানির আড়ালে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী কোন ইচ্ছে লুকিয়ে আছে?

উত্তর আধুনিকতার ধারণা প্রথমে এসেছিল স্থাপত্য ও নগর কাঠামোর মধ্যে। ত্রিশের দশকের ইউরোপের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টরা প্রচলিত Symmetrical রীতি ভেঙে Asymmetrical একটা রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই যে নতুন রীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হলো তাই পরে শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি ও সংস্কৃতি পুনর্বিচারের ভিন্ন মাত্রা এনে দিল। ইহাব হাসান একে বলেছেন The heroics unmaking; দারিদা ও পোস্টমডার্নরা বলছেন de-construction. তার মানে বিকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে মুক্তির লক্ষ্য সন্ধান করতে হবে। এই যে বিনির্মাণের কথা উঠেছে তা পশ্চিমী সভ্যতার এক শূন্যতার প্রেক্ষাপটে সম্ভব হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের অবিশ্বাস ও পরাজিত মনোভাবের ভূমিটি পোস্টমডার্ন তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পোস্টমডার্ন তাত্ত্বিকরা সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা চিন্তাধারার কাঠামো দিতে পারেননি। ক্যাপিটালিজমের পরে কি আসবে, তেমনি আধুনিকের পরে কি, তাও তারা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছেন না। বলা হচ্ছে ইতিহাস থেকে বেরিয়ে এলেই মুক্তি, কিন্তু ইতিহাস থেকে সত্যি কি বেরোনো সম্ভব? পোস্টমডার্ন যেমন আধুনিককে ছাড়িয়ে যেতে চায় এরকম একটা সক্রিয় ধারণা, কিন্তু আদতে পোস্টমডার্ন, মডার্ন বা আধুনিকতার সঙ্গেই যুক্ত। উত্তর আধুনিকতাবাদীরা তাই

www.pathagar.com

দেখা যাচ্ছে প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে কতকগুলো বাচন-প্রতিবাচনের কাল্পনিক ধোয়াশা সৃষ্টি করেছেন। এই বাচনিক ধোয়াশা ও ধুম্রজালের ভিতরে মূলত পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্র ও ইম্পেরিয়ালিজমের গোপন আকাঙ্ক্ষা গভীর গ্রাহী হয়ে উঠেছে। উত্তর আধুনিকতায় তাই রাষ্ট্র, বিপ্লব, শোষণ কিংবা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কোন কথা নেই। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর নানা ছলা-কলা ও কূটরাজনীতির ভিতর দিয়ে অপাশ্চাত্য দেশগুলোকে শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও উত্তর আধুনিক তাত্ত্বিকরা কোন কথা বলেননি। উত্তর আধুনিকতাবাদীরা গণতন্ত্র সম্পর্কেও এক অদ্ভুত তত্ত্ব হাজির করেছেন। নারীবাদী, পরিবেশবাদী, সমকামবাদী, লিভটুগেদারবাদী ইত্যাদি সব 'বাদীদের' তারা মনে করেন গণতন্ত্রের চাহিদা সৃষ্টিকারী ডিমান্ডগ্রুপ। এরা এইসব গ্রুপগুলোর সাংগঠনিকভাবে একটা প্রতিবাচন গড়ে তোলাকে সমর্থন করেন। তারা মনে করেন এই সব ডিমান্ড গ্রুপগুলো জাতীয় কর্মসূচীর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। এ সব গ্রুপ জাতীয় কর্মসূচীর উপর চাপ সৃষ্টি করাতে কার লাভ হবে? লক্ষ্য করুন উত্তর আধুনিকতাবাদীরা এসব পাল্টা বাচনের নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে উস্কে দিচ্ছেন। একেই তারা আন্দোলন হিসেবে বুঝানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা কি কোন আন্দোলনের পর্যায়ভূক্ত হতে পারে। তারা কি কোন ন্যায়নীতি ও শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন আন্দোলনের কথা বলতে পারেন না? স্বেচ্ছাচার, ভ্রষ্টাচার, নীতিহীনতা, ভোগবাদিতা ও অবাধ যৌনতার হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে মানুষের অন্তর্গত প্রতিরোধের শক্তিকে নির্জিব করে দেয়ার এ দায় কি তারা এড়াতে পারবেন? তারা চান মানুষকে অমানুষে পরিণত করে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে। ধনতন্ত্রও তাই চায়। তাতেই ইম্পেরিয়ালিজমের সুবিধা। এতে করে শোষণ শাসন স্থায়ী করা যাবে। আমাদের দেশে লিভটুগেদারের কালচার ঢুকে পড়েছে। কদিন পরে হয়তো শুনতে হবে সমকামিতাও এসে গেছে। উত্তর আধুনিকতা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? উত্তর আধুনিকতা চায় এক নৈরাজ্যবাদী, নিহিলিস্ট, ডি-মোরালিস্ট জঙ্গিত্ব যার দ্বারা শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য মতাদর্শভিত্তিক সিভিল সোসাইটির উপর কোন আঁচড় পড়বে না। এ কারণেই পোস্টমডার্ন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পশ্চিমী শূন্যতা-অনুকরণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে দারিদা-ফুকোরা আজতক একটি কথাও বলেননি। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের 'Friendly fire' এ যে শিশুগুলোর নির্মম মৃত্যু হয়েছে, পাশ্চাত্য প্রভাবিত জাতিসংঘের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও অবরোধের প্রতিক্রিয়ায় ইরাকে মানব সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে যে নীরব গণহত্যা চলছে অথবা ফিলিস্তিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ অনুমোদনে যে জায়নিস্ট দানব মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে-তার বিপক্ষে উত্তর আধুনিকতাবাদীরা যেমন কোন কথা বলেননি তেমনি লিওতার-

www.pathagar.com

বদ্রীআর-দালুজ কিংবা দারিদা ফুকোর চর্চায় এর সমাধান মিলবে না। যে তত্ত্ব, চিন্তাভাবনা বা মতাদর্শ মানবতার পক্ষে উঠে দাঁড়াতে পারে না তা বিষয় বৈচিত্রের দিক দিয়ে যত রেডিক্যালই হোক না কেন তা কখনো গভীরগ্রাহী হয় না কিংবা মানুষের অন্তর্গত সত্যকেও নাড়া দেয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সংকটের চেহারার মধ্যে আজ পোস্টমডার্ন সাম্রাজ্যবাদ উঁকি দিচ্ছে, তেমনি মানবতার প্রতি এ কালের আস্থাহীনতার নিরন্তর ঘোষণাও দিয়ে চলেছে। এই আস্তাহীনতার বিপক্ষে ইতোপূর্বে যে দু'একজন দাঁড়াননি, এমন নয়। ভিয়েতনামে আমেরিকার বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী বার্ট্রান্ড রাসেল। এ কালে আমরা পেয়েছি নোয়াম চমস্কির মত মানুষ, যিনি পোস্টমডার্ন সাম্রাজ্যবাদের আপোষহীন সমালোচক, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ছিঁড়ে ফেলেছেন তার মুখোশ। আরেকজনের নাম এডওয়ার্ড সাঈদ। তিনি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ভয়ানক চেহারা। রাসেল, চমস্কি, সাঈদের পাশে আরেকজনের নাম নেয়া গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ ইকবাল। তিনি আমাদের বিশ্বাসকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তার যন্ত্রণাদীর্ণ উক্তি মনে পড়ে ঃ এই সওদাগরের মৃগনাভিও কুকুরের নাভি ভিন্ন আর কিছু নয়।

এটা সত্য পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্র, ইম্পেরিয়ালিজম, সভ্যতা-সংস্কৃতি একটা Turning point-এ এসে দাঁড়িয়েছে ও অনিশ্চিত যাত্রা শুরু করেছে। পশ্চিমী সভ্যতা এই সর্বাত্মক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তাই মানুষের আন্দোলনকে নষ্ট ও বিপথগামী করতে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবোধকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছে। পুঁজির বাজারের দখল নিয়ে আজ শুরু হয়েছে এক উন্মত্ত লড়াই। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পরও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতটুকু কমেনি, বেড়েছে। প্রত্যেকেরই নিজ দেশের ক্ষেত্রে 'সংরক্ষণ', অন্য দেশের ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে যে রেষারেষি শুরু হয়েছে তা আসলে দুনিয়ার লুটের বাজার ভাগবাটোয়ারার লড়াই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন এবং অন্যকে কাছে টানার কৌশল প্রয়োগ করছেন এই বলে যে, যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে কাকে কিভাবে তেলের সুবিধা ও ভাগ দেয়া হবে। তার মানে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণতি ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে যার ফলে সবরকমের মূল্যবোধহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, উন্নাসিক, ছিন্নমূল মানসিকতা জায়গা করে নিচ্ছে। আর সেই সুযোগে এক অবক্ষয়িত সাংস্কৃতিক আবর্জনার বিশ্বায়ন ঘটছে। পুরো পাশ্চাত্য জুড়ে চলছে সেক্স, ভায়োলেন্স ও ক্যাসিনোর কালচার, তার প্রভাব আজকাল আমরা এখানেও কিছুটা অনুভব করছি বটে।

www.pathagar.com

ফলে এটা স্পষ্ট হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের উদরে এই উত্তর আধুনিকতার মতবাদ ধীরে ধীরে বর্ধিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্গত নৈরাজ্য, অস্থিরতা, ধ্বংস, বিপর্যয় ও অসংহতির প্রেক্ষাপটে উত্তর আধুনিকতা গড়ে উঠছে। অন্যদিকে মুমূর্ষু পাশ্চাত্য সভ্যতা পোস্টমডার্নিজমকে আশ্রয় করে বাঁচতে চাইছে। উত্তর আধুনিকতা একটা নির্ভেজাল নৈরাজ্যিক মতবাদ যা মানুষের চিন্তাভাবনাকে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, লক্ষ্যহীন ও পরাবাস্তব করে তুলছে। উত্তর আধুনিকতার ইন্টেলেকচুয়াল বাক কৌশলের আড়ালে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ও শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়ার এ হচ্ছে পাশ্চাত্যের নতুন প্রোজেক্ট। এ প্রোজেক্টকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাই নানা রকম বাকচাতুর্যের অবতারণা করা হচ্ছে। এ প্রোজেক্টের হোতারা জানে মানুষ যদি তার নৈতিক বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার জীর্ণ কাঠামোটি আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। পাশ্চাত্য তার সামরিক, প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগে তাই এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকেই উত্তর আধুনিকতার ধারণা নিয়ে এসেছে। দার্শনিকভাবে মানুষকে খণ্ডিতকরণের এই উত্তর আধুনিকী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। এই খণ্ডিতকরণের প্রচেষ্টা না ঠেকানো গেলে মানবতার ভবিষ্যৎ আরো বিচ্ছিন্ন, বিপন্ন ও সংকটাপন্ন হতে বাধ্য। পাশ্চাত্য আজ নীটশেকে সর্বেসর্বা বানিয়ে ফেলেছে। নীটশে নয়, আজ দরকার ইকবালকে। সুপারম্যান নয়, আজ দরকার ইনসান-ই-কামিলকে। যুদ্ধ, মারণাস্ত্র আর ধ্বংসকামিতা নয়, চাই প্রেমশীলতা, মানবিকতা ও জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধ। সেই অনাগত স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষায় আমরা একজন ইনসান-ই-কামিলের নির্দ্বিধায় অপেক্ষা করতে পারি।

www.pathagar.com

আমাদের উত্তর আধুনিকতা

১

সতেরশ সাতান্ন সালের ভয়ানক রকমের বিপর্যয় ও ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে ইউরোপীয় বণিক ও জলদস্যুর দল আমাদের দেশের কর্তৃত্ব অধিকার করে বসে এবং এই কর্তৃত্ব হরণ ও রাজাবদলের মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক দীর্ঘস্থায়ী ভাঙচুর ও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা আজ মোটের উপর একমত এই ভাঙচুর ও টানাপোড়েনের ভিতর দিয়েই ইউরোপীয় আধুনিকতার সাথে আমাদের মনোসংযোগ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আমাদের দেশের অধিকার হরণের এই পর্বটিকে বলা যায় ইতিহাসের একটি ছেদ, যে ছেদের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এতকালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা ও কর্মতৎপরতা আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল তার অবসান ঘটে এবং ইংরেজ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টারের ভাষায় শাসক মুসলমানেরা রাতারাতি ভিস্তিওয়ালার জাতিতে (hewers of wood and drawers of water) পরিণত হয়। আমাদের দেশে আধুনিকতার মনোভংগি ব্যাখ্যা করতে হলে ইতিহাসের এই কালপর্বটি বিবেচনা করা এই কারণে জরুরি যে এটি শুধু নিছক রাজাবদলের ঘটনা ছিল না, এটি ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিণতিও। ভারতে মুসলিম শাসনকে হিন্দুরা কখনো মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি, শুধু মাত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিম শাসন ও প্রাধিকারের সময় তারা খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। এক্ষণে হাওয়ার উল্টো গতি দর্শনে তারা মুখ ঘুরিয়ে ফেলে এবং নব-উদ্বোধিত ইউরোপীয় খ্রিস্টান রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষণায় প্রেরিত এদেশে আগমনকারী নাবিক ও জলদস্যুদের সাথে তারা রাতারতি গাটছড়া বাঁধে। অন্যদিকে ভারতের ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম রাজশক্তিকে মোকাবেলায় আসতে হয় আন্তর্জাতিক বলয়ের মুসলিম খ্রিস্টান দ্বন্দ্ব, যা ক্রুসেড নামে পরিচিত তার এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে, যার পরিণতি স্বরূপ আমাদের নজরে আসে ইউরোপীয় নাবিক ও জলদস্যুদের আবরণে এদেশে সাম্রাজ্যবাদের লোমহর্ষক চেহারা। হিন্দু ও খ্রিস্টানের এই কমন ঐতিহাসিক মুসলিম বিরোধিতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে পলাশীর আম্রকাননে এবং এভাবেই ইতিহাসের একটি কালপর্বের গতিধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপরের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা এখানে বাহুল্য, মুসলমানরা উপনিবেশের কালে প্রবেশ করে। মনে রাখা দরকার এই উপনিবেশ শুধু ইউরোপীয় খ্রিস্টান উপনিবেশ ছিল না, এটি ছিল ইউরোপীয় খ্রিস্টান ও নব অভ্যুত্থানকামী ভারতীয় হিন্দুর যৌথ কলাবরেশনের ফল।

www.pathagar.com

কলোনির প্রভুরা আমাদের ইতিহাসের নতুন টেক্সট নির্মাণ করতে চেয়েছিল। এই টেক্সটকে নির্মাণ করবার পিছনে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও স্থায়ীকরণের কল্পনা তাদের মনোলোকে পুরোপুরি আভাসিত ছিল। ঊনিশ শতকের শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে কর্মতৎপরতা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল যাকে অনেকে বাংলার রেনেসাঁ কিংবা নবজাগরণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন, তার মধ্যে মূলত প্রতিফলিত হয়েছে সেদিনের সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্ন, মতাদর্শ ও বিশ্বাসের ধ্বনি। মনে রাখা চাই কলকাতা যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্টি, তেমনি একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নব অভ্যুত্থানকামী ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদী রেনেসাঁ আন্দোলনকেও সাম্রাজ্যবাদ চিহ্নিত করেছে, তার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে এবং নিজের ইচ্ছে দিয়ে নিজের মত করে সাজিয়ে তুলেছে। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দুজাগরণ বা বাংলার জাগরণ যাই বলি না কেন, তা মূলত ইংরেজের অভিরুচির ফল।

কলোনির প্রভু ইংরেজ কেন এই রেনেসাঁর প্রোজেক্ট হাতে নিল? এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমটি হচ্ছে ভারতব্যাপী ইংরেজের নিরঙ্কুশ শাসন-শোষণ, জুলুম অবিচারকে স্থায়িত্ব দানের দুর্বার বাসনা, দ্বিতীয়টি ইংরেজের ভারত অধিকারের কাল থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সশস্ত্র বিরোধিতা। এই দুটো দিক একযোগে সামাল দিতে ইংরেজের প্রয়োজন ছিল হিন্দুর সহযোগিতা এবং এ কারণেই ইংরেজ কলকাতাকে বেছে নেয় ও একে কেন্দ্র করে একদল বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও সমাজ নেতার জন্ম দেয়া হয়, যারা রাজনৈতিক ও চিন্তার জগতে যেমন নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তেমনি স্বসমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ। এসব বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধীমান ব্যক্তিরা অত্যন্ত চতুরতা ও যুক্তিনিষ্ঠতার সাথে সেদিনের ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে উপস্থাপন করেন। এই জাগরণের সারথিদের ইংরেজ রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা ও ইংরেজের জাতীয় আদর্শের প্রতি অকলঙ্ক শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। এই ইংরেজ আনুগত্যকে আর যাই হোক দেশপ্রেম বলা শক্ত, একে ইংরেজ অনুকরণ বা অনুসরণ বলাই যুক্তিসংগত বটে। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে কেশবচন্দ্র, প্রিন্স দারাকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু বিদ্বজনের ভিতরেই এই স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্যের চেতনা ঝিলিক মেরে উঠেছে। এই আনুগত্যের পতাকাবাহীদের নিয়ে ইংরেজ সেদিন রীতিমত এক মীথ তৈরি করে ফেলেছিল। এই মীথের অপর নাম হচ্ছে বাংলার জাগরণ। এই মীথের এমনই মোহ যে আজকাল আমাদের দেশের কিছু দিকভ্রান্ত বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে এই বলে হাহাকার করতে শোনা যায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বাঙালি হিন্দুদের মতো কোন রেনেসাঁস আসেনি। এ হচ্ছে কলোনির নস্টালজিয়া, কলোনির পাপ আমাদের পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেনিত, তাই।

www.pathagar.com

বাংলার জাগরণের যে গল্প আমরা এতকাল শুনে আসছি, একবার গভীরভাবে ভাবুনতো এ গল্পগুলো আসলে কার গৌরবের? নেটিভ বাঙালির না সাহেব ইংরেজের। আসুন 'বাংলার জাগরণ' নামের এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাটির পাতা ওল্টাই। আস্তে ধরুন, নরম আলতো আঙ্গুলে, দেখছেনতো এর পাতাগুলো কেমন হলুদ বিবর্ণ ও ঝরঝরে হয়ে গেছে। আর শ্রদ্ধা আনুন শরীরে, মহাপুরুষদের নিয়ে পুস্তিকা। দেখুন, পাতার পর পাতায়, মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ, তারপরে মহাপুরুষ। নিখুত পেডিগ্রি, নিখুত বেশভূষা, নিখুত অলঙ্কার, এলিট, শোভন, অনেকক্ষেত্রেই ব্রিটিশ। ধীরে ধীরে পাতা উল্টে যান আর দেখুন মহাপুরুষ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, দারাকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ। আরো।

আর একবার ভাবুন তো সময় যে ছবিগুলো বিবর্ণ করে দিয়েছে, রং তুলে ঝাপসা করে দিয়েছে যে বইয়ের মলাট, সে বইয়ের রচয়িতা কে? কে এই দুঃসাহসী অমিতবিক্রম যে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে পানি খাওয়াতে পারে।

আর কেউ না, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতা। Rule Britanica-Britain rules the waves, যার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম। নবজাগরণের এই অদ্ভুত কিংবদন্তীর পুস্তক রচনা করেছিল সেই এবং সেই ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর বানিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রকে বানিয়েছিল ঋষি, দারাকানাথকে প্রিন্স, দেবেন্দ্রনাথকে মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি আর জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িকে দিয়েছিল কিংবদন্তীর মূল্য ও আভিজাত্যের প্রতাপ। ফরাসী বিপ্লব যা পারেনি, মার্সাই সংগীত যা পারেনি, এমনকি বলশেভিক বিপ্লবও যা করতে পারেনি তাই পেরেছিল সমুদ্রপারের দোকানদার এই ইংরেজ জাতি। শান্তিতে শাসন করবার জন্য প্রজার বুক থেকে রাজার স্তবগান বের করে আনার জন্য মহারাণী ভিকটোরিয়ার দরকার ছিল বাঙালি বাবুদের এক এনলাইটেনমেন্টের দুনিয়ায় নিয়ে আসা। নিয়ে আসা ইংরেজী ভাষার হেজিমনিতে, নিয়ে আসা ইউরোপের আইডিওলজিকাল প্রোজেক্টের আওতার ভেতর। আর এই কাজ করতে পারতো কারা? কাদের মেধা, মনন, মনীষা ও যোগ্যতা ইউরোপের কনসেপ্টকে নতুন করে ম্যানুফ্যাকচার করে আপামর মানুষের ভাষায় পরিবেশন করতে পারতো। নিশ্চয় জাগরণের সারথিদের উত্তম বিকল্প সেদিন আর কেউ হতে পারতো না। বাংলার জাগরণ তাই ইংরেজ শাসনের হেজিমনি নির্মাণের দক্ষতার গৌরবের ঘোষণা। এ গৌরব নেটিভ বাঙালির নয়, ব্রিটিশ হেজিমনির গৌরব।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯১৩য়। জাগরণের কি হিম্মত দেখুন। এতদিনের কলোনিয়াল সাবজেক্টের মানে ঔপনিবেশিক প্রজার মনন কাঠামোটি কিভাবে ইংরেজের স্বার্থ রক্ষা করতে শুরু করেছে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবি উপন্যাসে বিপ্লবীদের প্রতি তার নিজের মত করে একধরনের প্রীতি

www.pathagar.com

ও অনুরাগের মন্তব্য ছিল। স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশ সরকার এ গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরং এতে ব্রিটিশ সরকারের ঔদার্য ও মহানুভবতাই দেখতে পেয়েছিলেন কারণ উপন্যাসটিই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার যদি খুব খারাপ হতো তাহলে লেখককেও তো গ্রেফতার করতে পারতো। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল যুক্তিটা বোঝা শক্ত ব্যাপার নয়। এই যুক্তিটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ হেজিমনি এবং সে ব্যাপারে তারা সফলও হয়েছিল।

৩

বাংলার জাগরণকে অনেক বুদ্ধিজীবী এদেশে আধুনিকতার মহোত্তম বিকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। অন্ততপক্ষে এটুকু বলা যায় ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার স্পর্শে কলকাতার ব্রিটিশ নির্বাচিত বাঙালি বাবুদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল একটা তুলনার বোধ এবং এই বোধ থেকে তারা বুঝেছিলেন ইউরোপের সংস্কৃতি তাদের থেকে উন্নত। ইউরোপের হাতে আছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি। ইউরোপের হাতেই লগ্নিকৃত পৃথিবীর পুঁজি, উন্নত সামরিক শক্তি। তাই এসব বাঙালি বাবুরা ইউরোপমুখীনতাকে সেদিন সর্ববাদী সম্মত সঙ্গত ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন এবং যুক্তি দেখান ঃ উন্নত জাতি হিসেবে বিকশিত হতে চাইলে ইউরোপের অনুকরণ অনিবার্য। পশ্চিমের চিন্তাভাবনার পরিসরে তাই তাদের চিন্তা ভাবনাকে তারা নতুন করে চারিয়ে নেন। এসব করতে যেয়ে তারা নিজ সমাজের জন্য কিছু ভূমিকা পালন করেন অবশ্যই। সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন, সাহিত্য চর্চা করেন, কমবেশি অনেকে রাজনীতিতেও উদ্বুদ্ধ হন। মোটের উপর এই যে তৎপরতা সেদিন ব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তা যেহেতু কলোনির প্রভুদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষণায় সম্ভব হয়েছিল, তাই এই আন্দোলন কখনো কলোনির বৃত্তকে ভাঙতে পারেনি। উল্টো কলোনির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এডওয়ার্ড সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজম বইতে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন কি করে সাম্রাজ্যবাদ কলোনির অতীত ইতিহাসকে বদলে ফেলেছে, বিকৃত করেছে, ইতিহাসকে করেছে কিংবদন্তী, কিংবদন্তীকে বানিয়েছে ইতিহাস। সাঈদ নিপুণতার সাথে দেখিয়েছেন ইউরোপীয়দের 'ওরিয়েন্টালিজমের' সাথে, 'ওরিয়েন্টের' সম্পর্ক গৌন, এ হচ্ছে ইউরোপীয়দের কল্পনার ফল, প্রাচ্যকে শাসন ও শোষণ করার কলাকৌশল ও তাত্ত্বিক প্রোজেকশন মাত্র। এটা আজ বুঝতে কষ্ট হয় না এই ইউরোপীয় প্রোজেকশনের দেশীয় সংস্করণ হচ্ছে বাংলার জাগরণ নামক গ্রন্থ! সাম্রাজ্যবাদের সাথে যে সংস্কৃতির সম্পর্ক আছে, বাংলার জাগরণ নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টালেই তার বৈধতা প্রতিপন্ন হয়।

অনেক বুদ্ধিজীবী দাবি করে থাকেন বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান আধুনিক শিল্পী। এই 'ঋষি' বুদ্ধিজীবী কোন অর্থে আধুনিক, তা অবশ্যই

www.pathagar.com

বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আজীবন কলোনির আমলাতন্ত্রের চাকুরে বঙ্কিমচন্দ্র। লেখায় ও কর্মে এমন কিছু করেননি যা সাম্রাজ্যবাদকে অখুশি করে। উল্টো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্ত কাঠামোটি গড়ে তুলেছিল যে আমলাযন্ত্র তার অংশ হিসেবে তিনি একান্ত অনুগত সেবকের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

সত্য বটে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ভারতে হিন্দু মৌলবাদ ও হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পরম পুরুষ। তার 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও 'বন্দে মাতরম' সংগীত ভারতীয় হিন্দুর জাগরণে কিংবদন্তীতুল্য শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে। একটি সংগীত বা উপন্যাস একটি জাতির আত্মাকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিতে পারে তার তুলনা সমকালে বিরল। কিন্তু যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা হলো বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনার কেন্দ্রে কাজ করেছে প্রগাঢ় হিন্দুত্বের বোধ ও হিন্দুত্বের মনস্বিতা। ভারতকে নিয়ে তিনি যা ভাবতে চেয়েছেন তা মূলত পশ্চিমী প্রভুর প্রস্তাবনা এবং কলোনির প্রভুরা সাম্রাজ্যিক স্বার্থে বঙ্কিমকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি বা জাতিপ্রীতি বলে যদি কিছু থাকে তবে তা মুসলিম বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি লাভ করেছে এবং একধরনের সাম্রাজ্যবাদ মুগ্ধতার মধ্যে তার হিন্দু মৌলবাদী চিন্তা চেতনার সাথে জাতি-প্রেমেরও বিকাশ ঘটেছে। আগেই বলেছি সাম্রাজ্যবাদ কলোনির ইতিহাসকে বিকৃত-বিচ্যুত করেছে এবং এখানে সাম্রাজ্যবাদ ধীমান ও নির্ভরশীল বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে যেমন কার্যকরভাবে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছে তেমনি মুসলিম ইতিহাসকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আমাদের ভূখণ্ডে বাংলার জাগরণ যদি আধুনিকতার প্রথম পাঠ হয়, তবে সেই পাঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু মৌলবাদ ও ইংরেজ নির্ভরশীলতা। পুরো উনিশ শতক জুড়ে জাগরণের সারথিরা এ সব বৈশিষ্ট্যগুলোতে পানি সিঞ্চন করেছেন যা কালে কালে বর্ধিত হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয় উনিশ শতকের কমবেশি সব হিন্দু লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজনেতাদের প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান, পুনর্জাগরণ ও সংস্কার এবং এই প্রচেষ্টাই বিশ শতকের প্রথম ভাগে এসে পুরো ভারতব্যাপী হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও ধর্মান্দোলনের আকারে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। সেদিনের এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের সাথে দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ইংরেজ আনুগত্য, বাঙালিত্ব, ভারতীয়তা প্রভৃতি সবই একার্থ হয়ে গিয়েছিল। জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম যে এক নয় এ ধারণা আধুনিকতার কাছ থেকেই আমরা লাভ করেছি অথচ এ ব্যাখ্যা সেদিনের জাগরণের সারথিরা কতদূর মানতে পেরেছিলেন তা বলা শক্ত, উল্টো জাতীয়তাবাদের সাথে ধর্মকে তারা গুলিয়ে ফেলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রতো বটেই, কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, রামকৃষ্ণ পরমহংস-স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় প্রচেষ্টাসমূহকে কি কোনক্রমে সেকুলার বলা চলে? শোনা যায় ঈশ্বরচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন, মধুসূদন দত্ত হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন কিন্তু এদের নানামূখী

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা ও সাহিত্য সাধনার মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবল প্রতাপকেই তো আমরা অনুভব করি। সেকুলার মন, মনন, মূল্যবোধ এখানে কতটুকু উপস্থিত? তাই মাইকেলের মৃত্যুর পরও তাঁর জীবনীকার তাকে 'শ্রী মধুসূদন' হিসেবে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির একজন রূপে নতুন করে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হন না।

আধুনিকতার অন্যতম এলিমেন্ট সেকুলারিজম বাংলার জাগরণের সারথিদের প্রভাবিত যে করেনি তা মোটের উপর জোর দিয়েই বলা যায়। কলোনির প্রভু কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া এই রেনেসাঁস তাই সেদিন যেমন সেকুলার ছিল না তেমনি সেকালের কোন প্রগতিশীল আন্দোলন এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের প্রতি রেনেসাঁর নায়কদের নিস্পৃহতা গভীরভাবে বিবেচনার যোগ্য। এই জন্য দেখা যায় তাদের সৃষ্টিকর্মে পরাধীনতার বিরুদ্ধে যেমন জোরালো কণ্ঠে কোন প্রতিবাদ নেই, তেমনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় এর প্রতি সমর্থন দূরে থাক রাজনৈতিকভাবে ইংরেজের সমর্থন তাদের কাছে তখন পরম আরাধ্য হয়ে ওঠে। ইংরেজের প্রতি অন্ধ সমর্থনকে কি জাগরণ বলা যায়, আর জাগরণ যদি বলতেই হয় তাকে কি আধুনিক বলা সংগত? যে আন্দোলন মূলগতভাবে ছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদী, বৃহত্তর জনসাধারণের সাথে যার যোগহীনতা স্পষ্ট, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও অস্বীকৃতি ছিল যার নায়কদের চেতন ও অবচেতন বৈশিষ্ট্য তার কি ইতিহাসের কাঠগড়ায় জেরার মুখোমুখি হওয়া খুব সংগত ও স্বাভাবিক নয়?

এর পরেও লক্ষ্য করার বিষয় হলো বাংলার জাগরণের নায়কদের দ্বিধাহীন ও প্রশ্নোর্ধভাবে আধুনিকতার মালা পরে নিতে অসুবিধা হয়নি। কারণ একটাই, ব্রিটিশ হেজিমনির ক্ষমতা। ব্রিটিশ হেজিমনির যারা সহায়ক শক্তি, কলাবরেটর, তারা অনাধুনিক হতে যাবে কেন? ইতিহাস বলছে যারাই সাম্রাজ্যবাদকে অর্ঘ্য দিয়েছে, পূজা করেছে, সাম্রাজ্যবাদের রাজশকট টেনে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সাম্রাজ্যবাদ তাদেরকেই আধুনিক, প্রগতিপন্থী ও সভ্যতার সন্তান হিসেবে বন্দিত করেছে। এর নজীর বিস্তর। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ এ কাজটি করেছে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে। সাম্রাজ্যবাদের চোখে তারাই গণশত্রু, প্রগতি বিরুদ্ধ, সভ্যতার বাধক, যারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শাসন, ত্রাসের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে, দেশের আজাদী ও মুক্তির লক্ষ্যে যারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে গেছে।

৪

আধুনিকতার এই আলোচনার পরিসর আমরা এখন একটু ঘুরিয়ে দেখতে চাই। ঊনিশ শতকের এই আধুনিকতার আন্দোলন বাঙালি মুসলমানের চিত্তে কি কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল? সেই প্রতিক্রিয়ার ভাষা উদ্ধার করা না গেলে আমাদের এই উত্তর আধুনিকতার আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। বাঙালি

www.pathagar.com

মুসলমানের কাছে আধুনিকতার স্বাদ বাঙালি হিন্দুর মতো কখনোই প্রীতিকর ও রসনালোলুপ মনে হয়নি। আধুনিকতার স্বাদ মুসলমানেরা নিয়েছে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। তারা যখন দেখল আধুনিকতার প্রতিভূরা তাদের রাজ্য কেড়ে নিচ্ছে, যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ছিনিয়ে নিয়ে প্রতিবেশী হিন্দুদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিচ্ছে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে দুই পায়ে দলে কৃত্রিমভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের যৌথ তদারকিতে নতুন সংস্কৃতির উত্থান ঘটানো হচ্ছে তখন তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা এবং সেই প্রতিক্রিয়া জন্ম দিয়েছিল প্রতিরোধের বাসনা। এ বাসনা মুসলমানের জীবন বিশ্বাস ইসলামের জেহাদের শিক্ষা থেকেই আহরিত হয়েছিল। ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীর, ফকীর মজনুশাহ প্রভৃতির আন্দোলন ও জেহাদ সেই দীর্ঘ প্রতিরোধের ইতিহাসের এক একটা উজ্জ্বল অধ্যায়।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় শিখণ্ডীরা মুসলমানের এই আত্মরক্ষা ও আত্মপরিচয়ের যুদ্ধকে আখ্যা দিয়েছে পিউরিটান অতীত যাত্রা হিসেবে। আজও আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী তারস্বরে হাহাকার করে বেড়ান মুসলমানের এই অতীতমুখিতা, তাদের মরুভূমি, ইরান, তুরান, দজলা, ফোরাতের দিকে যাত্রাই নাকি ছিল তাদের সেদিনের হীনমন্যতা ও পশ্চাদগামিতার কারণ। হিন্দু লেখকরাতো বটেই, কাজী আবদুল ওদুদের মতো মুসলমান লেখকও তার 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থে বাংলায় ওহাবী মতের প্রসারকে প্রাদুর্ভাব বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তিতুমীরের লড়াইকে যে ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সহকারে বর্ণনা করেছেন, তা যে কোন দেশপ্রেমিকের জন্য চিত্ত বিদারি অনুভূতি বটে। অথচ এরা কখনোই মুসলমানদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের পলিসিকে বিবেচনা করতে আগ্রহী নন। এমনকি সেদিনের মুসলমানদের হীনমন্যতা, নিরক্ষরতা, পশ্চাদগামিতা ও দারিদ্র্যের যে ঐতিহাসিক কার্যকারণ রয়েছে তাও গ্রাহ্যতার মধ্যে নিতে ইচ্ছুক নন। মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও স্বাধীনতার স্পৃহাকে অতীতমুখিতা, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা বলে উড়িয়ে দেয়ার এই চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী প্রজেক্টেরই অংশ। লক্ষ্য করুন প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' বার্তা গ্রহণ করে হিন্দু মৌলবাদের উত্থান ও ইংরেজ আনুগত্যকে অপরিহার্য করে তোলার পরেও তাকে অতীতমুখিতার কারণে নিন্দিত হতে হচ্ছে না। তবে কি স্বাধীনতার বিরোধিতাই আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে। অথবা নির্বিচারে ইউরোপের জ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর যোগাযোগই আধুনিকতার মানদণ্ড এ ব্যাখ্যা আমাদের অবলীলায় মেনে নিতে হবে। এটা সত্য নিঃস্ব দীন বাঙালি মুসলমানেরা সেদিন ইসলামের ভিতর স্বাধীনতার সীমা খুঁজেছেন, ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে নিজের সংস্কৃতির ভূগোল আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অনুবর্তিতার স্থলে নিজের ঐতিহ্যের মধ্যে

www.pathagar.com

বাঁচবার আত্মবিশ্বাস অর্জনও করেছেন। ব্রিটিশ ও হিন্দুর সম্মিলিত বিরোধিতার মুখে সেকালের মুসলমানদের আইডেন্টিটি বা আত্মপরিচয় বাঁচিয়ে রাখার এর চেয়ে উত্তম বিকল্প ছিল কি?

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজের রাষ্ট্রিক বিরোধিতা ও বিরূপতার কারণে তারা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জগতে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের থেকে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু থেমে যায়নি। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে তারা স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি বাঁচানোর জেহাদে অংশগ্রহণ করেছে, পরে যখন বুঝতে পেরেছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ইংরেজের সাথে সম্মুখ সমরে এঁটে ওঠা মুশকিল, তখন তারা কৌশল পাল্টিয়েছে। এ কৌশল পরিবর্তনে সেদিন মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছেন নওয়াব আবদুল লতিফ, জাস্টিস আমীর আলীর মত সমাজ নেতারা। তারা নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। তারা তাদের বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সেদিন বুঝেছিলেন এ কৌশল ব্যতীত ইংরেজের শাসনে চটজলদি মুসলমানরা বস্তুগত সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বিশেষ করে জাস্টিস আমীর আলীর লেখা দুটো বই The Spirit of Islam ও History of the Saracens সেদিন তরুণ শিক্ষিত মুসলমানের প্রাণে জাগরণের প্রাণবহ্নি সৃষ্টি করেছিল। এ কথা নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না জাস্টিস আমীর আলীর মতো যোগ্যতা সম্পন্ন ধীমান লেখক ও বুদ্ধিজীবী সেদিনের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও গণ্ডায় গণ্ডায় আবির্ভূত হননি। অন্যদিকে আর যাই হোক কেউ তাকে অনাধুনিক বলার স্পর্ধাও দেখাতে পারবেন না আশা করি। এখন আবার বলা হচ্ছে আমীর আলী কিংবা নওয়াব আবদুল লতীফ এরা কেউই বাঙালি ছিলেন না। বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভালো বাংলা জানবার পরও একজন কি করে বাঙালি হতে পারেন না তা একটা প্রশ্ন বটে এবং সেই প্রশ্নের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কোন বীজ লুকিয়ে নেই তো? এটা সত্য নওয়াব আবদুল লতীফ ও আমীর আলীর যাবতীয় লেখালেখি ও বক্তৃতা বিবৃতি ইংরেজী ভাষায় রচিত। এর জন্য তখনকার বাস্তবতা অবশ্যই একটা কারণ। কিন্তু অবাঙালি ও ইউরোপিয়ান ভিভিয়ান ডিরোজিও যদি বাংলার জাগরণের ভিত প্রস্তুত করতে পারেন তাহলে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীরা বাঙালি মুসলমানদের দিক নির্দেশ করতে পারবেন না কেন? মুসলমানদের মধ্যে রেনেসাঁস আসেনি একথা সর্ববাদী সম্মত নয়। যেটা বুঝবার ব্যাপার সেটা হচ্ছে মুসলমানদের রেনেসাঁস সেদিন শুরু হয়েছিল তাদের সংস্কৃতির প্রয়োজনকে সামনে রেখে। সেই সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুধাবন করা চাই মুসলিম সংস্কৃতির ভেতরের একজন হয়ে, বাইরে থেকে ভিন্ন সংস্কৃতির একজন পর্যবেক্ষণকারীর মতো নয়। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একটা সমস্যা হচ্ছে কলোনির হীনমন্যতা তারা অনেকক্ষেত্রেই

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন এবং এই হীনমন্যতার চোখ দিয়েই তারা মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এতে বিচারের ক্ষেত্রে যে নিরপেক্ষতা রক্ষা সম্ভব হচ্ছে না, তারা তা বুঝতে পারছেন না।

বাঙালি মুসলমান সমাজে আধুনিকতার গতি প্রকৃতি বুঝতে হলে এটাও আগে অনুধাবন করা চাই যে, অন্তর্গঠন ও অন্তর্বয়নের দিক দিয়ে হিন্দু সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজ অনেক বেশি সংহত ও গতিশীল। অন্তত জাত পাতের বিরোধ মুসলমান সমাজকে কুরে কুরে খায় না। নরবলী, সতীদাহ ইত্যকার অন্ধকার সংস্কৃতি মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়। শুধু সেকালের বিচারেই নয়, এ কালের মূল্যবোধের ভিত্তিতেও যদি বিবেচনা করা যায় তবে ভারতীয় হিন্দু সমাজে মানবতার অপমানকারী যে ভয়ানক বর্ণপ্রথা আজও চালু আছে তা কেবল এক সময়ের দক্ষিণ আফ্রিকার Apartheid-বর্ণবাদের সাথেই তুলনীয়। এরকম একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কৃতির বুক জুড়ে সংস্কার আসবে এটাইতো স্বাভাবিক। রাজা রামমোহন, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলেন তাদের সংস্কৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতির তুল্য নয়। এই তুলনার বোধ থেকেই তারা বুঝেছিলেন নরবলী, সতীদাহ প্রভৃতি মূলত মানবতা বিরোধী কর্মযজ্ঞ, একে বিলোপ করাই সময়ের দাবি। এখন কথা হচ্ছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ যে সব অবস্থা ও সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে সংস্কার প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলেন তা পূর্ব থেকেই মুসলমান সমাজে অনুপস্থিত ছিল। এই সংস্কার প্রচেষ্টা যদি রেনেসাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেরকম রেনেসাঁ সেদিন মুসলমান সমাজের কাজে আসতো না। মুসলমান সমাজের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ইউরোপের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মুসলিম সমাজের গতিশীলতাকে নতুন করে ঝালিয়ে নেয়া, যাতে করে জ্ঞান বিজ্ঞান আর সৃষ্টিশীলতার জগতে মুসলমানদের পদসঞ্চার অনুভূত হয়। সেই প্রয়োজন বোধ হয় আজও ফুরিয়ে যায়নি।

যাই হোক মুসলিম সমাজে রেনেসাঁস আসেনি বলে যে সব বুদ্ধিজীবী বুক চাপড়ে মাতম করেন, সেই মাতমের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতার লজ্জা প্রকাশ পায়, আগেই বলেছি যা তারা অর্জন করেছেন কলোনির মানসিকতা থেকে। মনে রাখা দরকার বঙ্কিমের জীবদ্দশায় মুসলমান সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন। উপন্যাস রচনার ক্ষমতা বঙ্কিমের চেয়ে বেশি না হলেও কম ছিল না তার। তারপরে বাঙালি মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হন রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী, শেখ আবদুর রহীম, মওলানা আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মত ভাবুক ও চিন্তক, নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কাজী ইমদাদুল হকের মতো ঔপন্যাসিক, কাজী নজরুল ইসলামের মত যুগস্রষ্টা কবি। রাজনীতির জগতেও মুসলমানরা এগিয়ে আসেন। তাদের দাবি দাওয়ার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন

www.pathagar.com

করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ, এর নেতৃত্ব দেন ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনা ধারালো হয়ে ওঠে। মনে রাখা দরকার বাঙালি বা ভারতীয় হিন্দুর আইডেন্টিটি বিকশিত হয়েছে কলোনির সাথে সহযোগিতার পথে। মুসলমানের আইডেন্টিটি ধারালো হয়েছে কলোনির বিরুদ্ধতা ও বৈরিতার মধ্যে। ব্রিটিশ কলোনির পুরো সময় যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে এটা সহজেই প্রতিভাত হয় হিন্দুর রাজনীতি ও সংস্কৃতি মূলগতভাবে মুসলমানের চেয়ে ইংরেজ নির্ভরশীল। এই সাংস্কৃতিক চেতনাই সেদিন হিন্দুকে বানিয়েছিল ইংরেজ অনুগত, মুসলমানকে স্বাধীনতাকামী। এই সাংস্কৃতিক বিরোধের প্রকৃতি বোঝা গেলেই দেশভাগের অনিবার্যতা ও পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করা সহজ হবে। এটা সত্য দেশভাগের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ বুদ্ধি লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এটা তার চেয়ে বড় সত্য, এই সাংস্কৃতিক বিভাজনই দেশভাগের আয়োজনকে অনিবার্য করে তোলে। পশ্চিম বাংলার আপামর জনসাধারণ যদি হিন্দু না হয়ে মুসলমান হতো তবে নিশ্চয় সেদিন তারা বাংলা ভাগ করে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিত না। একই কথা পূর্ব বাংলার মানুষদের সম্পর্কেও খাটে। এখানকার মানুষ হিন্দু ধর্মালম্বী হলে সেদিনের পুর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত হতো সন্দেহ নেই। এ সব কথা আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদের মতো মনস্বী ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভাষা অভিন্ন এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য, ভাষার অভিন্নতা দেশভাগের ছেদ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। এই সত্যের তলায় অন্য কোন গভীর সত্য লুকিয়ে আছে। সেই গভীর সত্যই হচ্ছে সংস্কৃতির সত্য, আইডেন্টিটির সত্য। আর এ ভাবেই ভারতীয় মুসলমানের আইডেন্টিটি দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে একটা ঐতিহাসিক মূহূর্ত ও মীমাংসার দিকে অগ্রসর হয়। ভারতীয় মুসলমানেরা পাকিস্তান চেয়েছিল, বাঙালি মুসলমানেরা তাতে ওতপ্রোতভাবে শরীক হয়েছিল। পাকিস্তান অর্জন ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহাসিকতা চিহ্নিত করেছে এবং অন্নদাশংকরের ভাষায় পাকিস্তান অর্জনের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা সেদিন সম্প্রদায় থেকে রাতারাতি জাতিতে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান না হলে ভারতীয় মুসলমানরা সাংস্কৃতিকভাবে বিলীন হয়ে যেত, তার রাজনৈতিক ও সংখ্যাতাত্বিক অস্তিত্বও বিপন্ন হতো। আজকের 'সেকুলার' ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দলন, পীড়ন, নির্যাতন ও নিবর্তনের যে ভয়ানক চিত্র আমরা দেখতে পাই, তাকি চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয়? তাই আমাদের যে সব বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের ইতিহাসকে এক তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান, তারা আসলে ইতিহাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

এই বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করেছেন, দেশ ভাগের পর বাঙালি মুসলমান সমাজ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান নামক অন্য একটি উপনিবেশে প্রবেশ করে। যে বাঙালি মুসলমানরা শতকরা ৯৯ ভাগ ভোট দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে নিজেদের আনুগত্য জিম্মা রেখেছিলেন সেই পাকিস্তান উপনিবেশ হতে যাবে কেন? পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং নৈতিক সামর্থ্যহীন এই প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে এক পর্যায়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। এর জন্য দায়ী পাকিস্তানের দেউলিয়া নেতৃত্ব।

তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশেই দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সময় যে সব নেতা অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তারাই জাতীয় সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার নজির রেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে দৃশ্যমান ইম্পেরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করা সহজ হয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও অদৃশ্য ইম্পেরিয়ালিজমের ভূতের বিরুদ্ধে লড়াই এত সহজ ছিল না। তাছাড়া অশিক্ষা ও দারিদ্র্য কাতর জনগোষ্ঠীর বাস্তব চাহিদা পূরণের ব্যাপার ছিল, যে সমস্যা পরাধীন আমলে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে আদৌ মোকাবেলা করতে হয়নি। বাস্তবতার দোরগোড়ায় এসে আমাদের নেতৃত্বের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতোই সেদিনের পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশে এক অক্ষমতার রাজনীতি বিকশিত হয়েছে। এই অক্ষমতার রাজনীতির একটা ধরন হচ্ছে এজিটেশনাল পলিটিক্স। এই নীতির ফাঁক গলিয়ে সেদিনের পাকিস্তানে নানা রকম আন্দোলনের সূত্রপাত এবং তারই পথ বেয়ে ৭১ এর ঘটনার ভিত প্রস্তুত হয়। এর সাথে ভাষাশ্রয়ী বাঙালি জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক নেই। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটা এসেছে এক সুদূর ষড়যন্ত্রের হাত ধরে এবং এ প্রশ্নটা তুলেছেন তারাই যাদের প্রভুরা বিভাগ পূর্বকালে মুসলমানের আইডেন্টিটিকে আদৌ স্বীকৃতি দিতে চাননি। এর একটা ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। কলোনির যুগে মুসলমানরা স্বাতন্ত্র্য বাঁচানোর নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রিক বিরূপতার কারণে সীমাহীন দারিদ্র্য ও অশিক্ষা হেতু তারা এক পশ্চাদগামিতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছেন, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের উন্নতি ও বিকাশ মুসলমানকে নিমজ্জিত করে গভীর হতাশা ও হীনমন্যতায়। এর ফলে নির্বিচারে বাঙালি মুসলমানের কেউ কেউ কলকাতার বাবু সংস্কৃতিরও পূজা করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি কথাটার মানে এরা খুঁজেছেন ঠাকুর, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্তী, গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় বা গোস্বামীদের রচনায়। কলকাতার মধ্যেই এরা বাঙালি সংস্কৃতির তুরীয় প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আর এভাবেই তারা

www.pathagar.com

বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক রোমান্টিক তত্ত্ব আত্মস্থ করেছেন এবং সেই আত্তীকরণ তাদের বোধে ও মননে জবরদস্ত এক ছাপ ফেলে দিয়েছে। এরা এডওয়ার্ড সাঈদের ওরিয়েন্টাল নয়, ওরিয়েন্টালিজম প্রকল্পের অংশীদার, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ যে প্রকল্পের জনক। ওরিয়েন্টালিজম যেমন কলোনির অতীত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদও বাঙালি মুসলমানের আইডেন্টিটি অস্বীকার করে। এ কালের মতো সেকালেও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আইডেন্টিটি অস্বীকারকারীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। ত্রিশের দশকে ঢাকায় শিখা গোষ্ঠীর পত্তন হয়েছিল, এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখেরা। এরা সংস্কৃতির দিক দিয়ে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিলেন বলা চলে। উল্টো এরা চূড়ান্ত জ্ঞান করেছিলেন একদিকে পশ্চিমের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে এবং অন্যদিকে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকে। এদের অনুবর্তীদের অনেকে আজও সেই আইডেন্টিটি অস্বীকারের পথেই এগুচ্ছেন। পশ্চিমমুখীনতা ও বর্ণহিন্দুর সংস্কৃতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা কমন ঐক্য আছে। এরা উভয়ই মূলগতভাবে ইসলাম বৈরী। যারা ভাষাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ ও বাংলা ভাষার জন্য অহর্নিশ মাতম করেন তারা কিন্তু নির্বিরোধ পশ্চিমী মূল্যবোধ আত্মস্থ করে নেন। 'ভাষা সৈনিকের' সন্তান সন্ততিও আজ বাংলার আগে ইংরেজী শিখতে আগ্রহী, ইংরেজী স্কুলে সন্তানের ভর্তির জন্য এরা দুই বছর আগে কিউয়ে দাঁড়ান। অথচ এদেরই যদি বলা হয় ইসলাম ধর্মের ভাষা আরবী শিখতে তখন তাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। এদেশে স্কুল পর্যায়ে আরবী শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে, এরকম নজীরও বিরল নয়। একারণেই হয়ত অনেক উত্তর আধুনিক তাত্ত্বিক আজকাল শিকড়ে ফেরার কথা বলেন, এই শিকড়ে ফেরা বলতে তারা এক আবহমান, চিরায়ত ও লোকাশ্রয়ী বাংলার দিকে ইংগিত করেন। এই আবহমান ও চিরায়ত শব্দের মধ্যে একটা ফাঁক আছে, আবহমান ও চিরায়ত বলতে তারা মূলত প্রাক ইসলামী বাংলার ঐতিহ্যের কথা বলেন, যা প্রকারন্তরে বর্ণবাদী বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতির নামান্তর। উত্তর আধুনিক এই পর্বে এসে বাঙালি মুসলমানরা তাই আধিপত্যকামী বর্ণহিন্দুর বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের যৌথ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জের যথাযথ মোকাবিলার মধ্যে বাঙালি মুসলমানের উত্তর আধুনিকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ যাচাই হতে পারে। আগেই বলেছি বাঙালি মুসলমানের সাথে আধুনিকতার পরিচয় ঘটেছিল ইঙ্গ-হিন্দু যৌথ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। উত্তর আধুনিক পর্বে এসে বরাবরের মতো প্রতিপক্ষ এক, শুধু সময় ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বাঙালি মুসলমান সেদিনের চেয়ে অনেকখানি এগিয়েছে। হীনমন্যতার অনেকাংশ আজ তারা ঝেড়ে ফেলেছে। জাতীয় ও

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক উভয় অবস্থানেই সেদিনের বাঙালি হিন্দুর তুলনায় কোন অংশে আজ তারা পিছিয়ে নেই। বাঙালি মুসলমানের উত্তর আধুনিকতা এই পর্বে এসে নতুন মোড় নিয়েছে। আধুনিকতার কালে ও চাপে বাঙালি মুসলমান অনেকাংশে ঐতিহ্যের সাথে যোগ হারিয়ে ফেলেছিল। ছিঁড়ে গিয়েছিল ইতিহাসের সাতনরীহার। উত্তর আধুনিক পর্বে এসে সেই ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার চাই। আরও চাই আপন সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে অনুধাবন, চাই আপন সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা। ছিঁড়ে যাওয়া ইতিহাসের হারও জোড়া দেয়া আজ জরুরি। এবং এই সার্বিক কর্মকাণ্ডটির চেতনা কেন্দ্রে থাকা চাই ইসলামের জীবন্ত উপস্থিতি। আর এভাবেই হীনমন্যতার শেষ অবশেষটুকু ছুড়ে ফেলা সম্ভব। মুখের ভাষা বাংলা হওয়ার সুবাদে এখানকার মুসলমান হয়তো বাঙালি কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য তারা ইসলামের অনুবর্তী ও অনুসারী। তাদের সংস্কৃতি ভূগোলের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতিরও অংশ। এক আন্তর্জাতিক সমাজশক্তি হিসেবে বিশ্ব মুসলমানের কাফেলায় বাঙালি মুসলমানের প্রতাপ ও উপস্থিতিও আজ তাই জরুরি। পশ্চিমমুখীনতা অথবা কলকাতামুখীনতার বাইরে এই বিশ্ব মুসলিম বোধ ও চৈতন্যের সাথে আত্মস্থ হওয়ার মধ্যেই বাঙালি মুসলমানের উত্তর আধুনিক অন্বেষা স্বরূপে, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলাম ও উত্তর আধুনিকতা

এখনকার বাস্তব

আমরা যে কালে বাস করছি তাকে উত্তর আধুনিক না বলে উত্তর ঔপনিবেশিক বলাই যথার্থ ও শ্রেয়। আধুনিকের পর উত্তর আধুনিক নয়, ঔপনিবেশিকের পর উত্তর ঔপনিবেশিক, কিংবা সাম্রাজ্যবাদের পর উত্তর সাম্রাজ্যবাদ। আমরা যে সময়কে ইসলামী দুনিয়ায় আধুনিকের সূচনা বা বিকাশকাল হিসেবে মনে করি তা আসলে ঔপনিবেশিক কাল। পশ্চিমের আধুনিকতা থেকে জাত এই মুসলিম বিশ্বের ঔপনিবেশিকতার দুঃস্থতার সাথে পোস্টমডার্ন থেকে জাত উত্তর ঔপনিবেশিকতার নিগ্রহের মধ্যে বড় কোন ফারাক নেই। ওখানকার 'আধুনিক' যে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় আমাদের বিধ্বস্ত করেছিল, সে প্রক্রিয়া আজও সচল, শুধু উত্তর আধুনিক যুগের লুণ্ঠন ও শোষণ পদ্ধতিতে নতুন কৌশল যোগ হয়েছে মাত্র। এখনকার শক্তি হচ্ছে কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট এবং সর্বোপরি প্রবল মিডিয়া। পোস্টমডার্ন এদের দিয়েই শাসন ও শোষণ করে, আগেকার রেলপথ কিংবা কয়লার জাহাজ দিয়ে নয়। একে বলা যায় পোস্টমডার্ন ঔপনিবেশিকতা। কারণ মিডিয়ার সূত্রে, প্রযুক্তির কৌশলের মধ্য দিয়ে উত্তর আধুনিক ঔপনিবেশিকতা আধুনিকতার মতোই আমাদের ইতিহাসকে নতুন করে বিকৃত করছে। আমরা যেমন একদা পশ্চিমী সুরায় উন্মাতাল হয়ে আধুনিকতার ভয়াবহ ছোবলকে বুঝতে পারিনি, তেমনি পোস্টমডার্নকে নিয়ে যারা আজও ভাবছি তারা এই নতুন ঔপনিবেশিকতার চেহারা ধরতে পারছি না। পোস্টমডার্নকে পশ্চিমীরা যে ভাবে ব্যাখ্যা করছে, একটি উপনিবেশিত জাতির মতোই আমরা তা অবলীলায় গ্রহণ করছি। ফলে এখানে পোস্টমডার্ন এই ধারণাটি আদৌ পশ্চিমের মতো আসে কি না সে প্রশ্ন কেউই যুক্তিনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে পারছে না।

এরি মধ্যে দুর্বল মুসলিম দেশগুলোর দিকে ধেয়ে আসছে উত্তর আধুনিক পশ্চিমের প্রবলতর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য যা এ কালের নিদারুণ সংকট, গভীর ভয়াবহ পরিণতি ও শূন্যতার ইংগিত দিতে শুরু করেছে। এটা সত্য মুসলমানরা আজ অনেকেই বুঝতে শুরু করেছে তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমের এই আরোপিত বৈরিতা। পশ্চিমের ভাষায় যাকে বলা হয় 'মৌলবাদ' তাই নাকি সেখানকার বহুযুগ লালিত মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। পাশ্চাত্যের মিডিয়া, রাজনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকরা মোটামুটি আজ একমত ইসলামী মৌলবাদই সেখানকার সবচেয়ে বড় হুমকি। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি তাই? এমন কোন মুসলিম রাষ্ট্র এ গ্রহে নেই যে কিনা এ কালে কার্যত পাশ্চাত্যের জন্য

www.pathagar.com

হুমকি হয়ে উঠতে পারে কিংবা পাশ্চাত্যের কোন দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে। এতদসত্ত্বেও আমরা প্রতিনিয়ত ইসলামী মৌলবাদের ভয়ানক রকম দস্যুতা ও নিষ্ঠুরতার কথা শুনছি এবং স্বকপোলকল্পিত এক আতংকের দুনিয়ায় বাস করছি।

পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী আকবর এস আহমদ পাশ্চাত্যের এই বৈরিতাকে দুটি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধজাত পার্থক্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিশেষজ্ঞ জন. এল. এসপেসিটো ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের এই মনোভাবকে ঐতিহাসিকতার আলোয় বিচার করে বলতে চেয়েছেন এ হলো ক্রুসেডিয় মানসিকতার ধারাবাহিকতা। প্রায় ষাট বছর আগে মোহাম্মদ আসাদও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এই বলে আধুনিক পাশ্চাত্যের গণজীবন থেকে আজও ক্রুসেডের ছায়া অপসৃত হয়নি। যারা এ ঘটনাটি মানতে চান না তারা ইতিহাসের মিথ্যা কথন করেন। সময় ও অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু ইসলাম ও খ্রিস্টীয় মুল্লুকের পারস্পরিক বিরোধ; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক নানা দিকেই বরাবরের মতো অব্যাহত রয়েছে।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর পৃথিবী নামক গ্রহের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরোপুরি বদলে গেছে। এতকালের পাশ্চাত্যের অসূয়া সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পরিবর্তে একচেটিয়া এসে পড়েছে মুসলিম দুনিয়ার উপর। প্রাযুক্তিক আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে পুরো পাশ্চাত্য আজ তাই দুর্বল মুসলিম দেশগুলোতে হরিণ শাবক শিকারের খেলায় মেতে উঠেছে।

১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুরো পাশ্চাত্য জোট ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক সর্বগ্রাসী নরমেধযজ্ঞের মধ্যে এর অবসান ঘটে। বলার অপেক্ষা রাখে না এ যুদ্ধের পরিণতি হয়েছে গ্রীক ট্রাজেডির চেয়েও বেদনাবিধুর। কিন্তু এই বেদনার বিয়াবান থেকে একটি সত্য মর্মান্তিকভাবে উঠে এসেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে মনমোহিনীরূপ তা আসলে ধনবাদ ও বস্তুবাদের কুৎসিত চেহারা ঢেকে রাখার জন্যই। তার গানের ধুয়া গণতন্ত্র, মানবাধিকার, লিঙ্গসাম্য ইত্যাদি। এ ধুয়া আসলে এক বড় রকমের শঠতা। এই শঠতা ও ধনবাদী ভোগলিপ্সার চক্রে পড়ে পুরো মানবতার ভবিষ্যৎই আজ সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে।

উপসাগরীয় সংকট একই সাথে আমাদের আরও কয়েকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা হয়তো ভবিষ্যতের প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে।

প্রথমত মিডিয়ার প্রবল, সর্বত্রগামী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিতি এবং এর অনন্য নাশকতাকারী ভূমিকা। একই সাথে মিডিয়ার মনমোহিনীরূপে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত আমরা যে এতকাল পরস্পর নির্ভরশীল বাসযোগ্য পৃথিবীর কথা ভেবে আসছিলাম তার ছকও রীতিমত ওলটপালট হয়ে গেছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অসূয়া সব রকমের সৌভ্রাতৃত্বের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।

এই যে প্রবণতা, অবিশ্বাস, অসম্প্রীতি মানবতাকে নানা খণ্ডে টুকরো টুকরো করে ফেলছে, তা যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মানুষ প্রযুক্তিতে অনেকদূর এগিয়ে এলেও মানবিকতার মূল্যবোধের বিকাশের দিক দিয়ে খুব কি এগুতে পেরেছে? সেকালে হিটলার, মুসোলিনীরা ছিল, একালে বুশ, শ্যারনরা আছে।

মনে পড়বে উপসাগরীয় সংকটের বছর দুয়েক আগে ভিন্ন রকমের এক সংকটের কথা, যা মুসলিম দুনিয়াকে বিপুলভাবে ঝাঁকি দিয়েছিল। আমরা তখন মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা শুনেছিলাম, এ স্বাধীনতাকে ধরে রাখার জন্য বুদ্ধিজীবীরা ভলটেয়ারের বিখ্যাত উদ্ধৃতিও চয়ন করতেন। এ সমস্তই হয়েছিল সেই সমস্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা নাকি কুখ্যাত সালমান রুশদীকৃত The Satanic Verses এর অসত্যের জওয়াব দিতে চেয়েছিল। মুসলমানরা বিশ্বাস করেছিল এ বইতে রসূল (স.) ও তাঁর পরিবারকে কলঙ্কিত করা হয়েছে এবং কুরআনের নির্ভুলতাকেও প্রশ্নের মুখোমুখি করা হয়েছে। মরহুম আয়াতুল্লাহ খোমেনী এক ফতওয়ার মাধ্যমে সালমান রুশদীকে হত্যার দণ্ড দিয়ে মুসলমানের আবেগকে এক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আয়াতুল্লাহর ইন্তেকালের পর পুরো ব্যাপারটি অনিস্পত্তিযোগ্য হয়ে ওঠে, কেননা কোন ইরানী এই নির্দেশকে বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন না।

উপসাগরীয় সংকটের কিছুদিন পর পাশ্চাত্য মিডিয়া ইসলামকে জড়িয়ে নতুন এক খবর রটনা করে। এ খবরের কেন্দ্রে উঠে আসে পাকিস্তানী ও আরব মালিকানাধীন বিসিসিআই ব্যাংক। এ ব্যাংকের প্রতারণা ও দুর্নীতির বয়ান পশ্চিমী মিডিয়ায় এমনভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয় যাতে মনে হতে পারে এ রকম ব্যাংক কেলেংকারীর ঘটনা অতীতে আর কখনো ঘটেনি। মিডিয়ার এই অতি উৎসাহের কারণ একটি তাহলো এই ব্যাংকের প্রধান কর্তা ব্যক্তিরা ছিলেন সবাই মুসলমান। বিসিসিআই ব্যাংকের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছিল, সত্যি কথা বলতে কি এরকম কাজ পশ্চিমের প্রায় সব ব্যাংকই করে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেউলিয়াও হয়ে যায়। কিন্তু মিডিয়া সেক্ষেত্রে নীরবই থাকে বলা চলে। কিন্তু এখানে মনে হতে পারে মিডিয়া যেন বিসিসিআই গল্পের সাথে পুরো গ্রহকে টেনে নিয়ে এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিসিসিআই এর সাথে ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধা আবু নিদালের যোগ আবিষ্কার করা হলো, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পারমাণবিক পরিকল্পনাকেও জুড়ে দেয়া হলো। এভাবে পশ্চিমী মিডিয়ার কাছে বিসিসিআই হয়ে উঠলো Bank of cocaine and crooks। এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় পশ্চিমী মিডিয়া অহর্নিশ এই ঠগীবৃত্তি

www.pathagar.com

চালিয়ে যাচ্ছে ঃ তাদের একটি ব্যাপারে উদ্যমের শেষ নেই, মুসলমানদের যত্রতত্র এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক মুসলমান মাত্রই একটি Criminal culture-দাগী সংস্কৃতির অংশ।

একজন সাধারণ মুসলমান হয়তো ইমাম খোমেনীর ফতোয়াকে চূড়ান্ত বিবেচনা নাও করতে পারেন, ইরাকের একনায়ক তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে এমনকি বিসিসিআই ব্যাংকের কেলেংকারীকেও নিন্দনীয় মনে করা তাদের কাছে অস্বাভাবিক নয় কিন্তু যে কৌশলে তাদেরকে যুক্ত করে মিডিয়া বিরামহীন চরিত্রহননে লিপ্ত তা তাদের কাছে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।

একজন সাধারণ মুসলমানের মতামত মিডিয়াতে স্থান পায় না, যেখানে দিবারাত্র তার ও তার পারিপার্শ্বিকতাকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি। সালমান রুশদীর বইকে কেন্দ্র করে তাকে চিত্রিত করা হয়েছে ধর্মান্ধ। একনায়কদের কারণে তাকে বলা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে অস্থির এবং ব্যাংক কেলেংকারীর সুবাদে সে এখন দুর্নীতিপরায়ন। নিজের দুর্বল অবস্থানের কারণে সাধারণ মুসলমান তাই নিজেদের যুক্তিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারে না এবং পারে না বলেই সে হয়ে ওঠে অসহায় ও মারাত্মক রকম হতাশাবাদী। পশ্চিমের ঠগীবৃত্তি আর একনায়ক ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাংকার তখন তার কাছে সমান মনে হয়।

এটা বোধগম্য যে মানুষগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে সেখানে ইসলামই শক্তিশালী উপাদান যা তাদেরকে পারস্পরিক ঐক্যবোধে উজ্জীবিত করেছে। তাই স্বভাবত এখানে প্রশ্ন উঠতে পারেঃ এখন থেকে ইসলামকে কি একঘরে করে ফেলা হবে এবং সবরকম নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার উৎস হিসেবে মনে করা হবে। ক্রুসেডের সময় থেকেই ইসলাম অনুসারীদের দেখা হয়েছে বর্বর, অসভ্য, কামজর্জর ও খ্রিস্টধর্মের শত্রু হিসেবে। আমাদের কালে অতিরিক্তভাবে দেখা হচ্ছে নৈরাজ্য, এককেন্দ্রিকতা ও সন্ত্রাসের যন্ত্র হিসেবে। সন্দেহ নেই ইসলামই এখন পাশ্চাত্যের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয়।

পাশ্চাত্যের এই অসূয়া ষোলকলা পূর্ণ করেছে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানকে ঘিরে। পশ্চিমী মিডিয়া ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যে ইমেজ তৈরি করেছে সেটাই আমরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে গ্রহণ করেছি। তালেবান মানেই ঘৃণার যোগ্য, তাদের মানবীয় গুণাবলী থাকুক আর না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। তারা যে নিছকই মধ্যযুগীয়, বর্বর ও সভ্যতার দুশমন তাতে আমাদের প্রাণপণে বিশ্বাস করা চাই। একই কারণে এই অসভ্য ও বর্বরদের উপর নির্বিচারে বোমা মারায় কোন অন্যায় নেই। সুতরাং সভ্য দুনিয়া তাই করলো। নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে তারা তালেবানদের হটিয়ে দিলো। এতে প্রায় ষাট হাজার আফগান নর-নারী প্রাণ দিল, এর মধ্যে অগণ্য নারী ও শিশুও ছিল। এই

www.pathagar.com

নরমেধযজ্ঞে সভ্য দুনিয়া খুশিই হলো। কেননা তাতে সভ্যতা টিকে গেলো আর সভ্যদেরই জয় হলো। এই হলো পশ্চিমী সভ্যতা, তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা। সভ্যতার বরকন্দাজদের এহেন কার্যকারণ বুঝতে না পারলে ইসলামের সাথে উত্তর আধুনিকতার সম্পর্ক নির্ণয় করা যাবে না।

আমাদের কালের প্রশ্ন

সাম্প্রতিক কালের এই সব সংকট আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও কোন না কোন ভাবে একই সূত্রে গাঁথা। এসব ঘটনা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে, সাধারণ একটি বিশ্বাসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় এবং পরিচিত জিনিসগুলোকেই ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে শেখায়। এর পিছনে যে গতিমানতা কাজ করে তা একে একে জন্ম দেয় ধারণা ও সংস্কার, বিতর্ক ও যুক্তির। এই সংকট একই সময় একই সাথে ঐতিহাসিক ও জনপ্রিয় চরিত্রকে একত্রিত করে এবং তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে পুরো পৃথিবীকেই নৈকট্যে নিয়ে আসে। তথ্য প্রযুক্তি একালে আমাদের মুহূর্তের মধ্যে খবরের রাজ্যে পৌঁছে দেয়, ভিন্ন রকমের সব ছবি ও চরিত্রের সহাবস্থান ঘটায়। উচু মানের নীতি দর্শন ও চটুল বইয়ের লাস্যময়ী ধারণাসমূহ, ঐতিহাসিক ঘটনা ও পপ সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এগুলো সবই সম্ভবপর হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের গণযোগাযোগ ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে।

শক্তিশালী মিডিয়ার কারণেই আমরা একই সাথে একই সময় ভিন্ন ও অসম চরিত্রগুলোকে পাশাপাশি দেখছি, যেমন হিটলার ও সাদ্দাম, বুশ ও লাদেন, র‍্যাম্বো ও পাকিস্তানী সৈন্য, সালাদীন ও নেবুচাদনজর, খোমেনী ও রুশদী, ভল্টেয়ার ও ইরানী জনগণ, পোপ ও ম্যাডোনা এবং স্থানসমূহ যেমন মাসাদা ও মক্কা, ব্যাবিলন ও জেরুজালেম। রুশদী সংকট, ম্যাডোনা বিতর্ক ও উপসাগরীয় যুদ্ধ-এগুলো এ সময়ের নাড়া দেবার মতো ঘটনা এবং যে কালে আমরা বাস করছি সে কালের বৈশিষ্ট্যও বটে।

আমাদের এ যুগের চরিত্র হচ্ছে নাটকীয় পরিবর্তনশীলতা। যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে ছিল তা হঠাৎই যেন ভেঙে পড়ছে। এমনকি নিজের সম্পর্কে এবং নিজের আশেপাশের লোকজন সম্পর্কেও ধারণা দ্রুত গতিতে পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে শ্রেণী, গোত্র ও জাতি সম্পর্কেও ধারণা। যদিও ধারণাসমূহের প্রকৃতি ও গভীরতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। এমন একটি ধারণাও এখন আমাদের মধ্যে স্ফীত হচ্ছে যে আমরা মানবেতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছি। তাত্ত্বিকরা সেটাকেই হয়তো আধুনিকতার পরবর্তী ধাপ উত্তর আধুনিকতা হিসেবে নির্দিষ্ট করতে চাইছেন, যদিও কেউ কেউ মনে করেন পূর্ববর্তী সময় থেকে একালের জগত পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

এ রকম একটা সংশয়ী সময়ে আমরা এখন নানা ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি এবং সে সব প্রশ্নের জওয়াবের মধ্যে এ কালের সংকট উত্তরণের পথ উন্মোচিত হতে পারে।

সমাজতন্ত্রের পতনের পর পশ্চিমে ধারণা করা হয় পরবর্তী শত্রু হলো ইসলাম। এর সত্যতা কতটুকু? নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার যে ধারণার কথা আমরা শুনি মুসলমানদের জন্য তার কি কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে? উত্তর আধুনিক যুগ কি প্রকৃতিগত ভাবেই ইসলামের প্রতি শত্রুতাভাবাপন্ন? কেন মিডিয়া প্রতিবেদকগণ একালে, তা একাডেমিশিয়ান বা সাংবাদিক যেই হোন না কেন প্রতিনিয়ত ইসলামের ভাবমূর্তি বিনাশে ব্যস্ত রয়েছেন? সেক্ষেত্রে পশ্চিমী মিডিয়াকে একপেশে হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার মুসলিম প্রতিক্রিয়াকে কতখানি কার্যকরী বলা যাবে? এবং তাই যদি হয় তাহলে মুসলমানরা কতকাল বাকী পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে? মুসলমানের এহেন চরিত্র হনন ও ভাবমূর্তি বিনাশ কি তাদেরকে ইসলামের মূল্যবোধ, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক ঐক্যচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে?

এই মুহূর্তে মুসলিম সমাজে কি কি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর চলছে? উদাহরণস্বরূপ মুসলমানরা কি এই মুহূর্তে জিনসের বদলে ঢোলা পায়জামাকেই বেশি গুরুত্ব দেবে? অথবা মুসলমানের সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মসজিদের বদলে মল (Shopping Mall) এসে জায়গা দখল করে নেবে? মসজিদের খুতবা আমাদের কি শিক্ষা দেয়? কেমন করে মুসলমানরা তাদের মৌলিক ইসলামী চরিত্র যেমন পারিবারিক জীবন, সন্তানের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, সুনীতি ও পরিমিতিবোধের ধারণা, এগুলো উত্তর আধুনিক যুগের বৈরী দর্শনের সামনে টিকিয়ে রাখবে? অথবা কেমন করে মুসলমানরা এ যুগে ইসলামকে সাথে নিয়ে টিকে থাকবে, যে যুগ কিনা চরিত্র বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সেকুলার, হতাশাবাদী, অসংহত ও পুরোপুরি বস্তুবাদী এবং সংগতকারণেই মুসলমানের কাছে তা বৈরী ও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন? এবং তাহলে কি করে মুসলমানরা বিশ্ব সমাজের কাছে তাদের বিশ্বাস ও নীতিসমূহের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ও সার্বজনীনতাকে যথাযথভাবে তুলে ধরবে? আমরা অতীতের দিকে তাকিয়ে আরো কিছু প্রশ্ন তুলে ধরতে পারি ঃ কেমন করে ইসলামের মতো একটা ধর্মীয় সভ্যতা যার রয়েছে নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ নির্ভর দৈনন্দিন ব্যবহার রীতি এমন একটা যুগে মানিয়ে নেবে যা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে অতীতকে পাশ ফিরিয়ে রাখে এবং বহুমাত্রিকতার ধারণায় বিশ্বাস করে? কেমন করে ইসলাম একালে অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করবে? কেমন করে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এখনো মুসলিম সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে চলেছে?

এগুলো আমাদের সময়ের জরুরি প্রশ্ন। নানা রকমের মত, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস বর্তমানে চালু রয়েছে। নানা রকমের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি একই সাথে কাজ করছে। কিন্তু এরি মধ্য থেকে আমাদের সেটিকেই গ্রহণ করতে হবে যেটি

www.pathagar.com

ইসলামের সার্বজনীন মূল্যবোধের বিপর্যয় না ঘটাতে পারে। এটা সত্য ইসলামী উত্তর আধুনিকতার সাথে পশ্চিমী উত্তর আধুনিকতার সম্পর্ক নির্ণয় দুরুহ, পরস্পরের সাথে কার্যকারণের সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টাও নিরর্থক। দুটির মধ্যে সাধারণ ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যের উপাদানগুলোই বেশি। বিশ্বাসের বিপরীতে সন্দেহবাদ (Faith Versus Scepticism), ঐতিহ্যের পাশে ইতিহাস হন্তারক (Tradition versus Iconoclasm), পবিত্রতা বনাম বহুমাত্রিকতা (Purity versus Eclecticism) ঃ ইসলামী উত্তর আধুনিকতার সাথে পশ্চিমী উত্তর আধুনিকতার এই যোজন যোজন দুরত্বের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু সফলতার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে ইসলাম ও পশ্চিমী উত্তর আধুনিকতা দুটি ভিন্ন কার্যকারণ হেতু দুটি তোরণের তলা দিয়ে তাদের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করছে—যে যুগ সম্পর্কে উভয়ের রয়েছে নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন।

উত্তর আধুনিকতার জুয়া

উত্তর আধুনিকতার ঘটনাটি মূলত পশ্চিমের ইতিহাসজাত। আমেরিকা বা ইউরোপের গত প্রায় একশ-দেড়শ বছরের ইতিহাসে জাগতিক নানারকম পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ ও সংকট আভাসিত হয়ে উঠেছে পোস্টমডার্ন তারই প্রতিক্রিয়া। আবার তার থেকে বাঁচবার চেষ্টাও। সুতরাং আমেরিকা বা ইউরোপের থেকে ধার করে আনা এই দর্শন ও চিন্তাধারা আমাদের বাস্তবে কতটা প্রাসঙ্গিক, এর তত্ত্ব ব্যবহার আদৌ এখানে অনুসরণযোগ্য কিনা এটা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

আধুনিকতা আমাদের এখানে মানে মুসলিম দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের সারথি হিসেবে এসেছে। পশ্চিমের প্রোজেক্ট আধুনিকতা ঐতিহাসিক কারণেই গত দুশো বছর কি তারও বেশি সময় ধরে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করেছে, আমাদের ইতিহাসকে করেছে বিকৃত, আমাদের গণজীবনকে করেছে বিধ্বস্ত। আধুনিক পশ্চিমে এক ভূমিকা পালন করেছিল, উপনিবেশে আর এক রকম, তেমনি পোস্টমডার্নও তাই– সংযোগ, মিডিয়া, ইনফরমেশনের আমূল রূপান্তরে আর প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা ও শক্তির প্রাধান্যে এখানে বিশ্বায়নের থাবা এসে পড়ছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পাশ্চাত্যে লিবারেল ডেমোক্রাসী বা ম্যাটেরিয়ালিজমের একতরফা জয়জয়াকার ঘোষিত হয়েছে। একেই পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ফুকুয়ামা বলেছেন End of History। অন্যান্য তাত্বিকরা বলেছেন New world order। এই বিশ্ব ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

পোস্টমডার্নিজম বলতে যদি আমরা এই মুহূর্তের পৃথিবীর দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতা হিসেবে ধরি তবে সেখানেও পশ্চিমের

www.pathagar.com

আধিপত্যের কথা এসে যায়। পোস্টমডার্নে ইতিহাস শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ ঐ পশ্চিমের আধিপত্যকে আমরা মেনে নিচ্ছি। আমাদের বাস্তবে যে যথার্থ ইতিহাস গত দুশতাব্দী তার সত্তা হারিয়ে একরকম স্তব্ধ হয়ে গেছে তার থেকে মুক্তিই এখানকার আধুনিক, সে চেতনা পোস্টমডার্ন প্রতিক্রিয়ায় পুনরায় লুপ্ত হতে বসেছে। তার মানে আধুনিকের উপনিবেশ থেকে আমরা উত্তর আধুনিকের উপনিবেশে যেয়ে পড়েছি।

আমাদের উত্তর ঔপনিবেশিক বাস্তব থেকে তাই পশ্চিমের পোস্টমডার্নকে দেখতে হবে সম্পূর্ণ পৃথক পটভূমিতে। আমাদের এখানে কারো কারো ধারণা হতে পারে, উত্তর আধুনিকতা, আধুনিকতার মতো আগ্রাসী নয়, এর কোন সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষাও নেই। উল্টো কেউ কেউ উত্তর আধুনিকতার মধ্যে আশা, পরমতসহিষ্ণুতা ও আত্মানুসন্ধানের একটা সুযোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথাও ভাবেন। কেউ কেউ মনে করেন এর ফলে পশ্চিম কেন্দ্রিক অর্থের বাইরে আসা যায়, আমাদের বাস্তবের অর্থকে প্রধান করা যায়– এক অ-ঔপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। আসলে কি তাই? পোস্টমডার্নে এসে আমরা যে বিশ্বায়নের দাঁত খিঁচুনী দেখছি তাতো রীতিমত নব্য সাম্রাজ্যবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্বায়ন আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হানা দিচ্ছে, আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানকে ছিঁড়ে ছুড়ে ফালি ফালি করে ফেলছে। আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধকেও আর অটুট থাকতে দিচ্ছে না। আগেই বলেছি পাশ্চাত্যে পোস্টমডার্ন মানে ধনতন্ত্রকে তার সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য, লেট ক্যাপিটালিজমের ভিতরে নতুন করে গতি আনবার চেষ্টা। এটা করতে যেয়ে পোস্টমডার্ন, আধুনিকতা বলে পরিচিত যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা তাকে অস্বীকার করে। 'বহু জাতিক' শব্দটা আজকাল ব্যবহার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এতে বোঝা যায় পুরনো 'বহুজাতিক' কথাটার তাৎপর্যই পাল্টে গেছে। পোস্টমডার্নে এসে এ শব্দটা ব্যবহৃত হয় অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে। এমনিভাবে পোস্টমডার্ন, পুরনো মডার্নকে চ্যালেঞ্জ করে, তার অতীতই পাল্টে দেয়। আর এ ভাবে পোস্টমডার্ন এক নতুন সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করে। একটা উদাহরণ দেই। আধুনিকতার উপনিবেশে একটা বড় রকমের ফাঁক ছিল, এই ফাঁক গলিয়ে জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত একটা চেতনা প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। এই ঔপনিবেশিকতা সে ফাঁক রাখে না।

আমাদের দেশে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে এখন কেউ নাশতা করে না, ব্রেকফাস্ট করে। বাড়িতে পাকঘর তৈরি করে না। কিচেন ডাইনিং স্পেস বানায়। স্বামী-স্ত্রী বলতে সংকোচ বোধ করে, বলে হাসব্যান্ড-ওয়াইফ। খোদা হাফেজ বলতে শরমিন্দা লাগে, বলে বাই বাই। এর কারণ কি? পোস্টমডার্ন ঔপনিবেশিকতায় আক্রান্ত এ দেশ, তার শাসকশ্রেণী। এ ঔপনিবেশিকতা আরও ভয়ংকর। মনের গোলামী কোন কিছুতেই ধনাত্মক অর্থে ব্যবহার করা যায় না।

www.pathagar.com

হয়তো এ কারণেই ইংরেজরা চলে গেলেও ইংরেজের রুচির, শিক্ষার, সভ্যতার প্রশংসায় আমাদের ভাষার অভাব হয় না। অথচ নিজের দেশের ভালো কিছুকেও প্রশংসা করতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই। লক্ষ্য করুন, আরবরা ইংরেজের প্ররোচণায় মুসলিম খেলাফতের সর্বনাশ করেছিল, কিন্তু নিজেদের ভাগ্য আজ অবধি নির্মাণ করতে পারেনি। আরবদের তেলের দাম নির্ধারণ করে দেয় পাশ্চাত্য, তাদের পুঁজি পাশ্চাত্যের বাজারে বিনিয়োগ হয়। তাদের দেখভাল করার দায়িত্বও অনেকটা পাশ্চাত্যের। নিজেরাই জানে না নিজেদের কল্যাণ কিসে হবে। পোস্টমডার্ন ঔপনিবেশিকতা মুসলিম-বিশ্বকে প্রায় দাসে পরিণত করতে চলেছে। ভদ্রলোকরা, উচ্চবিত্তশ্রেণী সেই দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় ঔপনিবেশিক যুগের মতোই আজও সহযোগী, কলাবরেটর।

মুসলিম আধুনিকতা ঃ উত্তর আধুনিকতা

আধুনিকতার মানব কল্যাণের দিকটি নিয়ে এক সময় জেমস জয়েস ও ডি.এইচ. লরেন্সের মতো লেখকরা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। আধুনিকতার বিপদ ও দুর্দশার কথা চিন্তা করে টি.এস.এলিয়ট লিখেছিলেন ওয়েস্ট ল্যান্ড-অসার জমি। চ্যাপলিন তার Modern Times-এ আধুনিকতা বলতে বুঝেছিলেন শিল্পায়ন, একই সাথে মানবতার অবমূল্যায়ন তা সে রুজভেল্টের আমেরিকা হোক কিংবা স্ট্যালিনের রাশিয়া। আধুনিকতার মধ্যে 'প্রগতিশীল', 'বৈজ্ঞানিক', 'যুক্তিবাদী' সব কিছু উপাদানই বর্তমান, যা নেই তা হলো ধর্ম। বড় জোর ধর্মকে ক্রিসমাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য থেকে জাত এই আধুনিকতার সাথে একজন তৌহীদবাদী মুসলমান, যার সাংস্কৃতিক চেতনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ধরন এক পবিত্র গ্রন্থের আদেশ ও নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিভাবে আপোষরফা করতে পারেন? অথবা আধুনিকতা যার অন্যতম উপাদান ধর্মনিরপেক্ষতা, তাকি একজন বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে নির্দ্বিধায় আত্মস্থ করে নেওয়া সম্ভব? পাশ্চাত্য মিডিয়া ইসলামের এই অনড়, অটল অবস্থানের কারণেই মুসলমানদের বলছে Inflexible অথবা Not consistent with Modern age। কিন্তু এটা হচ্ছে একটা বিশ্বাসের ধরন, পাশ্চাত্যের মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী ও নীতি-নির্ধারকবৃন্দ মুসলমানদের এই অবস্থানকে বুঝতে পুরোপুরি অসমর্থ। পাশ্চাত্য তার প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের জোরে যা বলছে তাকি সকলের পক্ষে কবুল করা সম্ভব? ইসলাম ধর্ম হিসেবে আপোষহীন এবং তার বুনিয়াদী বিশ্বাসের ব্যাপারে এক চুল ছাড় দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য বড় ধর্মগুলো কালান্তরে Materialistic অথবা Secularized হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যে ধর্মের স্থান খাটো করে দেয়া হয়েছে, এটি আজ কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ বলা যায়। রাষ্ট্র বা গণজীবনে ধর্মের

www.pathagar.com

প্রবেশাধিকার তেমন নেই। একজন খ্রিস্টান সেকুলার হওয়ার পরও খ্রিস্টান থাকতে পারেন। একজন হিন্দু কমিউনিস্ট পার্টি করবার পরও তার হিন্দুত্ব চলে যাবার ভয় নেই, কিন্তু একজন মুসলমান সেকুলার হওয়ার পর মুসলমান দাবি করবেন এ ব্যবস্থা অকল্পনীয়। সুতরাং এটা আগে বোঝা চাই পাশ্চাত্যে আধুনিকতার অভিজ্ঞতা মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। স্বাভাবিক কারণে পাশ্চাত্য যখন তার অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, মুসলমানরা তার Counter response করছে। এই response-কেই পাশ্চাত্য মিডিয়া বলছে কখনো Intolerance, কখনো Fundamentalism। পাশ্চাত্য থেকে জাত আধুনিকতার স্বরূপ পুরোপুরি বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে একবার মুখ ঘুরানো চাই। আমরা আগেই জেনেছি আধুনিকতা মুসলিম দুনিয়ায় এসেছিল সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে চেপে এবং এই আধুনিকতা পুরো মুসলিম দুনিয়াকেই এক ঔপনিবেশিক পঙ্গুত্বে বেধে দিয়েছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশগুলো থেকে একে একে বিদায় নিতে বাধ্য হলেও তারা এসব সমাজে স্থায়ী কিছু প্রভাব রেখে যায়। পাশ্চাত্য থেকে জাত এ সমস্ত উপাদান ও নিয়ামকগুলো একালের পশ্চিমের আগ্রাসী সভ্যতার দাপটে মুসলিম সমাজে এখনো টিকে আছে। মুসলিম সমাজে উত্তর আধুনিক প্রতিক্রিয়া বুঝতে হলে এই রূপান্তরগুলো আমাদের নজরে আনা চাই। পাশ্চাত্যে উত্তর আধুনিকতা, আধুনিকতার সংকট থেকে বাঁচবার চেষ্টা হলেও মুসলিম দেশগুলোতে উত্তর আধুনিকতা দীর্ঘ ঔপনিবেশিকতার সংকট থেকে জাত এবং সেই সংকট থেকে ত্রাণ পাবার চেষ্টাও বটে। যারা পশ্চিমের উত্তর আধুনিক অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের ঔপনিবেশিকতা জাত সংকটকে মোকাবেলা করার কথা ভাবেন তারা আসলে এখানকার সংকটকে অধিকতর জটিল ও অসমাধানযোগ্য করে তুলছেন।

সাম্রাজ্যবাদ শুধু মুসলিম দুনিয়ার সম্পদ লুণ্ঠন করেনি, আমাদেরকে এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক গোলামীর মধ্যেও ঠেলে দিয়েছে। আমরা লর্ড থমাস বেবিংটন মেকলের কথা মনে করতে পারি। সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা সংস্কৃতি এদেশে ভালোরকম করে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেবার প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছিলেন তিনি। তার উদ্দেশ্যের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। তিনি এদেশে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.

সন্দেহ নেই এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের দূরদর্শী চিন্তার ফসল। তারপর থেকে যারা যতবেশি করে English হয়েছে তারা তত বেশি নিজের জনগণ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এইভাবে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা ও ভাবমূর্তি তৈরি করতে সফল হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ। আমরা

www.pathagar.com

যারা জন্মসূত্রে মুসলমানের ঘরে জন্মেছি তাদের অনেকেই হয়তো লজ্জাবোধ করি এই কারণে। যারা অত হীনমন্যতায় ভুগিনা অথচ নিজেদের সভ্য ও আলোকিত বোধ করি তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করি ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ কারণে পশ্চিমী সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী রূপের বিরুদ্ধে ইসলামের রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে আমাদের বড় ভয়। ইসলাম যেহেতু মৌলিক কারণেই পশ্চিমী সভ্যতা বা সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বিরোধিতা করে তাই আমরা পশ্চিম মনস্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পশ্চিমের সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামের একটা সুশীল ব্যাখ্যা খাড়া করি। ইসলাম অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা বলে, মুসতাদআফীন-নিপীড়িতের পক্ষে লড়াইয়ের ডাক দেয়, ইসলামের এই বিপ্লবী চেহারা আমরা মানতে রাজি নই। পাশ্চাত্য আমাদের কি পরিমাণ মোনাফেকীর মধ্যে ঠেলে দিয়েছে লক্ষ্য করুন। প্রগতিশীলতা, উদারনৈতিকতা প্রমাণ করার জন্য আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু ধর্ম সংস্কারক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপর সিরিজ বক্তৃতা দিতে রাজি, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় আপত্তি নেই, এমনকি খ্রিস্টবাদ ইহুদীবাদও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কিন্তু ইসলামের প্রশ্ন এলেই আমাদের যত আপত্তি। ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে পাশ্চাত্য এই মনোভাবটাই গড়ে তুলেছে– ইসলাম সভ্যতার শত্রু, উন্নতির বাধক। আমাদের মধ্যে যারা পশ্চিম মনস্ক তারাও এ তত্ত্ব এখন অবলীলায় মেনে নিয়েছি। এটাকে আমরা কি বলতে পারি- Macaulay Syndrome?

সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব দুটি ক্ষেত্রে এখনও আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি ঃ রাজনীতি ও সংস্কৃতি। অনেক আগেই আমরা ব্রিটিশ আইন গ্রহণ করেছি, কোন কোন ক্ষেত্রে সুইস কিংবা ফরাসী আইনেরও প্রচলন হয়েছে। দেশী মক্তবের জায়গায় বিদেশী মিশনারী কিংবা ইংরেজী স্কুল বলতে আমরা এখন আত্মহারা। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা অনেক ক্ষেত্রেই চিন্তা ও লেখনীর ব্যাপারে ইংরেজীকে আদর্শ স্থানীয় মনে করেন। এমনকি তাদের রাজনৈতিক প্রেরণাও আসে Westminster থেকে। এখনও আমাদের এখানে যারা চোস্ত ইংরেজী বলতে পারেন, ইংরেজী কায়দায় স্যুট পরেন, টাইয়ের নটটি ঠিকমতো হলো কিনা তা নিয়ে অনাবশ্যক পীড়াপীড়ি করেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেন কিংবা সময় পেলে ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করেন তারাই রুচিবান, সংস্কৃতিমনস্ক ও আধুনিক। এর সাথে যদি ভদ্রলোকের কাছে শেক্সপিয়ারের একখণ্ড রচনাবলী কিংবা অরওয়েল ও পি.জি. উডহাউসের গল্পসমগ্র থাকে এবং প্রয়োজনে ইভিনিং টি বা এ্যালকোহলে গলা ভিজিয়ে নিতে পারেন তাহলেতো বাজীমাৎ। আধুনিকতার এই স্কেলটি কিন্তু সাম্রাজ্যবাদই আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে এবং এই স্কেল অনুযায়ী সাদাদের কাছে এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কালো চামড়ার নীচে আমরাও আসলে ইংলিশ।

www.pathagar.com

নিজের সংস্কৃতির শিকড় উপড়ে ফেলার এরকম একটা হিমধরা বর্ণনা দিয়েছেন কুখ্যাত সালমান রুশদী ঃ

In common with many Bombay-raised middle-class children of my generation, I grew up with an intimate knowledge of, and even sense of friendship with, a certain kind of England. (Imaginary Homelands)

Macaulay Syndrome-এর লক্ষণগুলো কি করে একে একে ফুটে উঠছে লক্ষ্য করুন ঃ God, Satan, Paradise and Hell all vanished one day in my fifteenth year, when I quite abruptly lost my faith. I recall it vividly. I was at school in England by then. The moment of awakening happened, infact, during a Latin lesson, and afterwards, to prove my new-found atheism, I bought myself a rather tasteless ham sandwich, and so partook for the first time of the forbidden flesh of the swine. No thunderbolt arrived to strike me down. I remember feeling that my survival confirmed the correctness of my new position. I did slightly regret the loss of Paradise, though. (সুত্র : পূর্বোক্ত)

এরি নাম কি উত্তর আধুনিকতা? সত্যিকার অর্থে এ হচ্ছে উত্তর আধুনিক ঔপনিবেশিকতা। পুরো মুসলিম দুনিয়ায় আজ চলছে Macaulay Syndrome এর উৎপাত। মগজ ধোলাই হয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের। এ মুসলমান পাশ্চাত্যের আধিপত্যের সামনে কি করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে? মুসলমানের সংকট আজ বিশ্বাসের সংকট, ঈমানের সংকট। এই সংকট থেকে ত্রাণ পেতে হলে তাদেরকে আজ Macaulay Syndrome এর বাইরে আসতে হবে এবং সেটাই হবে তখন মুসলমানদের সত্যিকারের উত্তর আধুনিকতা। এই সংকটকালে মুসলমানকে তার ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে, তার গৌরবকে আশ্রয় করতে হলে তাকে ইসলামের কাছে ফিরে আসা প্রয়োজন। ইকবালের ভাষায় ঃ In times of crisis in their history it is not Muslims that saved Islam, on the contrary, it is Islam that saved Muslims. আর এ ভাবেই সংকট মুক্তি সম্ভব।

পাশ্চাত্যের হুমকী ঃ নতুন ক্রুসেড

মুসলমান সভ্যতা কোন ফেলনা সভ্যতা নয়। এক তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেই মুসলমান সভ্যতা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে এমন ভাবা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। সভ্যতা হিসেবে এটি ইমাম গাজ্জালী, ইবনে সিনার মত দার্শনিক, রুমীর মতো সাধক, ইবনে খালদুনের মতো বুদ্ধিজীবী এবং তাজমহলের মতো স্থাপত্য তৈরি করেছে। তা সত্ত্বেও একালে পশ্চিমা মিডিয়ার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও দুরবিস্তারী

www.pathagar.com

প্রভাবকে মুসলমানরা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। মিডিয়ার শক্তি ও আক্রমণাত্মক চরিত্র বিশেষ করে ইসলাম বৈরী ভূমিকার সামনে মুসলমানদের মনে হচ্ছে একান্তই অসহায়। মুসলমানরা তাদের নিজেদের অবস্থান ও বাস্তবতাকে প্রকৃত অর্থে সবার সামনে তুলে ধরতে পারছে না। এখনকার সময়ে মুসলমানদের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে টেলিভিশন ইমেজ, সংবাদপত্রের শত্রুতাভাবাপন্ন রিপোর্ট ও তাদের চরিত্রকে নিয়ে তৈরী নিষ্ঠুর সব কৌতুকের মাধ্যমে। মোট কথা মিডিয়ার জগতে মুসলমানদের কোন জায়গা নেই, স্থান নেই; তাদের কথা ব্যাখ্যা করার মতো কোন সুযোগ নেই।

মুসলিম সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রকাশভঙ্গীকে ধর্মান্ধতা বলে বাতিল করা হচ্ছে, মুসলমানের ন্যায্য দাবীকে মৌলবাদ হিসেবে চালানো হচ্ছে। মিডিয়া যুদ্ধে মুসলমানরা একরকম পরাজিত হয়ে গেছে বললে ভুল হবে না। ঐতিহাসিক কাল থেকে ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের দুটো বিষয়কে নিয়ে বড় বেশি হৈ চৈ করেছেন। তার প্রভাব আজকাল মিডিয়াতেও দৃশ্যমান। একটা হচ্ছে মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নারীদের দূরবস্থা। মিডিয়া এখন সহজেই মুসলমানদের নিয়ে একটি স্টিরিও টাইপ (Steriotype) তৈরী করে নিয়েছে মুসলমান মানেই হয় কোন উত্তেজিত জনতা কোন বিদেশী পতাকায় অগ্নি সংযোগ করছে অথবা কোন দূতাবাস আক্রমণ করতে যাচ্ছে না হয় হিজাব পরিহিত কোন মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষার কোশেশ করছে। মুসলমানদের নিয়ে খ্রিস্টান দুনিয়ার এই নেগেটিভ ইমেজ তৈরির ব্যাপারটা ঐতিহাসিককাল ধরেই চলছে। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন তার বিখ্যাত বই The Decline and Fall of the Roman Empire এ আলেক্সান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার নিয়ে যে কল্পগন্ধী গল্পের অবতারণা করেছেন তাই বলে দেয় খ্রিস্টান ও মুসলিম দুনিয়ার সম্পর্কের ধরন। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলিম বাহিনী যখন আলেক্সান্দ্রিয়ায় পৌঁছে তখন সেখানকার বৃহদাকার গ্রন্থাগারের ভবিষ্যত নিয়ে খলিফার মতামত জানতে চাওয়া হয়। খলিফা উত্তরে জানান ঃ If the books are in accordance with the Quran, they are unnecessary and may be destroyed; if they contradict the Quran, they are dangerous and should certainly be destroyed.

গিবন নিজেই এ গল্পের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু এটি আমাদের ধারণা দিতে সাহায্য করে ঐতিহাসিককাল থেকেই অমুসলিমরা মুসলমানদের কিভাবে দেখেছে এবং এটাও বলে দেয় মুসলমানরা, অন্যরা কিভাবে তাদের দেখে তা বুঝতে যথাযথভাবে সমর্থ হয়নি। আর এ কারণেই টিভি পর্দার ছবি, সংবাদপত্রে মুসলমানদের খবর, লিবিয়ান কর্তৃক লন্ডনে মহিলা পুলিশকে হত্যা, ফিলিস্তিনী কর্তৃক যাত্রীবাহী বিমান অপহরণ, ইরানীদের দ্বারা বিদেশী দূতাবাস ঘেরাও, ইন্দোনেশিয়ান কর্তৃক বালি দ্বীপে হামলা অথবা জাভার

www.pathagar.com

বোরোবোদুর মন্দির উড়িয়ে দেয়া এসব মিলিয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আজ মুসলমানের ইমেজ গড়ে উঠেছে বা গড়ে তোলা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের দালাল লেখক ভিএস নাইপল মুসলমানদের এ ইমেজকে কটাক্ষ করে লিখেছেন ঃ Rage was what I saw.... Muslims crazed by their confused faith. (Among the Believers : An Islamic Journey....) পাশ্চাত্যের কাছে মুসলমানের এ ইমেজ ঐতিহাসিক কাল ধরেই চলছে। এ ইমেজ অপসারণ করা কি সহজ কথা? জনসন বলেছেন ঃ Prejudice not being founded on reason can not be removed by argument.

মুসলিম জগতের প্রতি খ্রীষ্টানদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ধারাবাহিকতায়ই আজকের বসনিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তানে হত্যাযজ্ঞ চলছে। বসনিয়ার হত্যাযজ্ঞ চলাকালীন সময়ে পশ্চিমা জগতের ভূমিকা দেখে মনে হয়েছে মুসলিম আন্দালুসিয়া থেকে মুসলিম জনগণের যেরূপ নিশ্চিহ্নকরণ সম্পন্ন হয়েছিল, তারই বুঝি পুনরাবৃত্তি চলছে। অথবা ক্রুসেডাররা যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের Frankish রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার সাথে যেভাবে বিংশ শতাব্দীতে ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে অথবা হালজামানায় ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যে রণপ্রস্তুতি চলছে তার কি কোন বিশেষ পার্থক্য আছে? আসলে এসব কিছুই মুসলিম বিদ্বেষের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা।

ইসলাম ঃ নতুন করে ভাবা

ওসামা বিন লাদেনকে কেউ কেউ ইসলামের চেগুয়েভারা বলেছেন। লাদেনের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন কোন সংবাদ ভাষ্যকার তাকে ইসলামের নিপীড়িত শ্রেণীর (মুস্তাদানাফীন) হিরো বলবার পক্ষপাতী। তাকে দেয়া এসব অভিধায় অনেকেরই মতান্তর থাকতে পারে, বিশেষ করে ইসলামকে নিয়ে পাশ্চাত্যের মিডিয়া স্টিরিও টাইপে যারা আমরা সহজে প্রভাবিত হয়ে পড়ি। লাদেনের চিন্তা-ভাবনা, সামরিক কৌশল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ধরনে অনেকে একমত না হতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কথাগুলো বলেছেন বিশেষ করে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমী আধিপত্যের বিস্তারের বিরুদ্ধে, আরো বিশেষ করে বললে প্যালেস্টাইন প্রশ্ন নিয়ে পশ্চিমী ভণ্ডামী, ভণ্ডামীর সংগে যুক্ত একের পর এক আগ্রাসন, বিভেদনীতির খেলা, ইরাক ঘিরে উপসাগরীয় যুদ্ধ, আরব তেলের উপর মৌরসীপাট্টা নিশ্চিত করতে আমেরিকা কর্তৃক আরব দুনিয়ায় শেখতন্ত্রের হেফাজত– এ সবের বিরুদ্ধে লাদেনের স্পষ্ট মতামতের মধ্যে যে সত্য আছে তাতো অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মুসলিম বিশ্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র নতুন কথা নয় এবং সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধের ইতিহাসও বেশ পুরনো। লাদেন সেক্ষেত্রে সাম্প্রতিক

www.pathagar.com

সংযোজন। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে ইসলামের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার অঙ্গীকার নিয়ে গত দেড়শ দুশ বছরে একের পর এক আন্দোলন, সংগঠন গড়ে উঠেছে। মাহ্‌দি সুদানির আন্দোলন, লিবিয়ায় সেনৌসীদের লড়াই, আলজেরিয়ায় আবদুল কাদেরের অভ্যুত্থান, ইজিপ্টে মুসলিম ব্রাদারহুড, ইরানে ফিদাইন ইসলামের লড়াই, আমাদের উপমহাদেশে সৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ, ১৮৫৭-র অভ্যুত্থান ও ওহাবী-ফরায়েজীদের রক্তরাঙা ইতিহাস এদের অন্যতম। দেড়শো-দুশো বছর আগে মুসলমানরা প্রকৃত অর্থে দুনিয়ার নানা রকম পালাবদল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। ফলে এসবের পরিণতির কথা তারা চিন্তা করতে পারেননি। কিন্তু একটা সময় এল যখন পশ্চিমের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের মোকাবেলা জরুরি হয়ে উঠল। এই পর্বেই ইসলামের বুদ্ধিজীবী, আলেম, রাজনীতিবিদ ও সমরনেতারা একটা সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্যে একমত হলেন। ইসলামের মূলে ফিরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা এলো। মুসলমানরা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে বলেই তাদের উপর নেমে এসেছে যত রকমের দুর্যোগ– সুতরাং পূণ্যবান পূর্বসূরীদের আদর্শ মেনে চলতে হবে এবং তা করতে পারলেই ইসলামের সোনালী যুগের রাজনৈতিক-সামরিক সাফল্য পাওয়া যাবে– এই ধারণা বদ্ধমূল হলো।

এখানে একটা জিনিস ভালভাবে বোঝা দরকার পূর্বসূরীদের আদর্শ অনুসরণ মানে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া নয়। অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ এতকাল নাক সিটকিয়ে এসেছেন এসব চিন্তাভাবনা নিতান্তই অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মোল্লা শ্রেণীর কাজ। কিন্তু এহেন পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে বদলে গেছে। আজকে যারা ইসলামে ফেরার কথাবার্তা বলছেন, তাদের অধিকাংশই আধুনিকতার সন্তান। এসব আধুনিকতাবাদীদের চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিজীবীতার সামনে রীতিমত মাথা হেট হয়ে আসে।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর পশ্চিমীরা প্রচার করেছিল ইরান বোধ হয় মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছে। যায়নি। বরং সেখানকার আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের পন্থাগুলো দেখলে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। আধুনিকতা মানে কি শুধু পশ্চিমী আধুনিকতা? ওরা পশ্চিমী সভ্যতার ছাপ মুছে দিয়ে, ইয়াঙ্কি সংস্কৃতির প্রভাবকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের মতো করে আধুনিকতার চেষ্টা করছে। ইরানে মেয়েরা নতুন নতুন অধিকার আদায় করে নিচ্ছে এটা কি মিথ্যে কথা? একটা মুক্ত সমাজ, স্বাধীন সমাজ ছাড়া এটা কি কল্পনা করা যায়? পশ্চিমী আধুনিকতার বাইরেও যে আধুনিকতা থাকতে পারে, ইরান কিছুটা হলেও তা দেখিয়ে দিয়েছে। ইসলামকে নিয়ে যারা আজকাল ভাবছেন, সেই সব পথিকৃৎজনেরা বুঝেছেন পশ্চিমের সাথে আজকের লড়াইটা ঠিক মধ্যযুগের ক্রুসেডের মতো হবে না। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকানোর চেষ্টা সফল হলেও

www.pathagar.com

সমস্যার তো সমাধান হচ্ছে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের আগে থেকে মুসলিম সমাজের পচন শুরু হয়েছে– পশ্চাধাবনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এই পিছু হঠার প্রক্রিয়া ঠেকানো যাবে না। আর বাস্তব সত্য হলো সেই প্রযুক্তির চাবি কাঠি এখনো সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই। এ কথা এসব বুদ্ধিজীবীরা ভাল করে বুঝতে পারেন। ইকবাল যেমন প্রশ্ন তুলেছিলেনঃ পূর্বের লোকেরা এবার কি করবেন? শুধুমাত্র দেখে যাবেন এবং যা হচ্ছে তা ভালোর জন্যই হচ্ছে, এমনটা ভেবে প্রবোধ দিতে থাকবেন? কিন্তু তাও যে অসম্ভব। কারণ ইসলামের বিরোধী শক্তি আজ বিশ্বজয়ী। তারা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। তাদের সামনে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না।

কিন্তু পশ্চিমীদের অনুকরণেও বিপদের আশংকা রয়েছে– এতে মুসলমানদের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে কি মুসলমানদের সংস্কৃতি, সভ্যতার অধপতন আটকাতে পশ্চিমী আধুনিকতার একাংশ গ্রহণ করতে হবে? এখন এই গ্রহণ-বর্জন, বাছ-বিচারের কাজটা কে করবে? কিসের ভিত্তিতেই বা তা করা হবে? আমরা কি আমাদের ধর্ম থেকে এর অনুপ্রেরণা নেব না সমসাময়িক বিজ্ঞান এর ভিত্তি যোগাবে? নাকি দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করতে হবে। এসব প্রশ্ন নিয়ে একালের মুসলিম বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতেরা বিস্তর ভেবেছেন।

ইকবাল ইসলামের পুরনো ব্যবস্থার সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন। এ লক্ষ্য নিয়ে তিনি রচনা করেন Reconstruction of Religious thought in Islam। সমসাময়িক ইসলামের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবক্তা তিনি, কারণ তিনি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতাবোধের কাঠামোটি নির্মাণ করেন এবং এই ধারার বিতর্কগুলোকে সমাধানে পৌঁছতে তার চেষ্টা ফলবতী হয়। ইকবালের আগে সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর মতো আধুনিকতাপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী শিবিরের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতারও মেলবন্ধন ঘটানোর কথা ভেবেছিলেন। তার শিষ্য মুফতী আবদুহু ও রশীদ রিদা মুসলিম জগতে সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের কথা ভেবেছিলেন। এর পরেই আসে ইরানের ডঃ আলী শরিয়তির নাম। ইকবালের ধারণাগুলোকে তিনি বিকশিত করেন এবং দেশোপযোগী ভাবে তিনি তার ব্যবহারের চেষ্টাও করে যান। তারই মতো ইসলামের সংস্কার চেষ্টাকে ধারালো করেছেন ইরানে আহমদ কাসরাভি, ইজিপ্টে হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, ডঃ ইউসুফ আল কারজাভি ও ডঃ হাসান হানাফি, মরক্কোর ডঃ জাবেরী, সুদানের ডঃ হাসান আল তুরাবি, আলজেরিয়ায় মালেক বেন্নাবী ও পাকিস্তানের সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, খুরশীদ আহমদ এবং এরকম আরও অনেকে। গত দেড়শ-দুশ বছর ধরে মুসলমানদের মধ্যে এই সব সংস্কার ও ভাঙ্গাগড়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

বর্তমানে মুসলিম দুনিয়ায় একটা ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি অর্জন করেছে। হান্টিংটন তার Clash of civilization বইতে লিখেছেন ঃ

যে কোনও বিপ্লবী আন্দোলনের মতোই এখানেও মূল সংগঠকরা হল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। অর্ধেকের বেশি এসেছে এলিট কলেজগুলি থেকে অথবা বিদ্যাবুদ্ধির সবচেয়ে দাবি যে সব জায়গায়, সেই কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্র থেকে। অনেকে আবার চিকিৎসাবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ছাত্র বা শিক্ষক। ৭০ শতাংশের বেশি হল মধ্যবিত্তের সন্তান। গরীব নয় অথচ স্বচ্ছলও নয়, এমন অনেক পরিবারের সন্তান যারা এই প্রজন্মেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেল- এমন লোকের সংখ্যাও ব্যাপক। এরা ছোটবেলায় মফস্বলে কাটালেও বড় হয়ে বিরাট শহরে পা রেখেছে। .....

সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং উচ্চশিক্ষিত তরুণেরা গোটা জনসংখ্যায় তাদের শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি আনুপাতিক হারে মৌলবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ফলে তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন শহুরে ছোট ব্যবসায়ী, সাধারণ চাকরিজীবি নিম্নবিত্ত মানুষ। তবে আর একটি বড় সামাজিক ভিত্তি তৈরি করেছেন গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসা ছিন্নমূল জনতা। বিপ্লবী ইসলামের আমজনতা হল আধুনিক সমাজের সন্তান। ইসলাম এদের একটি পরিচয় যুগিয়েছে।

পাশ্চাত্য মিডিয়া ইসলামের ভিতরকার এই সব চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বলেছে- Resurgent Islam- পুনরুদীয়মান ইসলাম। এই পুনরুদীয়মান ইসলামকে নিয়েই আজ পাশ্চাত্যের মাথা ব্যথা। কারণ পুনরুদীয়মান ইসলামের প্রবক্তারা পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধী। পাশ্চাত্যের বাইরে ইসলামকে আশ্রয় করেই তারা তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে ইচ্ছুক। মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সাথে পুনরুদীয়মান ইসলামের প্রবক্তাদের এটা একটা বড় তফাৎ। মুসলিম দেশগুলোর জাতীয় আন্দোলনের নেতা যেমন ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণো, আমাদের এখানকার জিন্নাহ, লিয়াকত, সোহরাওয়ার্দী, তিউনিসিয়ার বরগুইবা, আলজেরিয়ার বেলবেল্লাহ প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন সত্য কিন্তু এরা তাদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণাও পেয়েছেন পাশ্চাত্য থেকে। উল্টো পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সাথে এক ধরনের প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাদের।

মুসলিম দেশগুলোর সাধারণ জনগণ বিশেষ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে তাদের জাতীয় নেতাদের দেউলিয়া নেতৃত্বের কারণেও ইসলামের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সেকুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই পুনরুদীয়মান ইসলামের প্রবক্তাদের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টাসমূহ আমজনতার দৃষ্টি

www.pathagar.com

আকর্ষণ করেছে। এর সাথে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত সেকুলার নেতাদের আদপেই নেই। আর এ কারণেই পুরো আলমে ইসলামী জুড়ে ইসলামকে কেন্দ্র করে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে এবং সেই মেরুকরণের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কারণ তারা জানে এই মেরুকরণ সম্পন্ন হলে তাদের এতকালের ঠগীবৃত্তি আর টিকিয়ে রাখা যাবে না।

ইসলামের সমস্যা ও বাস্তবতা

পশ্চিমা জগত ও ইসলাম কি তাহলে একটা ভয়ংকর সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? ইহুদী পণ্ডিত স্যামুয়েল হান্টিংটনের Clash of civilization – সভ্যতার সংঘাত কি অনিবার্য বলেই এখন অনেকের কাছে মনে হচ্ছে? তা না হলে যে ধর্মের কথা হচ্ছে কল্যাণকামিতা, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা তাকে কেন এত তিরস্কার ও নিন্দার মুখোমুখি হতে হচ্ছে? মিডিয়ার বদৌলতে জিহাদ তো এখন এক নোংরা শব্দে পরিণত হয়েছে, যার অর্থ এসে দাঁড়িয়েছে একটি বর্বর সভ্যতার সন্ত্রাস হিসেবে। যদিও জিহাদের ধারণা অত্যন্ত উচু ও মহৎগুণাবলী সম্পন্ন। এ হচ্ছে আত্মবিকাশ ও আত্মউন্মেষের এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। অনেকটা টেনিসনের ভাষায় ঃ to strive, to seek and to yield।

ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বৈষম্যমূলক পূর্ব ধারণা পশ্চিমা জনমন দখল করে বসে আছে, সেগুলোকে ভাঙ্গার চেষ্টায় প্রচুর পরিশ্রমের দরকার, বিশেষত কেউ যদি আজ পাশ্চাত্য ও ইসলামের মাঝে একটা সেতুবন্ধনের স্বপ্ন দেখেন। এ লক্ষ্যে জার্মানীর নও মুসলিম, বুদ্ধিজীবী মুরাদ হফম্যান অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন যেখানে মুসলমানদের পরিবর্তন আনা দরকার বলে তিনি মনে করেন ঃ

১। শিক্ষা ও প্রযুক্তি, ২। নারী মুক্তি, ৩। মানবাধিকার, ৪। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির তত্ত্ব, ৫। যাদু ও সংস্কার ভিত্তিক কর্মকাণ্ড, ৬। যোগাযোগ।

বিশেষ করে এ কালে ইসলামী বুদ্ধিজীবিতার বেহাল অবস্থা দেখে হতাশ হতে হয়। এক সময় ছিল মুসলিম দেশগুলোতে শিক্ষিতের হার ছিল সবচেয়ে বেশি, আজ উল্টোটাই হয়েছে বাস্তবতা। একটা জাতি যার পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সূচনা হচ্ছে পড়, এই নির্দেশের মাধ্যমে তাদের নিরক্ষরতার দায়ভার তারা ধর্মের উপর চাপাতে পারবে না। মুরাদ হফম্যানের ভাষায় তাদের নিরক্ষরতা বরং একটা ধর্মনিরপেক্ষতা উদ্ভুত কেলেংকারী।

ঔপনিবেশিক আমলের মত একালেও মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিক্ষার জগতে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেড়শো-দুশো বছর আগে যখন মুসলিম দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ অনুপ্রবেশ করে তখন তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য বাচানোর জন্য জেহাদ করেছিল সত্য। তাদের দৃঢ়চিত্ততার প্রশংসা না করে উপায় নেই, কিন্তু ইউরোপীয় প্রযুক্তির সামনে শুধু তরবারি দিয়ে তারা টিকতে পারেনি।

www.pathagar.com

একালেও পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া একই রকম রয়ে গেছে। সালমান রুশদীর বই কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে, অথবা বড় জোর দুএকটা চোরাগুপ্তা হামলায় দুচারজন শ্বেতাঙ্গ হত্যার মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আগের মতোই পাশ্চাত্যের উন্নত প্রযুক্তি মুসলিম বিশ্বাসকে এসে আঘাত হানছে। এইভাবে পরস্পরকে বুঝতে অসমর্থ দুটি সভ্যতা একে অপরের মুখোমুখি চলে এসেছে। পাশ্চাত্যের দিক থেকে আছে ঔদ্ধত্য ও অশ্রদ্ধা, ইসলামের দিক থেকে আছে অন্ধ আবেগ ও উন্মাদনা।

এটা সত্য মুসলমানদের উপর অমুসলিম বিশেষ করে পাশ্চাত্যের জুলুম ও বেইনসাফী সবরকমের সহনীয়তার সীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের অবস্থানকেও কি নিরপরাধ বলা যায়? অনেক সময়ই মুসলমানরা যারা পাশ্চাত্যে বসবাস করেন তারা সেসব দেশের জনগণ ও নীতি নির্ধারকদের বর্ণবাদ দুষ্ট হিসেবে অভিযোগ করেন। কিন্তু তারা কি কখনো নিজ নিজ দেশের দিকে তাকিয়ে এসব কথা বলেন? শুধুমাত্র জাতিগত তফাতের কারণে সিন্ধুতে পাকিস্তানীরা কত কাল ধরে অন্য পাকিস্তানীদের হত্যা করেছে? গ্যাস ও বোমার আঘাতে বছরের পর বছর ধরে কুর্দীরা তাদের মুসলিম ভাইদের হাতে জর্জরিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আলজেরিয়া ও ইজিপ্টে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভিন্নতার কারণে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নেমে এসেছে স্যালভেশন ফ্রন্ট ও ইসলামিক ব্রাদারহুডের কর্মীদের উপর। বাংলাদেশে বিহারীরা বাঙালীদের মেরেছে, বাঙালীরা বিহারীদের মেরেছে। এখনও এখানে শরনার্থী ক্যাম্পে কয়েক লক্ষ বিহারী মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই যে মুসলমান, মুসলমানকে হত্যা করছে, মুসলমান, মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়ে চলেছে এগুলো সবই হয়েছে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে। ভাবা যায় এর মধ্যে ইসলামের কোন অনুমোদন থাকতে পারে? কখনোই না।

মুসলিম দেশগুলো এমনিতেই গরীব। যে কয়েকটি ধনী মুসলিম দেশ আছে, অফুরন্ত পেট্রো ডলার যাদের ভাগ্য খুলে দিয়েছে তাদের অবস্থা একটু দেখুন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হয় নজীর বিহীন অপরিকল্পনার মধ্যে খরচ হচ্ছে অথবা পাশ্চাত্যে বিনিয়োগ হচ্ছে। এমনও অভিযোগ রয়েছে লন্ডনের কলগার্ল, দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্যাসিনো, যুক্তরাষ্ট্রের Ranches (গবাদিপশুর ফার্ম) ও সুইজারল্যান্ডের Chalets (অবকাশের জন্য ব্যবহৃত স্বল্পস্থায়ী ঘরবাড়ী) গুলো এ অর্থের একটি বিপুল অংশ হাতিয়ে নিচ্ছে, যা কিনা গরীব মুসলমানদের স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যয় হতে পারতো। পেট্রো ডলার আরব দুনিয়ার কোন কোন মুসলমানের ভিতরে জন্ম দিয়েছে এক ধরনের ঔদ্ধত্য ও অহমিকার, যারা নিজেদের গোত্র ও পরিবারের ভাগ্য নির্মাণেই বেশি আগ্রহী। এই অনৈসলামী দৃষ্টান্তগুলোই এখন হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিদ্রূপের বিষয় যা একটা পুরো

www.pathagar.com

সভ্যতার জন্য লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় সাধারণ মুসলমানরা হয়ে পড়ছে আত্মকেন্দ্রিক, তারা এক পশ্চাদপসরণের কৌশল বেছে নিচ্ছে।

আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে পৌছে গেছি। এ শতাব্দীর প্রবেশ মাথায় দাঁড়িয়ে আমাদের ভাববার সময় এসেছে আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং ইসলামকে এ শতাব্দীর উপযোগী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের দুর্বলতাগুলো কিভাবে দূর করা যায়। শুধু পাশ্চাত্যের সমালোচনার মধ্যে ইসলাম অনুসারীদের এক ধরনের অসামর্থ্যেরই প্রমাণ মেলে। তাদের প্রতিবাদের ধরনগুলো দুর্বলের হাহাকার ও ক্ষমতাহীনতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা ইসলাম ও তার রসূলের শিক্ষার বিরোধী। আমাদের ভাল করে বোঝা চাই ভিতরের ময়লা সাফ না করতে পারলে বাইরে থেকে আপতিত আবর্জনার ঝড় ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

বিশ্বকে ইসলাম কি দিতে পারে

সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া লেখক ভি. এস. নাইপল লিখেছেন ইসলাম আধুনিক সভ্যতাকে কিছুই দিচ্ছে না, শুধুই নিচ্ছে। ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গভীর অনুগ্রাহী নাইপলের এ কথায় ইসলাম বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। যারা গভীরভাবে ধর্ম প্রাণ তারা নাইপলের এ কথায় ব্যথিত হবেন সন্দেহ নেই, যাদের ঈমান দুর্বল, তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এটা সত্য গত কয়েকশ বছর ধরে ইসলাম জগৎ সংসারের পরিচালকের আসন থেকে অপসারিত হয়েছে। জগতের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও কারিগরীতে তার ভূমিকা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে। এ অবস্থায় নাইপলের কথা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মেনে নেয়ার অনেক কারণই আছে, যদিও আমাদের জন্য তা হজম করা কষ্টকর। তাহলে কি ইসলামের জীবনীশক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ আলোচনায় আসার আগে এখন একটু পিছনে ফিরে যেতে চাই। আঠারশ শতকের জার্মান কবি গ্যয়টে তার ইসলাম অধ্যয়ন ও গবেষণার সারাৎসার বর্ণনা করেছেন কয়েকটি ছত্রে যার উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

How strange that in every special case
one praise ones own way!
If Islam means "Surrender in to Gods will"
it's in Islam that we all live and die.

গ্যয়টে যখন এসব কথা লিখেছিলেন তখন কিন্তু ইসলামের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ শুরু হয়ে গেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে অনুপ্রবেশ শুরু করেছে। এখনকার চেয়ে সেদিনের মুসলমানদের অবস্থা বরং খারাপই ছিল বলা চলে। তখন কি করে গ্যয়টে এ উক্তি করতে পারলেন? এমন কি তিনি সে সময় রসূল (স.) সম্পর্কেও এক দীর্ঘ প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছিলেন। গ্যয়টের ইসলাম অধ্যয়ন তাকে আশ্বস্ত করেছিল ইসলামের জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়নি বা তার

www.pathagar.com

অন্তর্গত সত্যের মধ্যেও কোন দুর্বলতা দেখা দেয়নি। যা হয়েছে তা হলো ইসলাম অনুসারীদের মধ্যেই অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে। আকবর এস. আহমদের ভাষায় ঃ But most of these ills of Muslim society are self created. These are Muslim lapses, a sign of social decay, not Islamic features. (Post Modernism and Islam)

এখন তাহলে বিশ্ব সভ্যতায় ইসলাম কি দিতে পারে সে আলোচনায় আসা যাক। পুঁজিবাদী বিশ্ব আজ তার অপরিসীম ভোগ লিপ্সার কারণে মানবজাতিকে এক সংকটাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ইসলাম দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ের কথা বলে– ইসলাম একই সঙ্গে একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা– ইসলাম দীন ওয়া দাওলা। একমাত্র এ পথেই পুঁজিবাদী ভোগ লিপ্সার বিরুদ্ধে একটা যুৎসই প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি সম্ভব। ইসলাম যেমন করে জাগতিক উন্নতির কথা বলেছে, তেমনি জাগতিক উন্নতি যাতে মানুষকে স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতার দিকে টেনে নিয়ে না যেতে পারে সেজন্য তাকওয়ার কথা এসেছে, আমলে সালেহর ধারণার কথা বলা হয়েছে। বস্তুবাদী সভ্যতার ভেতর থেকে যে ভয়ানক রকমের বিপর্যয় আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে তার থেকে ত্রাণ পেতে হলে ইসলামের এই বিশ্বজনীনতার ধারণার বিকল্প আজও আছে কি? ইসলামের চেয়ে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বাণী এ গ্রহে কে বেশি প্রচার করেছে, এবং এ বাণী জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য।

প্রাযুক্তিক উন্নতির ব্যাপারটি সাময়িক। ইসলামের সোনালী যুগে মুসলমানরা অসাধারণ প্রাযুক্তিক সাফল্য লাভ করেছিল বলেই তারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছিল। মুসলিম আন্দালুসিয়া, বাগদাদ, দামেশক প্রভৃতি ছিল প্রযুক্তির সূতিকাগার এবং এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান আর কারিগরিকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিল। পবিত্র কোরআনে আমাদের ইন্দ্রিয়কে উজ্জীবিত করবার জন্য বারবার বলা হয়েছে তোমরা কি দেখ না? কিংবা আকাশ ও পৃথিবীতে আছে তার সৃষ্টির নির্দশন। কোরআনের এই ডায়নামিক্সকে যখন মুসলমানরা ছেড়ে দিল তখনই এল তাদের বিপর্যয়। এ অবস্থাকে ঘুরিয়ে ধরতে মুসলমানদের ফিরে আসতে হবে মূলধারার কাছে। এই মূলধারাটাই হচ্ছে ইসলাম। ইকবালের ভাষায় বলি ঃ

কি মোহাম্মদ সে ওয়াফা তুনে তুহাম তেরি হ্যঁয়
ইয়ে জাহাঁ চিজ হ্যঁয় কিয়া লওহ ও কলম তেরি হ্যঁয়।
তুমি যদি হও মুহম্মদের প্রেমিক, আমিও তবে
তোমার প্রেমিক হবো,
দুনিয়াতো ছোট, লওহ কলম দেব আমি তোমাকেই;
চিরদিন আমি তোমার প্রেমিক রবো।

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিজম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিজম

এডওয়ার্ড সাঈদ ওরিয়েন্টালিজম বইটির জন্য খুব বেশি আলোচিত হয়েছেন। এ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে অতীতে আরো দু'একজন যে আলোচনা করেননি এমন নয়, সেদিক দিয়ে বইটির নতুনত্ব তেমন একটা নেই। কিন্তু যে জিনিসটা দেখবার মত তা হলো সাঈদের পুরো বিষয়বস্তুর উপর অধিকার ও বিবেচনাবোধ, তার অবাধ বর্ণনাভঙ্গি এবং সর্বোপরি তার যুক্তিগুলো তুলে ধরবার কৌশল, যা একেবারেই অনুপেক্ষণীয়।

সাঈদ তার বইতে সাম্রাজ্যবাদের মনস্তত্ব ধরে টান দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের সামরিক কিংবা রাজনৈতিক রণনীতি তার আলোচনার বিষয় নয়, সাম্রাজ্যবাদ শাসিতদের সাথে যে সাংস্কৃতিক অসূয়ার নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিল তাই হচ্ছে সাঈদের দেখবার বিষয়। এশিয়া ও আফ্রিকার বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ও রাজনৈতিক নীতির সমর্থনে সেকালে গড়ে উঠেছিল ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদের ধারণা। এর মূল কথা হচ্ছে শাসিতরা যেহেতু 'অসভ্য' ও 'অনুন্নত', তাদের সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের তুলনায় নিম্নমান সম্পন্ন সুতরাং কলোনির মানুষগুলোকে শাসন করবার নৈতিক ও প্রাকৃতিক অধিকার এই সব প্রভুদের রয়েছে। এই অবচেতন মানসিকতা যা বর্ণবাদের নামান্তর তাকে শক্তিশালী করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন, অনুমোদন ও উৎসাহে পুরো ইউরোপ জুড়ে আঠার আর ঊনিশ শতকে একদল শিল্পী, বুদ্ধিজীবি, লেখক ও দার্শনিক তৈরি হয়েছিল যাদেরকে বলা হয় ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদ। এই সব বিশেষজ্ঞরা শাসিতদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনাচরণ নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা শুরু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শাসিতদের সম্পর্কে পরিচিত হওয়া, তাদের সফলতা ও দুর্বলতার দিকগুলো অনুসন্ধান করা এবং তাকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। এ সব কাজ করতে যেয়ে প্রাচ্যবিদরা নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন অবশ্যই। শাসিতদের নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ ও নিবন্ধ লেখা হয়েছে, অসংখ্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও বিন্যাসের ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন। কিন্তু সাঈদ উল্লেখ করেছেন এই বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞের দল যেন একটি পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে গেছেন। যার ফলে তাদের দেখা প্রাচ্য একটা কৃত্রিম প্রাচ্য হয়ে উঠেছে, এর মধ্যে যেন সত্যিকার প্রাচ্য অনুপস্থিত। ওরিয়েন্টালিজম তাই হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের নীতি ও মূল্যবোধের আয়নায় দেখা প্রাচ্য, যেখানে প্রাচ্যের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব

www.pathagar.com

নেই। ওরিয়েন্টালিজমের সারথিরা প্রাচ্যকে নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণা কিংবা বিশ্লেষণ যাই করেছেন তা বরাবরের মত কিছু সংস্কার মাথায় নিয়ে করে গেছেন। সাঈদ এসব সংস্কারগুলোকে উদ্ধার করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন এসব সংস্কার থেকে মুক্তি সম্ভব হয়নি বলেই তারা প্রাচ্যের আস্থায় আসতে পারেননি। এ সব সংস্কারগুলো পূর্ব থেকেই তাদের মাথায় ছিল অথবা এ সব সংস্কারের মূল উপাদানগুলো ইউরোপীয়রা যুগ-যুগান্তর ধরে লালন করে আসছে, ওরিয়েন্টালিস্টরা যা কিনা সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করেছিল মাত্র। আমরা এখন এসব সংস্কারগুলোকে আলোচনা করে দেখতে চেষ্টা করব।

প্রথমটা হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক চূড়ান্ত ও পর্যায়ক্রমিক পার্থক্য বিবেচনা যার মূলকথা হচ্ছে পাশ্চাত্য অধিকতর যুক্তিবাদী, বিকশিত, মানবিক ও উন্নত অন্যদিকে প্রাচ্য হলো বিচ্যুত, অবিকশিত ও অনুন্নত।

এই একটি ব্যাপারে ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রাণপণে খেটেছেন কিভাবে পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্য বিশেষ করে আরব তথা মুসলমান সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানস আর জীবনবীক্ষাকে হেয় প্রতিপন্ন, নিম্নমান ও রুচি সম্পন্ন হিসেবে তুলে ধরা যায়। এ ব্যাপারে এসব সংস্কৃতি সেবীরা ম্যাকিয়াভেলীর নীতিকে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। আমরা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ লর্ড ক্রোমার ও আর্থার বালফুরকে উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। এ দুজনের শব্দ চয়ন রীতিমত লক্ষ্যভেদী ও উদ্দেশ্যমূলক। তারা বহুবার এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন The oriental is irrational, depraved (fallen), childlike, "different" অন্যদিকে European is rational, virtuous, mature, "normal."

এর মধ্যে তুলনামূলক সংস্কৃতির কোন আলোচনা ভাবা অবান্তর। সাঈদ এই মানসিকতাটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ওরিয়েন্টালিজমের বিকাশ ঘটেছিল ইউরোপীয়দের আধিপত্যবাদী মনোভাব থেকে। ওরিয়েন্টালিজমের 'ওরিয়েন্ট' তাই পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদীদের আবিষ্কার ও সৃষ্টি মাত্র। এখানে তাই পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কটা সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষিতের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বালফুর ও ক্রোমারের শব্দ চয়নগুলো প্রমাণ করে এখানে তারা শক্তিশালী এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে শোষিতদের সভ্যতা ও মানসপ্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র। C. Snouck Hurgronje তাই মনে করেন এই সাংস্কৃতিক অসমতার বড় কারণ হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে পারস্পরিক ক্ষমতার এক অসম সম্পর্ক। প্রাচ্যকে বুঝবার বিদ্যা ওরিয়েন্টালিজম এই অসমতাকে বৃদ্ধি করেছে, কেননা ওরিয়েন্টালিজমের জন্ম ক্ষমতার সম্পর্ক থেকে। এর ফলে হারগ্রঞ্জের ভাষায় European suzerainty over the East-প্রাচ্যের উপর ইউরোপীয় আধিপত্য বিস্তার কার্যকরভাবে সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

ক্ষমতার এই অসমতা হেতু ইউরোপের সাংস্কৃতিক বিবেচনাটাও হয়েছে অসম্বন্ধমূলক। প্রাচ্য বিশেষত ইসলামকে অসূয়া বিবেচনা করে এর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে (যা কিনা ওরিয়েন্টালিজমেরও মীথ তৈরি করেছে) সাঈদ প্রশ্ন করেছেন তাকি আসলেই প্রাচ্যের ছবি?

দ্বিতীয় সংস্কারটি হলো এরকমঃ ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রাচ্য সম্পর্কে গড়ে ওঠা এতদিনের মীথকেই নির্ভর করতে চান, প্রাচ্যের বর্তমান বাস্তবতা তাদের দেখবার বিষয় নয়। এই মীথটি কি! ইউরোপীয়রা এতকাল ধরে প্রাচ্যকে যেভাবে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আবিষ্কার করেছে এবং সেই সুদূর অতীত কাল থেকে একটি রোমাঞ্চ, কৌমার্য, তাড়িয়ে নেয়া স্মৃতি, মনোরম দৃশ্য ও অভিজ্ঞতার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে তার আলোকে প্রাচ্যের সবকিছুকে বিবেচনা করবার বিষয়টি। এই মীথের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপীয় শিল্পী ও লেখকরা প্রাচ্যের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন যা আসলে প্রাচ্যের ছবি না হয়ে ইউরোপীয় শিল্পীর মানস কাননজাত শিল্প কর্ম হয়ে উঠেছে। ফরাসী সাহিত্যিক ফ্লবেয়ারের দেয়া কায়রো বাজারের যে বর্ণনা সাঈদ উল্লেখ করেছেন তা মূলত ফ্লবেয়ার তার কালের সৃষ্ট মীথ থেকে তৈরি করেছেন।

এক শুধু ফ্লবেয়ার নয় রেনান, লেন, কজিন ডি. পারসিভাল, টুরগট, কনডরসেট, গুইজট, ল্যামারটিন, ব্লান্ট, লরেন্স, বেল, হোগার্থ, ফিলবি, সিকস, স্টরস প্রমুখ সবাই এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে গেছেন এবং সেটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে যথাযথ সেবা করা। এই বিপুল কবি, শিল্পী, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীর দল ইউরোপীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি এক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং প্রাচ্যকে নিয়ে ইউরোপের তৈরি মীথকে পৌনঃপৌনিকভাবে শক্তিশালী করবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রেনানকে উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। রেনান সেমিটিকদের ভাষা, শব্দ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। এই আলোচনা করতে যেয়ে তিনি সেমিটিকদের উপর রীতিমত একটি মীথ তৈরি করে ফেলেন যার মধ্যে কল্পনা ও সমকালীন বিশ্বাসের বাহুল্য থাকলেও সত্যের কাছাকাছি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রেনান এক জায়গায় লিখেছেন ঃ The Semites are rabid monothiests who produced no mythology, no art, no commerce, no civilization; their consciousness is a narrow and rigid one.

কি অদ্ভুত সাম্রাজ্যবাদী মীথ! সাঈদ লিখেছেন সেমিটিকদের নিয়ে এ কল্পনা মিশ্রিত অসত্য রেনান তার ভাষা গবেষণাগারে (philological laboratory) নির্মাণ করেছেন; যে নির্মাণ একদিকে অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানে বসে করা হয়েছে তেমনি একটি প্রভাববিস্তারকারী সভ্যতারও ইংগিত দিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিস্টদের লালিত তৃতীয় সংস্কার হলো প্রাচ্য মূলত চিরন্তন, সমতাপূর্ণ এবং নিজেকে উন্মোচন ও অবমুক্ত করতে অসমর্থ। সুতরাং পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একটি বিশেষ ভাষা প্রণালীর প্রয়োজন যা প্রাচ্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ওরিয়েন্টালিস্টরা তাই প্রাচ্যকে আগ বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করতে কোন সুযোগই হাতছাড়া করেননি এবং ভাষাহীন প্রাচ্যকে ভাষা দান করবার কাজে যথার্থ আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয়। 'ভাষাহীন' প্রাচ্যের পক্ষ হয়ে তারা যে কথা বলতে চেয়েছেন তা আসলে প্রাচ্যের কথা নয়, এতে সাম্রাজ্যবাদীদের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। 'ভাষাহীন' প্রাচ্যকে ভাষা দিতে ওরিয়েন্টালিস্টরা যেমন গলদঘর্ম হয়েছেন, 'অসভ্য' প্রাচ্যকে 'সভ্য' করার গুরুদায়িত্বও আগবাড়িয়ে তারা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এই 'মহান দায়িত্বকে' তারা বলেছেন 'Difficult civilizing mission', বর্ণবাদী কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং এর ভাষায় The White Men's Burden.

চতুর্থ সংস্কার হলো প্রাচ্য নামক পাত্রটির তলায় এমন কিছু আছে যা একদিকে ভয় করবার মতো যেমন হলুদ অভিশাপ (yellow peril), মঙ্গল দস্যুতা, বাদামী আধিপত্য অন্যদিকে তা শাসন করবার মতো (যা হতে পারে দুর্বল করার নীতি গ্রহণ করে কিংবা গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সামরিক আধিপত্যের মাধ্যমে যখন যেটা সম্ভব।)

এই অবচেতন মানসিকতা ও সংস্কার কোন রকম প্রতিরোধ ছাড়াই ওরিয়েন্টালিস্টদের মন-মস্তিষ্ককে বরাবর আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং আজও তা চলছে। ওরিয়েন্টালিস্টরা রীতিমত সিনডিকেট করে প্রাচ্য বিশেষ করে ইসলাম নিয়ে তাদের লেখাজোখা বিরতিহীনভাবে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। সেকালের রেনান, ম্যাক্স হ্যানিং, উইলিয়াম ম্যুর, ডি. লসেপস কিংবা একালের গুইলাম, গিব, বার্নাড লুইস সবাই যেন এই একটি ব্যাপারে একমত যে ইসলাম হচ্ছে সব পরিবর্তনের বিরোধী এবং একই কারণে প্রগতিরও পরিপন্থী। কারো কারো মধ্যে আবার আক্ষেপ ঝরে পড়েছে ইসলামের কি আধুনিকায়ন সম্ভব? এ প্রেক্ষিতে সাঈদ প্রশ্ন রেখেছেন আদর্শগত দিক দিয়ে ইসলামের যদি অনড়ই অবস্থান হয় তাহলে তার পরিবর্তনের জন্য এত লেখাজোখার কি দরকার; এর মধ্যে কি সাম্রাজ্যবাদী কোন খেয়াল লুকিয়ে নেই? সাঈদ যেমন আঠার আর ঊনিশশতকের ওরিয়েন্টালিস্টদের মানস চিত্র বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তেমনি হালজামানার ওরিয়েন্টালিস্টদের মনস্তত্বও বুঝে দেখতে চেয়েছেন। সেকালে ওরিয়েন্টালিস্টরা বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করেছে। বিশ্বশক্তি হিসেবে বৃটেন ও ফ্রান্সের স্থান পরিবর্তন হওয়ায় সে দায়িত্ব পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে ওরিয়েন্টালিস্টরাও তাদের কেবলার পরিবর্তন করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শক্তির ভরকেন্দ্র স্থানচ্যুৎ হলেও ওরিয়েন্টালিস্টদের কর্মসূচী বাধাগ্রস্ত হয়নি। সাঈদ

www.pathagar.com

দেখিয়েছেন নতুন পরিস্থিতিতে ওরিয়েন্টালিস্টরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য অবিকৃত রয়ে গেছে।

সাঈদ ফিলিস্তিনের মানুষ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছেন পাশ্চাত্যের প্রশ্রয় ও অনুমোদনে জায়নিস্টরা নিরপরাধ ফিলিস্তিনীদের উপর কি পরিমাণ জুলুম ও অবিচার করেছে এবং করছে। ওরিয়েন্টালিস্টরা এখন উঠে পড়ে লেগেছেন এই ফিলিস্তিনী তথা আরবদের একটা নেগেটিভ ভ্যালু বা ইমেজ তৈরি করবার কাজে। পাশ্চাত্য মিডিয়ার মতোই ওরিয়েন্টালিস্টরা এখন তুলে ধরছেন তাদের স্বকপোলকল্পিত কথা। আরবদের এখন দেখা হয় ইসরাইল ও পাশ্চাত্যের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে অথবা ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার প্রবল বিরোধী হিসেবে। ওরিয়েন্টালিস্টরা ইতোমধ্যে ইসরাইলের সমর্থনে একটা মীথও তৈরি করে ফেলেছেন। তাদের ভাষায় ফিলিস্তিন ছিল এমন একটা জনমানবশূন্য মরুভূমি যা মুক্তির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। এখানে যারা ছিল তারা মূলত যাযাবর, যাদের কোন জাতীয় ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই; সুতরাং এই ভূমির উপর তাদের দাবির কোন যথার্থতা নেই। এই মীথের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ঃ ফিলিস্তিনের উপর আরবদের দাবি অযৌক্তিক এবং সেখানে গায়ের জোরে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও কোন অন্যায় হয়নি। সাঈদ পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র ও টিভির ন্যাক্কারজনক ভূমিকার কথাও বলেছেন। এ সব মাধ্যমগুলো বিরতিহীনভাবে আরবদের চরিত্র হননের কাজটি করে চলেছে। এখানে আরবদের দেখানো হয় যত রকমের কুশ্রী, ষড়যন্ত্রী ও রক্তপিপাসু অসৎখুনী হিসেবে। চলচ্চিত্রের পর্দায় আরব মানেই কামুক ও অধঃপতিত একটি লোক, ধূর্ততা ও চক্রান্তে কুশলী আবার পাশবিক অন্যায় কর্মে লিপ্ত, অথবা দাস ব্যবসায়ী, উষ্ট্রচালক, অর্থ-চোরাচালানী এবং বর্ণাঢ্য এক দস্যু সর্দার, এই সব বিশেষণের বন্যার পাশে আবার তৈরি করা হয় 'জেহাদের' এক কাল্পনিক ভীতি। ভাবটা এমন আরব কিংবা মুসলমানরা পুরো পৃথিবীটাকে যেন জয় করে ফেলবে।

আগের মতোই এখনও ইসলাম ও আরবদের নিয়ে বই পত্র ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হচ্ছে। সাঈদ জানিয়েছেন মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর সময়ের ভয়ানক ইসলাম বিরোধিতার সেই ছবি বহাল তবিয়তে চলছে এবং এসব লেখালেখিতে তা দৃশ্যমান হয়ে ফুটে উঠেছে। আরব বিশেষ করে ইসলামকে হেয় করার এই কুশ্রী মানসিকতা অন্য যে কোন ধর্মের ক্ষেত্রে হলে কোন রকমেই তা এত অপ্রতিহত ও নির্বিরোধ গতিতে চলতে পারতো না। ওরিয়েন্টালিজম এখন অত্যন্ত কুশলতার সাথে একালের নব্য সাম্রাজ্যবাদের সংগে হাত মিলিয়ে ফেলেছে; যদিও দৃশ্যমানভাবে প্রচার করা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সাথে এর কোন সংশ্রব নেই। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটছে। সাঈদ এক জায়গায় লিখেছেন ঃ The Arab world today is an intellectual, political, and cultural satellite of

www.pathagar.com

the United States. সাঈদ এর প্রমাণস্বরূপ বলেছেন আরব তথা মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজও ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে পাওয়া কারিকুলাম অনুযায়ি চলছে। এর উপরে আছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা, গবেষণা ও দক্ষ জনশক্তির অভাব, আর্থিক দৈন্য ও রাজনৈতিক নিয়োগ। এসব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে যা শিক্ষার্থীদের করে তুলছে Orientalized, অন্য কথায় প্রাচ্যের ছাত্রদের Orientalism-এর মানস ও মনোবীক্ষা গ্রাস করে ফেলছে।

অন্যদিকে কিছু কিছু প্রাচ্যের বিশেষত মুসলিম ছাত্র নিজস্ব প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যের উন্নত প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এবং পাশ্চাত্য প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রে এই হিতৈষণা ও অনুগ্রহটুকু এখনও দিয়ে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞান আর গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দেউলিয়াপনার পাশাপাশি পাশ্চাত্য নির্ভরতা। কোন মুসলিম বুদ্ধিজীবী আজ অস্বীকার করতে পারবেন না জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব ও আধিপত্য। সেক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়ার অবস্থান আদৌ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। কোন উন্নতমানের গবেষণা, প্রকাশনা কিংবা ধীমান জনশক্তি মুসলিম দুনিয়ায় একেবারে নেই বললেই চলে। এভাবে মুসলমানরা অবচেতনভাবে পাশ্চাত্যের প্রভুত্ববরণ করে চলেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে গমনকারী শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের ওরিয়েন্টালিস্টদের পায়ের কাছে বসে যে দীক্ষা নিচ্ছে তাই দেশে ফিরে পুনরাবৃত্তি করছে এবং এভাবে ওরিয়েন্টালিজমের ডগমা বিকশিত হচ্ছে। সাঈদ মনে করেন এভাবে চক্রাকারে ওরিয়েন্টালিজম আরব তথা মুসলিম জগতকেও প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। মুসলিম জগতের ভিতর থেকেই ওরিয়েন্টালাইজড এলিটরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ দেখাশোনা করতে শুরু করেছেন। সাঈদ মনে করেন প্রাচ্য বিশেষত মুসলিম দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব ও উপনিবেশ এভাবে সুরক্ষিত হয়ে গেছে এবং আরব তথা মুসলিম বিশ্ব শুধু পণ্য সামগ্রীই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আদর্শও কিনতে শুরু করেছে।

সাঈদের এই বিশ্লেষণ অভূতপূর্ব; বিশেষত একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় পৌঁছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন নতুন মাত্রা পেয়েছে এবং মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন সাঈদের ওরিয়েন্টালিজমের প্রাসঙ্গিকতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিজমের ভিন্ন পাঠ

এডওয়ার্ড সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজম বইতে সাম্রাজ্যবাদের এক হাত নিয়েছেন। সাঈদের কথা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ যদি শাসিতদের সম্পর্কে কিছু জানতে চায় তবে সেটা তাদের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের জন্যই। তাদের কাছে জ্ঞানের কোন স্বাধীন অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য নেই, বরং জানার প্রক্রিয়া থেকে যে ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হয় তা অন্য একটি জনগোষ্ঠীর উপর বলপ্রয়োগ, শাসন-শোষণ করবার জন্য তারা ব্যবহার করে।

সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামকে ভয়ানক ও বিপজ্জনক হিসেবে দেখে। ইসলামকে এভাবে দেখা ও বর্ণনার মধ্যে সাঈদ মনে করেন মুসলিম দেশগুলোর উপর খবরদারী, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হামলা ও যুদ্ধ পরিচালনায় ওদের ভয়ানক রকমের অভিসন্ধি কাজ করে। মোটকথা ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যা হচ্ছে প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের বিদ্যা। সাঈদের এ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। ওরিয়েন্টালিজম যে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার সমান্তরাল একটা জিনিস এ কথা সাঈদই জোরেসোরে বলেছেন এবং তার লেখালেখির কারণেই ওরিয়েন্টালিজমের বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উদোম হয়ে গেছে। আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে সাঈদের এ অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এডওয়ার্ড সাঈদ এক জায়গায় লিখেছেন ঃ For the many reasons I have enumerated earlier in this book and in Orientalism, Knowledge of Islam and of Islamic peoples has generally proceeded not only from dominance and confrontation but also from cultural antipathy. Today Islam is defined negatively as that with which the West is radically at odds, and this tension establishes a framework radically limiting knowledge of Islam ... ... most of what the West knew about the non-Western world it knew in the frame work of colonialism; the European scholar therefore approached his subject from a general position of dominance, and what he said about this subject was said with little reference to what anyone but other European scholars had said. (Covering Islam)

সাঈদের এসব লেখার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রাচ্যবিদরা একসময় শুধুমাত্র ইসলাম ও তার নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কলম তুলে নিয়েছিলেন, এ কথা অনেকাংশে সত্য। শুধু তাই নয় এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বিরোধ ও অসূয়া তাড়িত হয়ে

www.pathagar.com

তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে উজ্জীবিত হয়েছিলেন, তাও ভুলে যাওয়ার নয়। এ্যাব টডারিণী (abbe Toderini), ব্যুলেন ভিলার (Boulain Viller), সিলভেস্ত্রে ডি সেচি (Sylvestre de Sacy), এডওয়ার্ড লেন (Edward Lane), গোবিনিউ (Gobineau), রেনান (Renan), স্যার উইলিয়াম ম্যুর (Sir William Muir), স্প্রেঙ্গার (Sprenger), প্রমুখ প্রাচ্যবিদের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কথা এখন প্রায় সুবিদিত। অনেক ক্ষেত্রে এরা সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয় পেয়েছেন, বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে এদের পৃষ্ঠপোষণা করা হয়েছে। ওরিয়েন্টালিজম বইয়ে সাঈদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষণ-শাসন-নিয়ন্ত্রণের যে অভিযোগ করেছেন এদের লেখালেখি তা প্রমাণ করবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সাঈদের ওরিয়েন্টালিজমের সাথে সাম্রাজ্যবাদকে সমান্তরাল বা সমার্থক হিসেবে দেখানোর মধ্যে একটা গুরুতর ফাঁকও রয়েছে। ওরিয়েন্টালিজম খারাপ জিনিস এটা সত্য, কিন্তু এর পুরোটাই কি বর্জনীয়? আমরা অনেক প্রাচ্যবিদের কথা বলতে পারি যাদের জীবনব্যাপী সাধনা, প্রাচ্যভাষার উপর অধিকার, বিশেষ করে মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিতদের অনেক হারিয়ে যাওয়া ও দুষ্প্রাপ্য রচনাবলীর পুনঃসন্ধান ও পুনঃসম্পাদনার ক্ষেত্রে তাদের অবদান কি ওরিয়েন্টালিজমের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের পুরোটা সমর্থন করে? এটা সত্য এদের কারো কারো ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়, এমনকি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের কথাও তাদের অবচেতন মনে কাজ করতে পারে, তারপরেও এদের কাছ থেকেই তো আমরা আলবেরুনী, ইবনে খালদুনের মূল্যবান লেখালেখির সন্ধান পেয়েছি, এরাই ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীর তরজমা করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছেন, এরাই আমাদের ঘরের কাছের বাদশাহ্ বাবরের আত্মজীবনীকে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। প্রাচ্যবিদদের অবদান ছাড়া বিশ্বসভ্যতার এইসব মূল্যবান সম্পদ হয়তো একদিন হারিয়ে যেতো। এর মূল্য কি আমরা দেব না? প্রাচ্যবিদ কিংবা প্রাচ্যবিদ্যা মানেই সবসময় যে একটা ভয়ংকর ও কুশ্রী জিনিস এমন ভাবার কিছুই নেই। আমি অন্তত তিনজন প্রাচ্যবিদের কথা বলবো যাদের জীবনব্যাপী সাধনা নিমগ্ন হয়েছিল ইসলামকে কেন্দ্র করে। তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু ইসলামের মূল্যবোধকে কোন না কোনভাবে তারা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এদের দু'জন যুক্তরাজ্যের আর্থার জন আরবেরী (Arthur John Arberry) ও স্যার থমাস আর্নল্ড (Sir Thomas Arnold), অন্যজন হলেন জার্মানীর আনমারী শিমেল (Annemarie Schimmel)।

আর্থার জন আরবেরীর একটা বিখ্যাত কাজ হচ্ছে The Koran Interpreted– কুরআন শরীফের এটি একটি বিখ্যাত ইংরেজি তরজমা। এর মুখবন্ধের এক জায়গায় আরবেরী লিখেছেন ঃ This task was undertaken, not lightly, and carried to its conclusion at a time of great personal distress,

www.pathagar.com

through which it comforted and sustained the writer in a manner for which he will always be grateful. He therefore acknowledges his gratitude to whatever power or Power inspired the man and the prophet who first recited these scriptures. I pray that this interpretation, poor echo though it is of the glorious original, may instruct, please, and in some degree inspire those who read it.

এই অনুভূতিকে কি ইসলামের শত্রুর বা প্রতিপক্ষের বলা চলে?

স্যার থমাস আর্নল্ড বহুদিন আমাদের এই উপমহাদেশে ছিলেন। তিনি আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে শিক্ষকতা করতেন। ঘটনাচক্রে তিনি কবি ইকবালের অন্যতম শিক্ষক ও পরবর্তীতে গভীর বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। আর্নল্ড দেশে ফেরার সময় ইকবাল এত মর্মাহত হন যে তিনি তার উদ্দেশ্যে তার অন্যতম একটি বিখ্যাত শোকগাথা রচনা করেন। এই আর্নল্ডের একটি বিখ্যাত বই হচ্ছে The Preaching of Islam। এ বইতে তিনি বহু ঘটনা ও তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে এক সময় প্রাচ্যবিদরা যে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছেন 'এক হাতে কুরআন, অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইসলামের প্রসার' তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার নিজের কথা শোনা যাক ঃ

Islam was not spread, not by the exploits of that mythical personage– the Muslim warrior with the sword in one hand and the Quran in the other, but by the force of the teachings of the Quran and the character of the Prophet.

আর্নল্ডের এই বলার ভঙ্গি, নিজে প্রাচ্যবিদ হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণীর প্রাচ্যবিদদের ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে বর্ণবাদী প্রচার-প্রপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো তার শক্তিকে আমরা কখনোই খাটো করে দেখতে পারি না। সেই আঠারো-উনিশ শতকের মতো আজও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চলছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই ও সহিংসতাকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ সবের বিরুদ্ধে আজ কিন্তু Preaching of Islam জাতীয় কোন বই পুস্তক লেখা হচ্ছে না। এটাই প্রমাণ করে আর্নল্ডের মতো মানুষের প্রয়োজন তাই একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।

সবশেষে যার কথা বলবো তিনি হচ্ছেন আনমারী শিমেল। জার্মানীর এই পণ্ডিত মহিলা তো আমৃত্যু মুসলিম সুফী-দরবেশ আর ইসলামী তাসাউফের জগতে পরিভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি মুসলিম সুফীদের মতো চলাফেরা করতেন। এ জন্য অনেকে তাকে বলতেন পাশ্চাত্যের রাবেয়া বসরী। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা ও ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যের উপর তার অসাধারণ অধিকার, কুরআন শরীফের উপর তার বিপুল পাণ্ডিত্য বিশেষ করে রুমী ও ইকবালের কবিতার

www.pathagar.com

উপর তার বিশেষ ভক্তি ও ভালবাসা তাকে প্রাচ্যবিদদের জগতে এক বিশেষ অনন্যতা দিয়েছিল। বহুদিন পর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে দেয়া এক সংবর্ধনায় তিনি তার ইসলাম অনুরাগের কথা বলেছেন এভাবে ঃ ... When I was a little girl, I come to love your world– the world of Islam, the world of literature beginning with the poetry of Maulana Rumi ... and I was infatuated.

শিমেলের এই নির্ভেজাল অনুরাগের মধ্যে কোন বর্ণবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই। আজকের এই যুদ্ধমান পৃথিবীতে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতাগুলো পরস্পরের রক্তক্ষয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছে তখন শিমেলের মতো মানুষরা আন্তঃসভ্যতার মধ্যে এক নীরব যোগাযোগ, ভাব বিনিময় ও সেতু নির্মাণের চেষ্টা করে গেছেন।

আরবেরী, আর্নল্ড কিংবা শিমেল ছাড়াও পাশ্চাত্যে ইসলামের অনুগ্রাহী যথেষ্ট রয়েছেন। গ্যায়টে কিংবা বার্নাড শ'র ইসলাম প্রীতির কথা আমরা জানি। হাল আমলের মার্টিন লিঞ্জ, ক্যারেন আর্মস্ট্রংদের চিন্তা-ভাবনা আমাদের মনোজগতে টোকা দিতে সক্ষম। বিশেষ করে বার্নাড শ'র কথা বলতে হয় এই জন্য, ইসলামের নবীর সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক মন্তব্য বহু উচ্চারণে যা জীর্ণ হয়ে যায়নি, রসূল সম্পর্কে এটি তার গভীর মমতারই প্রতিধ্বনি। আজকের মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী প্রচার প্রপাগাণ্ডার বদৌলতে অনেক মুসলমানেরই বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছে। জন্মসূত্রে এরা মুসলমান হলেও, সাংস্কৃতিকভাবে এরা ইসলামকে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছেন এবং অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকেন। এই সব নামকাওয়াস্তে মুসলমানের চেয়ে শ', গ্যায়টে প্রমুখের স্থান কি অনেক উপরে নয়?

দুঃখের বিষয় হচ্ছে সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম পড়ে এদের কারো সম্পর্কেই কোন ধারণা পাওয়া যায় না। ওরিয়েন্টালিজমকে সাম্রাজ্যবাদ বা পাশ্চাত্যের সাথে সব সময় এক করে দেখার বিপদটা এখানেই। সাঈদ তার বইটি লিখেছেন একটি যুক্তিকে সামনে রেখে। সেই যুক্তির মূল্য যতই শক্ত হোক না কেন, সেটি ঘটনার পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠেনি, অর্ধ সত্য হয়ে গিয়েছে। ওরিয়েন্টালিজম পড়লে মনে হয় পুরো পাশ্চাত্যের মানুষ বোধ হয় একজোট হয়ে সাম্রাজ্যবাদী কোন অভিসন্ধিতে মিলিত হয়েছে। এটা সত্য সেখানকার পুঁজিবাদী ও কর্পোরেট ব্যবস্থা, সেখানকার কর্পোরেট নেতৃত্বের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ও অন্য জাতি-গোষ্ঠীকে দাবিয়ে রাখার ভয়ানক কৌশল, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এগুলো অবশ্যই বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণের পক্ষে একটা বড় বাধা। কিন্তু এটাও আমাদের মনে রাখা দরকার পশ্চিমের এই কুশ্রী চেহারার পাশে সেখানকার একটি মানবিক চেহারাও আছে। অনেক শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেখানে আছেন যারা এই কর্পোরেট

www.pathagar.com

নেতৃত্বের বিশ্বব্যাপী হানাহানি ও ধ্বংসের রাজনীতি পছন্দ করেন না। ইরাক যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি পশ্চিমের বহুশান্তিকামী মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে। ওরিয়েন্টালিজম পড়ে পাশ্চাত্যের যে ছবি আমাদের সামনে আভাসিত হয়ে ওঠে, সেখানে এইসব শান্তিকামী মানুষের স্থান কোথায়? এরা তো দুনিয়ার তাবৎ শান্তিকামী মানুষের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যারা বিবাদ-বিসম্বাদের বাইরে ভিন্ন একটি জগৎ তৈরি করতে চান।

আমাদের মনে রাখা দরকার শ', গ্যায়টের মতো ইসলাম বান্ধবের পাশাপাশি আমরা একালে পাশ্চাত্যে মারমাডিউক পিকথল, মোহাম্মদ আসাদের মতো মনীষার সন্ধান পেয়েছি, ইসলামী বুদ্ধিবাদের জগতে যাদের সৃষ্টিশীল অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। ফরাসী চিন্তাবিদ রোজার গারোদী, বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি, জার্মান কূটনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মুরাদ হফম্যান, ইংল্যান্ডের সংগীত শিল্পী ইউসুফ ইসলাম প্রমুখের লেখালেখি, পণ্ডিতী আলোচনা ও কায়কারবার একালে বিশ্বের দরবারে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এটা সত্য পশ্চিমেই সালমান রুশদী, তারিক আলী, তসলিমা নাসরিনদের মতো ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদরা আশ্রয় পেয়েছে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় এই পশ্চিমে বসে ইসমাইল রাজ আল ফারুকী, অধ্যাপক হামিদুল্লাহর মতো ধীমান বুদ্ধিজীবীরা একালে মুসলিম চিন্তার জগতকে ফলবান করে তুলেছেন। আরো বিশেষ ব্যাপার হলো পাশ্চাত্যে এখন প্রায় এক থেকে দু'কোটি মুসলমান বাস করেন ও অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ মানুষও সেখানে আছেন। ওরিয়েন্টালিজমে আমরা শুধু প্রতিপক্ষের ছবিই দেখি, এদের কথা শুনতে পাইনি। পাশ্চাত্যের কর্পোরেট ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে আমাদের মনে হতে পারে, পাশ্চাত্য মানেই বুশ, ব্লেয়ার, কিংবা সেকালের গ্লাডস্টোন, কুইন ভিকটোরিয়া, হিটলার বা মুসোলিনী। আসলে এটি প্রকৃত সত্য নয়।

ওরিয়েন্টালিজমে সাঈদ যে শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে আগুন ও উত্তাপ ছড়িয়েছেন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই ঃ West can know Islam in a demeaning and exploitative manner.

তার মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে সাথে সাথে ঃ Can the West ever hope to understand, objectively and sympathetically the other, that is, foreign cultures, alien peoples? না, সাঈদের যুক্তি সর্বাংশে মেনে নেয়া যায় না। কারণ পাশ্চাত্যে আজকের ইসলামের অবস্থানই বলে দেয় ওরিয়েন্টালিজমে চিত্রিত পৃথিবীর বাইরেও অন্য পৃথিবী আছে।

ওরিয়েন্টালিজমে সাঈদ পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিয়েছেন, একই যুক্তি দিয়েই তো আবার সাঈদকে অভিযুক্ত করা যায়? এখানে সাঈদ পশ্চিমকে দেখেছেন একজন ফিলিস্তিনী হিসেবে। আর প্রাচ্যবিদরা প্রাচ্যকে এঁকেছেন পশ্চিমের চোখে। হয়তো এই বিপরীত ও প্রান্তিক অবস্থানের কারণেই পৃথিবী

www.pathagar.com

আজো 'ওরা' ও 'আমরায়' ভাগ হয়ে আছে। রুডইয়ার্ড কিপলিংরা এ জন্য হয়তো লিখতে পেরেছেন Twain shall never meet. কিন্তু এই বিপরীত মেরুর মাঝখানে বসে আরবেরী, আর্নল্ড ও শিমেলরা যে নীরবে-নিভৃতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু বন্ধনের চেষ্টা করে গেছেন তা আমরা প্রায়শঃই ভুলে যাই।

ওরিয়েন্টালিজম বইটির কথা বলতে যেয়ে মনে পড়ছে স্যামুয়েল হান্টিংটনের Clash of Civilization-এর কথা। হান্টিংটনের এ বইও একটি প্রান্তিক অবস্থান থেকে লেখা এবং অবশ্যই পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে ইসলামকে হেয় করার সেখানকার বর্ণবাদীগোষ্ঠীর শেষতম সংযোজন। হান্টিংটনের চোখে এখন আগামী দিনের দ্বন্দ্বমান সভ্যতার ছবি, সেখানে পশ্চিম বনাম ইসলামের সংঘাতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি। এখানে হান্টিংটনের একচোখা বর্ণবাদী দৃষ্টি পরিষ্কার। বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে তিনি নিজেই একটি পক্ষের হয়ে লড়াই করেছেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অন্যান্য বিশেষ করে ইসলামের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর প্রমাণের জন্য ওকালতি করেছেন। সেটা করতে গিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন এক চালাকির পথ। সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব আসলে একটা চালাকির তত্ত্ব। সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব আছে ঠিক, কিন্তু সভ্যতায় সভ্যতায় যে নীরব দেয়া-নেয়া, কথোপকথন চলছে সেটিও তো মিথ্যে নয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের এ দিকটি হান্টিংটন সাহেবরা এড়িয়ে গেছেন, সেখানে তারা শুধু আমাদের সভ্যতার সঙ্গে ওদের সভ্যতার দ্বন্দ্ব ঘোষণা করেই আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সংস্কৃতির লেনদেন, বহুত্বের কথা ঝেড়ে-মুছে এর বদলে তারা একটি একমাত্রিক সংস্কৃতির অবয়ব খাড়া করতে চান, যার সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির সম্পর্ক বিরোধের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার।

হান্টিংটনের সাথে সাঈদের তুলনা চলে না কোনভাবেই। না বুদ্ধিজীবিতায়, না মানবিকতার বোধে। তারপরেও কেন যেন মনে হয় ওরিয়েন্টালিজমে সাঈদ কি পুরোপুরি আবেগহীন থাকতে পেরেছেন? কোথাও কি তার এক চোখের ছায়া পড়েনি?

সাঈদের ভয়ানক যুক্তি পশ্চিম কেবল ইসলামকে শোষণমূলক অবস্থান থেকে দেখে। এই মূল্যায়নকে সামনে রেখেই বলছি তারপরেও কিন্তু ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সীমান্ত পেরিয়ে বহু মানুষের যোগাযোগ, বন্ধুত্ব ও মানবীয় সম্পর্কের ভিত প্রস্তুত হয়েছে এবং এ সম্পর্ক পুরোপুরি সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। থমাস আর্নল্ডের সাথে ইকবালের, ওলাফ কেরুর সাথে ইসকেন্দার মীর্জার, ই.এম. ফরস্টারের সাথে রস মাসুদের এবং আমাদের সময়ের সলীম আলীর সাথে ডিলন রিপ্লে কিংবা র‍্যালফ রাসেলের সাথে খুরশীদ-উল-ইসলামের বন্ধুত্বের কথা আমরা জানি। সীমান্তের বাধা কিংবা জন্মের প্রেক্ষাপট অথবা ধর্মের পার্থক্য এদের বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে পারেনি। এই মানবীয় সম্পর্কটুকু এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি বলেই মানুষ আজো স্বপ্ন দেখে। ধ্বংস, রক্তপাত ও নরমেধযজ্ঞের মধ্যেও সে মুক্তির দিন গোণে।

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিজমের আগে

১

ওরিয়েন্টালিজমের ব্যাপারটা নিয়ে এখন অনেকেই ভাবছেন। সাম্রাজ্যবাদের চেহারা দিগম্বর করে দিতে পাশ্চাত্যের প্রথাগত চিন্তার ভিত নাড়িয়ে দেবার জন্য যারা এখন কাজ করছেন তাদের কাছে ওরিয়েন্টালিজম খুবই একটা প্রিয় বিষয়। আমাদের দেশে ওরিয়েন্টালিজম ব্যাপারটি নিয়ে একটা সংবেদনা সৃষ্টি হয়েছে, এ দেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যেও এখন এর একটি অনুরণন ক্ষীণ হলেও প্রতিভাত হয়ে উঠছে। এর একটা কারণ হয়তো বা সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার, নিবর্তনের শিকার যে আমরা হয়েছিলাম অবচেতনভাবে হলেও তা কাজ করছে। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সমাজদেহকে যে রকমভাবে দূষিত করেছে তা অন্য কোন কিছুতেই করতে পারেনি।

ওরিয়েন্টালিজমের মোদ্দা কথাটা কি? পাশ্চাত্য কিভাবে প্রাচ্যকে কল্পনা করে, আরো বিশেষ করে বললে ইসলাম ও মুসলমানকে নিয়ে কিভাবে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালায় তারই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ডিসকোর্স, বাংলায় এখন যাকে বলা হচ্ছে বয়ান। পাশ্চাত্য যেভাবে ইসলামকে দেখে ও বিচার-বিবেচনা করে, সেই দেখা ও বিচারবোধের মধ্যে অন্য জাতি, গোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলমানদের সম্পর্কে এক বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির তাড়নায় পাশ্চাত্য ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে দুশমনি করে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও মিডিয়া সব ফ্রন্টেই পাশ্চাত্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনা করে, ওরিয়েন্টালিজমের টেক্সট আমাদের কাছে নতুন করে সে কথাই তুলে ধরেছে। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে পুরোন দিনের পরিভাষা 'সাম্রাজ্যবাদ', 'ঔপনিবেশিকতা', 'বর্ণবাদ' প্রভৃতির অন্তর্গত মর্ম ও তাৎপর্যের সাথে ওরিয়েন্টালিজমের তেমন কোন তফাৎ নেই। শুধু নতুন কালের উপযোগী করে নতুন পরিভাষা 'ওরিয়েন্টালিজম' নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই মাত্রা প্রাপ্তির পিছনে স্বীকার করতেই হবে যার চেষ্টা ও প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি কামিয়াব হয়েছে তিনি হচ্ছেন এডওয়ার্ড সাঈদ এবং তার Orientalism বইটি এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। পাশ্চাত্যের সাহেব সুবোদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গভীর বিশ্লেষণ করে তিনি এর বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য কোন রকম রাখ ঢাক না করে পুরোপুরি খুলে ফেলেছেন এবং বলতে চেয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ ওদের মনস্তত্বের (Psyche) সাথে মিলে মিশে আছে।

www.pathagar.com

সাঈদের এই অসাধারণ ভূমিকার কথা মনে রেখেই বলছি তার বলার ধরনে নিশ্চয় এক ধরনের চমক আছে, কিন্তু নতুনত্ব আছে কি? সাম্রাজ্যবাদকে সামনে রেখে সাঈদ যে কথাটি বলতে চেয়েছেন সে ধরনের ভাষা ও ভঙ্গির ব্যবহার কি অতীতে আর কখনো হয়নি? এটা সত্য, এডওয়ার্ড সাঈদ কোন যা তা বুদ্ধিজীবী নন। প্রথাগত বুদ্ধিজীবীর মত তিনি কেবল সারাজীবন লেখালেখি করেননি। একদিকে যেমন তিনি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাপটের সঙ্গে পড়িয়েছেন, অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি বিশেষ করে এর ফিলিস্তিন নীতির তুখোড় সমালোচনা করেছেন। ফিলিস্তিনীদের রাজনীতি ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি আমৃত্যু শরীক ছিলেন। কিন্তু এ রকম বুদ্ধিজীবিতার নমুনা মুসলিম দুনিয়ায় একেবারে বিরল নয়। আমি এ রকম দু'জন মুসলিম বুদ্ধিজীবীর কথা বলবো, যারা জীবদ্দশায় ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের আতংক। এদের নাম খুবই পরিচিত। এদের বিপুল মনীষা ও উদ্যম যেমন একদিকে নিজ সমাজের অজ্ঞানতা, পাশ্চাদপদতা ও অধঃপতন রুখতে নিয়োজিত হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলমানকে নিশানা করে সাম্রাজ্যবাদের ভয়ানক নরমেধযজ্ঞ, ধ্বংসলীলা ও শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম এক বহুমাত্রিক তীব্রতা অর্জন করেছিল। এদের প্রথমজন হলেন, জামালুদ্দীন আফগানী, দ্বিতীয়জন কবি ইকবাল। এডওয়ার্ড সাঈদ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অনেকটা খুলে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তার আগে এরা দু'জন যথার্থ অর্থেই সাম্রাজ্যবাদের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনকে চিহ্নিত করেছেন এবং মুসলিম দুনিয়া নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত সম্পর্কেও তারা যথাসময়ে সতর্ক করেছেন। সাঈদের সাথে এদের বড় একটা তফাৎ হচ্ছে, সাঈদ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র উদোম করেই খুশি কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প কি হবে, পাশ্চাত্য দর্শনের বদলে নবাগত দর্শনের আদল কি রকম হবে এ সম্পর্কে তিনি কোন ধারণা আমাদের দেননি। বোধ হয় এ নিয়ে চিন্তা করবার মতো যথেষ্ট ফুরসত জীবদ্দশায় তার ঘটেনি। সাঈদের এ সীমাবদ্ধতা এদের দু'জনকে অন্তত স্পর্শ করেনি। এরা দু'জন পাশ্চাত্য দর্শনের বাইরে মানবমুক্তির পথগুলো নেড়েচেড়ে দেখেছেন এবং বিকল্প দর্শনের নমুনাও হাজির করেছেন। সেদিক দিয়ে এরা দু'জনই দ্রষ্টার মর্যাদা পাবার দাবিদার, সাঈদ শুধু চিন্তাবিদই রয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনীতি চর্চার কোন কোন ক্ষেত্রে সাঈদ একটা সংবেদনা ও ঢেউ সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও সেকুলার মন-মানসিকতার লোকজনের কাছে তার একটা আবেদন সৃষ্টি হলেও হতে পারে। কিন্তু কেন এই আবেদন? যে দেশের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস আছে, যে দেশে নাকি তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও ফকীর মজনু শাহর মতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নায়করা জন্ম নিয়েছেন, তাদেরকে বাদ দিয়ে আজকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

www.pathagar.com

আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে সাঈদের কাছে হাত পাততে হচ্ছে কোন যুক্তিতে? সাঈদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এটা কি এই জন্য তিনি ধর্মসূত্রে খ্রিস্টান, জন্মসূত্রে ফিলিস্তিনী হলেও তার কর্মমুখর জীবন কেটেছে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানকার সমাজ জীবনকে তিনি বলেছেন সৃষ্টিশীল (creative)—একি তার শুধু স্বীকারোক্তি না ঐ সমাজের প্রতি তার ভালবাসার নমুনা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রকাশক তার বইগুলো ছেপেছে, যার মধ্যে পেঙ্গুইনও আছে। পেঙ্গুইন কোন যা তা প্রকাশক নয়, তৃতীয় বিশ্বের কোন লেখক এ প্রকাশনা থেকে তার কোন বই ছাপতে পারলে বোধ করি জীবন ধন্য বলে বিবেচনা করবেন। সেই পেঙ্গুইন বছরের পর বছর ধরে তার Orientalism বইটি বিশ্বব্যাপী বিক্রয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। উপর্যুপরি সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সবল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা অনেকের ভাগ্যেই জোটেনি। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসমাইল রাজ আল ফারুকী, হামিদ আলগার কিংবা আমাদের সৈয়দ আলী আশরাফরা সাম্রাজ্যবাদের এই প্রসাদটুকু পাননি বলেই তাদের খ্যাতি সাঈদের মতো বিশ্বজোড়া হতে পারেনি। নতুবা এদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার তীব্রতা সাঈদের চেয়ে মোটেই হালকা ছিল না। আজকে আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে সাঈদকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার এই ফাঁকটুকু না ধরতে পারলে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ সচেতনতা যথার্থ অর্থে বিকশিত হতে পারবে না। দোহাই, আমার এ লেখার মধ্যে কেউ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজবেন না। এটি একটি পদ্ধতির প্রশ্ন। কেননা সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অলি-গলি ও ফাঁক-ফোকরগুলো এত ভয়ানক যেখানে নিজের পিতা বা সন্তানকেও শত্রু বলে ভ্রম হতে পারে। বছরের পর বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রচার চালিয়ে এর সম্পর্কে যে বিরূপ ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে তাতে ইসলামের কথা শুনলেই আমাদের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের সাপের লেজে পা পড়বার মতো অবস্থা হয়। ইসলাম মাত্রই বর্বরদের ধর্ম আর মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী– পাশ্চাত্যের এবং তথাকথিত প্রগতিশীলদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচার-প্রপাগাণ্ডা এখন এক অসহনীয় মাত্রা অর্জন করেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সাঈদকে সঙ্গে নিতে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা স্বস্তি অনুভব করেন। কেননা তাতে মধ্যযুগীয় ও বর্বর হবার সম্ভাবনা থাকে না। ইকবাল বা আফগানীকে সাথে রাখলে এই বিপদটা প্রবল হয়ে ওঠে। তিতুমীর বা শরীয়তুল্লাহর তো প্রশ্নই ওঠে না। তাদের ঐ দাড়ি ও পাগড়িতে মেলানো জঙ্গি চেহারায় এদের দারুণ ভয়, তা তারা যতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হোন না কেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় শরীক হতে গিয়ে আমাদের এলিট শ্রেণী নতুন এক উপনিবেশে ঢুকে পড়ছেন। এ হচ্ছে

www.pathagar.com

মনোজাগতিক উপনিবেশ, যা সাঈদ রুখতে পারেননি। আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। এক সময় আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার পশ্চিমা জ্ঞান ও দর্শনকে আমরা চোখ বুজে গ্রহণ করেছি। আমরা মনে করেছি এই জ্ঞান ও দর্শন আমাদের ত্রাতার কাজ করবে। কলোনির প্রভুরাও আমাদের সে রকমভাবেই বুঝিয়েছে। কিন্তু এই জ্ঞান ও দর্শন যে অন্যকে উপনিবেশিত ও শৃঙ্খলিত করে রাখার হাতিয়ার সেই চেতনা আমাদের অনেক পরে এসেছে। তাও আবার পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকদের লেখালেখি পড়ে, যা নাকি উত্তর আধুনিকতার ধারণা হিসেবে বেশ বাজার পেয়েছে। তার মানে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা সেই বিরোধিতার প্রেরণাও পাচ্ছি সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকেই। সাম্রাজ্যবাদের এই দ্বৈত চেহারা বুঝতে না পারলে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কখনোই যুৎসই হতে পারবে না। সাঈদের উদাহরণটা আবারো দেয়া যেতে পারে। সাঈদ যদি তার যাবতীয় লেখালেখি ও বক্তৃতা-বিবৃতি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে না করে ফিলিস্তিনের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে করতেন তবে কি তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আইকন হিসেবে আজ পৃথিবী জুড়ে এত সম্মান ও মর্যাদা পেতেন? তাহলে যদি বলি সাঈদ নিজের অজান্তেই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা কিছুটা ব্যবহৃত হয়েছেন তাহলে কি মিথ্যা বলা হবে?

কেন তাহলে সাম্রাজ্যবাদ এই দ্বৈত চেহারা নিচ্ছে? সে প্রসঙ্গেই আসছি। সাম্রাজ্যবাদ নিজের একটা উদার গণতান্ত্রিক চেহারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে চায়। এর কারণ অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা হরণের তার যে ইতিহাস সেটা সে গোপন করতে ইচ্ছুক। উদারনৈতিকতার এই চেহারা ঝুলিয়েই সে যাবতীয় কুকর্ম করে। অন্যদিকে আমরা যারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলে ভাবতে ভালবাসি তারাও সাম্রাজ্যবাদের এই উদারনৈতিকতার সূত্রগুলোকে প্রাণ-মন ঢেলে মান্য করার চেষ্টা করি এবং অবশ্যই প্রতারিত হই। আমরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে চাই না এভাবে উদার নৈতিক হতে গিয়ে আমরা একটি বৌদ্ধিক সাম্রাজ্যবাদকে আমাদের চেতনার ভিতরে শিকড় বসাতে দেই।

২

জামালুদ্দীন আফগানী ও ইকবাল– এ দু'জনের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। দু'জনেই মুক্তি-সংগ্রামী, লড়াকু বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ও স্বাধিকার আন্দোলনের সংগঠক এবং সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা, দর্শন ও প্রচার-প্রচারণার তীব্র সমালোচক। বিশেষ করে জামালুদ্দীন আফগানী সেই ঊনিশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার মজলুম মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এই একটিমাত্র মানুষ নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্মোদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি লেখালেখি

www.pathagar.com

করেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণবিদ্রোহকে সংগঠিত করেছেন এবং চারণের মতো দেশে দেশে ঘুরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মজলুম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়বার প্রেরণা যুগিয়েছেন।

জামালুদ্দীন আফগানীর মুক্তিমন্ত্র প্যান-ইসলামিজম ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও ঠেকিয়ে রাখার অভিনব কৌশল। আফগানী তার অসীম দূরদৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের শক্তি হচ্ছে মুসলিম জনগণ ও দেশসমূহের অনৈক্য ও পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সাম্রাজ্যবাদের কাজ হচ্ছে যে কোন ভাবেই এই বিভেদকে জিইয়ে রাখা। তিনি মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করতেন এই অনৈক্যকে যদি ইসলামের ভিত্তিতে কার্যকর অর্থেই এক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করা যায় তবে মুসলিম দেশসমূহ থেকে সাম্রাজ্যবাদ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হবে।

জামালুদ্দীন আফগানীর আর একটি কৃতি হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের পোষিত সেকালের Orientalist বা প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মিথ্যা, অসার, অলীক ও বর্ণবাদী প্রচার-প্রপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াই। এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে পরিণত করেছিলেন এবং সেকালে সাম্রাজ্যবাদ পোষিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও বুদ্ধিজীবীদের রমরমার যুগে তিনি বুদ্ধিজীবিতার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ফরাসী বুদ্ধিজীবী আর্নেস্ট রেনানের সাথে তার দীর্ঘ মসীযুদ্ধের উল্লেখ করা যায়। এই রেনানের সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন এডওয়ার্ড সাঈদ তার Orientalism বইতে। রেনান তার এক লেখায় লিখেছিলেন ইসলাম, আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের সমার্থক নয়, যা তৎকালে আফগানীর নজরে আসে। তিনি লিখিতভাবে এই মিথ্যা প্রচারণার জবাব দেন যা একটি ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণবাদী প্রচার-প্রচারণার বিরুদ্ধে আফগানীর সম্পাদিত 'আল-উরওয়াতুল উসকা' সেকালে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আফগানীর ভাবশিষ্য ইকবাল ইউরোপীয় সভ্যতাকে বলেছেন বনিক সভ্যতা এবং এর রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও কায়-কারবারকে নৈতিক অনগ্রসরতা, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও অন্তঃসম্পদের সীমাবদ্ধতার ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইকবাল সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ও দর্শনের অসারতা ও মানব কল্যাণে এর অনুপযোগিতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের বাইরে অবস্থান নিয়ে মানব কল্যাণের বিকল্প মডেল হাজির করে বুদ্ধিজীবিতার ক্ষেত্রে এক অনন্যতা স্থাপন করেছেন। বিশেষ করে আধুনিককালে দর্শন জগতে পাশ্চাত্যের একক আধিপত্যের স্থানকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একালে বৌদ্ধিক ও দার্শনিক লড়াইয়ের তিনিই অগ্রপথিক। ইকবাল মনে করতেন বনিক সভ্যতার অন্তঃস্থলে যে বস্তুবাদী নৈরাজ্য

www.pathagar.com

কাজ করছে তাই পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলোকে হানাহানি, লুটমার, রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাদের বস্তুগত লোভের পিপাসা মেটাতে গিয়ে আজকের পৃথিবী একটি নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং ইসলাম-প্রধান দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাদের একতরফা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক লড়াইয়ের এ হচ্ছে একটি প্রধান কারণ। বনিক সভ্যতার আধিপত্যবাদী চিত্রের দিকে ইংগিত করে ইকবাল লিখেছিলেন ঃ

ইম্পিরিয়ালিজম এর দেহটা প্রকাণ্ড,
হৃদয়টা অন্ধকার ...।

যে ফিলিস্তিন নিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন এবং ফিলিস্তিনে আমেরিকার নীতির কঠোর সমালোচক হিসেবে তাকে সেখানকার সংগঠিত ইহুদী লবির ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হয়েছিল সেই ফিলিস্তিন নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ইকবাল অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন। ফিলিস্তিন নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকাকে তিনি তাদের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শক্তি ও কৌশলের জোরে করায়ত্ত করে পরে তার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের পুরনো খেলা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইকবাল তার জীবদ্দশায় দেখেছেন কি করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো আজকের মধ্যপ্রাচ্যকে টুকরো টুকরো করে সেখানে কতকগুলো কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, যার মধ্যে ইসরাইল অন্যতম। আজকের ফিলিস্তিন সমস্যা সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি, পুরো মধ্যপ্রাচ্যের উপর নজরদারী ও আধিপত্য কায়েম করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ এখানে তাই কখনো সত্যিকারের শান্তি প্রক্রিয়া সূচিত হতে দেয়নি। বছরের পর বছর ধরে শান্তির রোড ম্যাপ প্রস্তুত হচ্ছে বটে, কিন্তু ফিলিস্তিনীদের রক্ত ঝরা বন্ধ হয়নি। বিশ্ব জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘকেও ইকবাল সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা প্রসূত মনে করতেন। কারণ এ সংঘটি সাম্রাজ্যবাদের ইশারা ছাড়া এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। একই কারণে ইকবাল মনে করতেন এ সংস্থাটি থেকে ফিলিস্তিনীরা কোন ইনসাফ পাবে না। তার এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ইকবাল জাতিপুঞ্জকে বলেছেন, Kept woman of the old man of Europe এবং অন্যত্র জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন The body of coffin thieves formed for the distribution of graves. সুতরাং এই কফিন চোরারূপী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিশ্বশান্তি প্রত্যাশা করা যেমন মূঢ়তা তেমনি ফিলিস্তিনীদের পক্ষে সুবিচার আশা করাও প্রহেলিকা।

পশ্চিমাদের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের তত্ত্বকে ইকবাল মনে করতেন এক বড় ধরনের মূলা। এই মূলা ঝুলিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বজুড়ে তাদের লুটমার, নরমেধযজ্ঞ ও শোষণ-শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে ইকবালের বিখ্যাত বচনটি আবার নতুন করে উল্লেখ করছি ঃ

www.pathagar.com

গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সরকার
যাতে মানুষকে গণনা করা হয়,
হয় না তার মূল্য যাচাই করা।

এখানে একটা জিনিস বুঝে নেয়া আমাদের জন্য খুব জরুরি। আফগানী ও ইকবাল এ দু'জন মানুষই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ নিপীড়িত মানুষের পক্ষে যে রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক লড়াই চালিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে এদের ঐতিহাসিক লড়াই ও সাফল্যকে কোন হিসেবের মধ্যে না এনে আমরা এখন অনেকটা কাকতালীয়ভাবে বাইরের কোন উৎসের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা ভিক্ষা করছি। কিন্তু এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা, বাইরের অনুপ্রেরণাজাত আন্দোলন কখনো দীর্ঘস্থায়ী সফলতার মুখ দেখতে পারে না। যে উত্তর আধুনিকতা ও ওরিয়েন্টালিজম তত্ত্বের জন্ম পাশ্চাত্যে, সেই উত্তর আধুনিকতা ও ওরিয়েন্টালিজমকে এখন আমরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সমান্তরাল হিসেবে গ্রহণ করছি। এই গ্রহণের মধ্যে যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু ফাঁকের জায়গাটাও গোপন রাখা যাচ্ছে না। এই ফাঁকের জায়গাটা যাতে না থাকে আফগানী ও ইকবালের ঐতিহাসিক সংগ্রামটা তাই আমাদের চোখের সামনে রাখা খুবই জরুরি।

৩

ওরিয়েন্টালিজম তত্ত্ব নিয়ে এখন দুনিয়া জুড়ে তুলকালাম তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে। এর প্রভাব আমাদের দেশেও কিছুটা পড়েছে বৈকি। অনেক আলোচনা-সমালোচনায় ওরিয়েন্টালিজমকে এখন সাম্রাজ্যবাদেরই সমান্তরাল হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এডওয়ার্ড সাঈদের মনে কি ছিল জানি না, তবে তিনি যে কৌশল ওরিয়েন্টালিজম বইতে নিয়েছেন তা রীতিমত পণ্ডিতী আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সত্য বটে এতে অনেক Intellectual elite-এর মনের খোরাক আছে কিন্তু মার্কস এর সেই বহুকথিত 'প্রোলেতারিয়েতদের' জন্য এই বইতে আদৌ কি কোন সুখদ অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা থাকতে পারে বলে মনে হয়? এই প্রোলেতারিয়েতদের কাছে কি আমাদের তিতুমীর কিংবা শরীয়তুল্লাহদের বাণী ও বক্তব্য অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়নি? নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের আবেগ ও ভাষাকে বুঝতে দেরি করেননি তিতুমীর ও শরীয়তুল্লাহ। তাই তাদের আন্দোলনে এত প্রাণাবেগ সঞ্চিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় বশংবদেরা অবশ্য এদেরকে 'পশ্চাদগামী' ও 'ধর্মোন্মাদ' বলে বাতিল করতে চাইলেও দেশের মানুষ কিন্তু ঠিকই তাদের চিনতে পেরেছিলেন এবং প্রয়োজনে সমর্থনও করেছিলেন।

www.pathagar.com

অনেকেই জানেন আমাদের দেশের 'মোল্লারা' এ দেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই পর্যন্ত করেছিলেন, এমনকি কেউ কেউ ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে হারাম হিসেবে ফতোয়াও দিয়েছিলেন। সে জন্য এখনো আমরা 'মোল্লাদেরকে' ক্ষমা করিনি। কিন্তু কেউ আমরা বিচার করে দেখিনি কেন 'মোল্লারা' সেদিন কোন প্রেক্ষিত ও পটভূমিতে এ রকম ফতোয়া দিতে প্রাণিত বোধ করেছিলেন। আজকে তো এই 'মোল্লারাই' এ দেশে রীতিমত ইংরেজি ক্যাডেট মাদরাসা পর্যন্ত চালাচ্ছেন। তাহলে সেদিন আর এদিনে তফাৎটা কোথায়?

এই 'মোল্লারা' সেদিন যেটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছিলেন, অনেক ইংরেজি শিক্ষিত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী সে কথা আমলে নেননি বা ধরতে পারেননি। এরা কিন্তু বুঝেছিলেন এই ভাষাটাই হচ্ছে ইংরেজের শক্তি। এই ভাষার চাকার উপর ভর করে ইংরেজের যে জ্ঞান-গরিমা এ দেশের মানুষের মনে মগজে ঢুকে পড়বে তাই এদের চিন্তা-ভাবনা উপনিবেশিত করার জন্য যথেষ্ট। এ জন্যই তারা হয়তো বলেছিলেন, ইংরেজি জবান শিখলে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এদেরকে আমাদের কাঠমোল্লা মনে হতে পারে, কিন্তু সহজ-সরল গ্রাম্য জবানীতে সেদিন তারা যে কথা বলেছিলেন আজ কি এডওয়ার্ড সাঈদ বা উত্তর আধুনিকতার তাত্ত্বিক গুরুরা যেমন মিশেল ফুকো পণ্ডিতী কচকচানিতে সে কথাই বলছেন না? ওরিয়েন্টালিজমে এডওয়ার্ড সাঈদ নতুন কি কিছু বলেছেন? এখানে তিনি প্রাচ্যবিদ্যা কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে তাই দেখিয়েছেন। আর মিশেল ফুকো কি বলছেন? আসলে জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা বিস্তার করা এবং অন্যকে সেই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। প্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের বয়ান নিয়ে সাঈদ বা কোন কোন উত্তর আধুনিক তাত্ত্বিক দীর্ঘ পণ্ডিতী বিতর্ক করেছেন সত্য, কিন্তু এই বয়ানের বিপরীতে তারা কোন পাল্টা বয়ান তৈরির কথা বলেননি। এডওয়ার্ড সাঈদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ের কথা বললেও অন্যান্য উত্তর আধুনিক তাত্ত্বিকরা পণ্ডিতী তর্ক-বিতর্কেই নিজেদের শক্তি ক্ষয় করেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধে বিকল্প কোন পথ বাতলাতে পারেননি। এডওয়ার্ড সাঈদ যে কাজটি করেছেন তা হলো ঔপনিবেশিক শক্তি ইসলামকে কিভাবে দেখে এবং চিত্রিত করে সেটি তিনি ঔপনিবেশিক শক্তির কেন্দ্রে বসে তাদের ভাষায় ও পণ্ডিতী আঙ্গিকে তুলে ধরে রীতিমত হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের 'মোল্লারা' সাঈদের মতো পরিশীলিত ভাষায় পণ্ডিতী তর্ক করতে পারেননি সত্য, কিন্তু তারা সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক বিপদ সম্বন্ধে খুব ভাল করে সচেতন হয়েছিলেন এবং এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শুধু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লড়াই নয়, এক সশস্ত্র লড়াইয়েও তারা নেমে পড়েছিলেন। এডওয়ার্ড

www.pathagar.com

সাঈদ বা অন্যান্য উত্তর আধুনিক তাত্ত্বিকরা আজকে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই শুরু হয়েছে সেখানে সহযোগী শক্তির একটা ভূমিকা অবশ্যই রাখতে পারেন, কিন্তু এ লড়াইয়ের মূল প্রাণশক্তি আজ আহরিত হতে হবে মুসলমানদের ভিতর থেকেই এবং সেই উৎস হবে নিশ্চিতভাবেই ইসলাম। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এই দীর্ঘ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সশস্ত্র লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে Identity রক্ষা করা চাই, তার জন্য দরকার ইসলামের কাছে পূর্ণ সমর্পণ। আমরা ইকবালের কথা মনে করতে পারি ঃ In times of crises, it is not Muslims that saved Islam, on the contrary it is Islam that saved Muslims.

গত কয়েকশ বছর ধরে ইসলামই তো সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও ইউরোপীয় জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বহুমুখী প্রতিরোধ যুদ্ধের মন্ত্র দিয়ে আসছে। আমাদের এখানে ওহাবী-ফরায়েজীরা লড়েছে, আফ্রিকায় মাহদী-সানুসীরা লড়েছে। রাজনৈতিক বৌদ্ধিকভাবে চিন্তা করলে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের বিপরীতে আফগানী বিশেষ করে ইকবাল ও ইরানের আলী শরীয়তি বিকল্প ভাবনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। আজকের ভূরাজনৈতিক ও বৈশ্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে এই বিকল্প ধারার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের তাগিদ আরো তীব্রতর হয়েছে এবং সেখানে ইসলামের অবস্থানকে গভীরভাবে বুঝে নেয়ার সময়ও এসে গেছে।

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিজম ঃ আমাদের প্রতিক্রিয়া

১

ওরিয়েন্টালিজমের কথাটা উঠলে আজকাল এডওয়ার্ড সাঈদের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ওরিয়েন্টালিজমের তিনি সমালোচনা করেছেন! সেই প্রতাপেই তাকে আমরা পণ্ডিত হিসেবে সনাক্ত করি। তার নিজের লেখা 'ওরিয়েন্টালিজম' বইটির জন্য তার খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়েছে; পণ্ডিত হিসেবেও তিনি কামিয়াব হয়েছেন। এ বইতে পণ্ডিতী চালে তিনি যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তাই বলা যায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খানিকটা খুলে দিয়েছে। এরই সুবাদে তিনি আজকাল অনেকের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার 'আইডল' হিসেবে পূজা পেতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে আমাদের এখানে তরুণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের তাকে নিয়ে একটা সংবেদনা সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণও স্পষ্ট। সাঈদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কতকটা তার ফিলিস্তিনী পটভূমির প্রতিক্রিয়াজাত এবং তা আমাদের অনেকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। তাছাড়া সাঈদের বরাত ভাল। সাম্রাজ্যবাদের মিডিয়ার নেক নজর তিনি পুরোপুরি হাসিল করেছেন। সাঈদের খ্যাতি বিস্তারিত হওয়ার এটিও একটি কারণ।

সাঈদ যখন নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তার ওরিয়েন্টালিজম পাণ্ডুলিপির শেষ মুসাবিদা করছেন, এর প্রায় একশ বছর আগে আমাদের এই বাংলাদেশের এক নিভৃত জেলা শহর যশোরে বসে মুন্সী মেহেরুল্লাহ তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কৌশলগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছেন। আমাদের অনেক শিক্ষিত আধুনিকতাবাদী, সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা ও প্রচারণার গুণে যারা ইসলামকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন তারা হয়তো সাঈদের পাশে মুন্সী মেহেরুল্লাহর নাম শুনে রীতিমত গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করবেন, মানুষটি কে?

মুন্সী মেহেরুল্লাহকে আমরা মনে রাখিনি। আমাদের গণমাধ্যমগুলো তার জন্য এতটুকু মহানুভবতা দেখাতে পারেনি। এক টুকরো খবর হিসেবেও তার জন্ম বা মৃত্যু দিবস আজ কোন পত্রিকা ছাপে না। এ আমাদের দুর্ভাগ্য। এডওয়ার্ড সাঈদের মতো আমাদের মুন্সী মেহেরুল্লাহ কোন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে পারেননি, ইংরেজিও তেমন জানতেন বলে মনে হয় না, আজকালকার টিভি প্রোগ্রামে চোস্ত বক্তৃতা দেয়ার ভাগ্যও তার জোটেনি। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তার তেমন কিছু ছিল না বললেই চলে। কিছু আরবী জ্ঞান ও পেশায় দর্জিগিরি– এই ছিল তার সম্বল। সবকিছুর বিচারে আমাদের আধুনিকতাবাদীদের চোখে তিনি একজন মধ্যযুগীয় বকলম ও অর্ধশিক্ষিত মোল্লা ছাড়া আর কি হতে পারেন?

www.pathagar.com

অন্ততপক্ষে যতদিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বর্ণবাদী ও একপেশে সংজ্ঞা দিয়ে আমাদের আধুনিকতাবাদী ও পাশ্চাত্য প্রেমীদের বাগে রাখতে পারবে ততদিন তার জাতে উঠবার সম্ভাবনা কম। আজকালকার আধুনিকতাবাদীদের নিরিখে হয়তো এডওয়ার্ড সাঈদের সাথে মুন্সী মেহেরুল্লাহর তুলনা চলে না। তারপরেও এই একটি সহায়-সম্বলহীন নিঃস্ব মানুষ কেবলমাত্র নিজের ভিতরের অন্তর্গত শক্তির জোরে পুরো একটা জাতিকে কিভাবে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষু আর তার পোষিত চার্চ ও পাদ্রীদের ইসলাম বিরোধী জঘন্য প্রচারণার বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিরোধের দূর্গ গড়ে তুলেছিলেন তা একরকম তুলনাহীন।

এডওয়ার্ড সাঈদ পণ্ডিতী চালে ও অনেকটা বিমূর্ত এক ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চাকে বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখিয়েছেন উপনিবেশিত জাতিগুলোকে বিশেষ করে ইসলামকে সাম্রাজ্যবাদীরা কি দৃষ্টিতে দেখে বা মূল্যায়ন করে এবং সেই দেখা বা মূল্যায়নের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বর্ণবাদী চোখ কিভাবে তাকিয়ে থাকে। এটিকে সাঈদ নাম দিয়েছেন ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যা। সাঈদ যেটিকে সাংস্কৃতিকভাবে এবং কতকটা রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করেছেন, মুন্সী মেহেরুল্লাহ সেই জিনিসটিকেই ধর্মগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায় গ্রহণ করেছিলেন, তাকে খামখা পণ্ডিতী করতে হয়নি। দু'জনের লড়াইয়ের মধ্যে পদ্ধতিগত ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু উভয়ের প্রতিপক্ষ ছিল সেই এক ও অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ।

একদিকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ যেমন সাম্রাজ্যবাদ তথা খ্রিস্টান মিশনারীদের মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তেমনি তিনি নিজ সমাজের অজ্ঞানতা, মোহাচ্ছন্নতা ও অধপতনের বিরুদ্ধে তার জেহাদ জারি রেখেছিলেন। এই দুই ক্ষেত্রেই মুন্সী মেহেরুল্লাহ বাংলাদেশের চিন্তা ও রাজনীতির জন্য অবশ্য পাঠ্য ব্যক্তি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় চিন্তার ক্ষেত্রকে স্বচ্ছ করার জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

২

এ দেশে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগমন করে তখন তার সাথে সাথে খ্রিস্টান মিশনারীরাও আসতে শুরু করে। এদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এদের ধর্ম প্রচারকে নিজেদের স্বার্থে উৎসাহিত করে। এ সব ধর্ম প্রচারক ছিল ভয়ানক রকমের সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী। ক্রুসেডের পর থেকে ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে খ্রিস্টান পাদ্রীরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অনেক অলীক গল্পও চালু করেছিল। পাদ্রীদের প্রচারণা এতই শক্ত ছিল যে এসব কাহিনী খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করতো। এমনকি তারা মনে করতো কুরআন শরীফ হচ্ছে শয়তানের রচনা। আজকের সালমান

www.pathagar.com

রুশদীর সাটানিক ভার্সেস সেই ঐতিহ্য আহরিত কল্প কাহিনী। উনিশ শতকে যে প্রাচ্যবিদের দল ইউরোপে বসে প্রতাপের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিল তারাও কিন্তু এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ফসল, যাদের অসূয়ার কথা এডওয়ার্ড সাঈদ তার বইয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম ম্যুর, সেল, স্প্রেঙ্গার, জুয়েমার প্রমুখের ইসলাম বিরোধী কুৎসামূলক বই-পত্রের কথা আমরা বলতে পারি। যেসব খ্রিস্টান পাদ্রী এদেশে ইংরেজ শাসনের সুবাদে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে এসেছিল তারা পাশ্চাত্যের এই নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে আক্রমণ করেছিল। এইসব আক্রমণের সেদিন যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। তার বিত্ত ছিল না, জনবল ছিল না, রাজানুকুল্যও তিনি পাননি। ছিল শুধু ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা ও অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে তিনি সে যুগে এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। প্রাচ্যবিদদের লেখালেখিতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে রকমের বিষোদগার ছড়িয়ে থাকতো, খ্রিস্টান পাদ্রীরাও এ দেশে এসে তারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। এরা কুরআনের শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ইসলামের পয়গম্বরের চরিত্র নাশের চেষ্টা করেছিলেন এবং মানুষের মুক্তির জন্য খ্রিস্টান ধর্মই যে একমাত্র পথ সে বিতর্কও তারা সৃষ্টি করেছিলেন।

ইংরেজ শাসনে তখন বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল। এই নিষ্প্রাণতার কালে আবার ইংরেজ শাসকের প্রশ্রয়ে পাদ্রীদের ইসলাম বিরোধী আক্রমণ জোরদার হয়ে এল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ সেইকালে খ্রিস্টান ধর্মের আগ্রাসন থেকে বাঙালি মুসলমানকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। বলা চলে তিনি প্রায় এককভাবে খ্রিস্টানদের সকল সমালোচনা খণ্ডন করেছিলেন। এ সমস্ত খণ্ডন প্রক্রিয়ায় মুন্সী মেহেরুল্লাহকে আমরা যুক্তিবাদী, জ্ঞানী ও শাস্ত্রবিদ হিসেবে দেখতে পাই। যে প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষিত পাদ্রীদের ইসলাম বিরোধী তত্ত্ব ও যুক্তিকে তিনি ভুল প্রমাণ করেছিলেন তা আজকের দিনের বিবেচনায়ও এক অনন্য সাধারণ কাজ। তার কার্যক্রমের সাথে হাল আমলের দক্ষিণ আফ্রিকার ইসলাম প্রচারক আহমদ দীদাতের বড় রকমের সাদৃশ্য আছে। দীদাত যেমন ওয়াজ করে, বাহাস করে, ধর্মসভা করে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট পাদ্রীদের সাফল্যজনকভাবে মোকাবেলা করেছেন, মুন্সী মেহেরুল্লাহও সেদিন তার সীমিত সামর্থ্যের ভেতর একই কৌশলে কাজ করেছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন পুরোপুরি একজন স্বশিক্ষিত ও আত্মপ্রশিক্ষিত ব্যক্তি, নিজের চেষ্টায় তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর এক বিরাট জ্ঞান হাসিল করেছিলেন। এই জ্ঞান না থাকলে তার যুক্তি এতো ক্ষুরধার হতে পারতো না এবং পাদ্রীরা বুঝতে পেরেছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাথে লড়াই করে টিকে থাকা সহজ কথা নয়। উনিশ শতকে রাজা রামমোহন যেমন

www.pathagar.com

করে পাদ্রীদের যুক্তিকে খণ্ডন করে হিন্দুধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে একই কাজ করেছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ কিছু লেখালেখিও করেছিলেন। সাহিত্যের বিচারে এবং রীতি প্রকরণের দিক দিয়ে এগুলো হয়তো সাহিত্য পদবাচ্য নাও হতে পারে, কিন্তু বাঙালি মুসলমানের সামাজিক জাগরণ ও ধর্মীয় শুদ্ধতা আনয়নের ক্ষেত্রে এর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লেখক হিসেবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ যাই হোন না কেন, তারই প্রেরণায় কিন্তু সেকালে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল একদল সাহিত্যব্রতী, যারা নিশিদিন কলম চালিয়ে বাঙালি মুসলমানের প্রাণে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন। এরা 'সুধাকর গোষ্ঠী' হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সাতক্ষীরার মৌলবী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, টাঙ্গাইলের পণ্ডিত রেয়াজ আল দীন আহমদ মাশহাদী, বশির হাটের শেখ আবদুর রহীম, ত্রিপুরার মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানকে পাদ্রীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমান ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলাই ছিল এ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। এরা যেমন করে সচেতনভাবে বাঙালি মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য রচনার নেশায় মেতে উঠেছিলেন, এদের লেখালেখিতে যেমন করে সেদিনের বাঙালি মুসলমানের মনোজীবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে, তেমন করে এর আগে কাউকে দেখা যায়নি। তাদের মধ্যে মুসলিম চেতনাবোধ ছিল প্রখর। বাঙালি মুসলমানকে তারা ঘরমুখো করেছিলেন, নিজেদের চিনতে সহায়তা করেছিলেন এবং পরবর্তী মুসলমান সাহিত্যব্রতীদের জন্য তারা পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। আর এই সবকিছুর পিছনে যিনি বাতিঘর হয়ে কাজ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। বাঙালি মুসলমানের জাতীয় চেতনার আবিষ্কারে তার অবদান আজো তুলনাহীন। বাঙালি মুসলমান একটা আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের সাহিত্যব্রতীরা আজকাল উনিশ শতকীয় কলকাতার হিন্দু জাগরণ নিয়ে মাতামাতি করেন, সেদিন বাঙালি মুসলমানের ভিতর একজন রামমোহন আসেনি বলে আক্ষেপ করেন, এমনকি সাম্রাজ্যবাদের সেদিনকার বরকন্দাজ শ্রীরামপুর খ্রিস্টান মিশনের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরী কিংবা ইয়ং বেঙ্গলের হেনরী ডিরোজিওকে নিয়েও পত্রিকার পাতায় কিস্তির পর কিস্তি লেখা দিয়ে থাকেন, অথচ মুন্সী মেহেরুল্লাহকে নিয়ে লিখতে তাদের কলমে কালি থাকে না। এই ভয়ানক আত্মবিস্মৃতি আজ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আজ আবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নামে এডওয়ার্ড সাঈদের কথা শুনছি। সাঈদকে আমাদের প্রয়োজন, মানি। তিনি গুরুত্বপূর্ণ একথাও সত্য। কিন্তু সেই প্রয়োজন ও গুরুত্বের মৌলিকত্ব কতদূর? ভিতরের সাঈদদের বাদ দিয়ে বাইরের শাখা প্রশাখা নিয়ে টানাটানি করে আমাদের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত হবে কি?

www.pathagar.com

৩

আমাদের আধুনিকতাবাদীরা আজকাল যে রকম করে এডওয়ার্ড সাঈদকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেছেন তাতে মনে হচ্ছে সাঈদকে সাথে না পেলে এতকাল ধরে চেষ্টা চরিত্র করে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হবার যে সাধনা করেছিলেন, তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমরা জানি সাঈদ সাম্রাজ্যবাদ– উপনিবেশবাদের বিরোধী ছিলেন। প্রাচ্যবাদ বা ওরিয়েন্টালিজম বইয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সেই পশ্চিমী তৎপরতা দেখেছেন। উপনিবেশের মানুষদের নিয়ে কিভাবে জ্ঞানের নতুন তত্ত্ব তৈরি হলো এবং তাদের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভবকে আবদ্ধ করার শিকল তৈরি হলো সাঈদ সেসব কথা আমাদের খোলামেলা বলেছেন। সাঈদ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশবাদ -সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথাও বলেছেন। সাঈদের এই ভূমিকা অসাধারণ কিন্তু তাকি অনন্য? সাঈদের আগেও পৃথিবীর নানাদেশে, নানা রকমভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদকে কেউ রাজনৈতিক, কেউ সাংস্কৃতিক, কেউ দার্শনিক, কেউবা সশস্ত্র কিংবা ধর্মগতভাবে ঠেকানোর চেষ্টাও করেছেন। মার্ক্সবাদীরা মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক প্রকাশ, সুতরাং এটিকে তারা অর্থনৈতিকভাবে ব্যাখ্য করেন ও সেইভাবে ঠেকানোর কর্মকৌশল তৈরির কথা বলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাঈদ এ পথের পথিকৃৎ নন, অনেকেই তার আগে গুজরে গেছেন। বড়জোর তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নবীন ও বলিষ্ঠ পুরুষ হিসেবে মোবারকবাদ জানানো যায়।

তাহলে সাঈদের প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে এতো হৈ চৈ কেন? বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবী আমাদের দেশেও কম জন্মাননি। উপনিবেশের বন্ধন ছিঁড়তে তারাও কম সংগ্রাম করেননি। যেমন ধরা যাক মওলানা আকরাম খাঁর কথা। সাঈদকে বলা হয় প্রথাবিরোধী ও লড়াকু বুদ্ধিজীবী। প্রথাগত চিন্তার ভিত তিনি নাড়িয়ে দিয়েছেন। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে পাণ্ডিত্যে, লেখাপড়ায় এডওয়ার্ড সাঈদের চেয়ে মওলানা আকরাম খাঁ কম যান কিসে? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আকরাম খাঁর অবদান খেয়াল করুন। আজাদীর জন্য তিনি কারাবরণ করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের জুলুম-শোষণ মুখ বুঝে মেনে নিয়েছেন। তার কালে তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিক। তিনি সাংবাদিকতা করেছেন। এ সাংবাদিকতা কোন যা তা সাংবাদিকতা নয়। তার কলমের জোরে সাম্রাজ্যবাদ ও তার এ দেশীয় এজেন্টদের ভিত কেঁপে উঠেছিল। আকরাম খাঁ উচ্চাঙ্গের গদ্য লিখতেন। সেসব লেখা মননশীলতা ও যুক্তিবাদিতার অপূর্ব সমন্বয়। তার 'মোস্তফা চরিত' শুধু ইসলামের পয়গম্বরের জীবন কাহিনী নয়, ন্যায়-নিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী একজন লেখকের রসূল (স.)-কে বুঝার যেমন এক গভীর প্রচেষ্টা, তেমনি সাম্প্রদায়িক প্রাচ্যবিদদের রসূল (স.)-এর ভাবমূর্তি নাশের বিরুদ্ধে এক

www.pathagar.com

তীব্র প্রতিবাদও বটে; সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি। অন্যদিকে তিনি ছিলেন উঁচু মাপের আলেম ও শাস্ত্রজ্ঞ। ইসলামকে তিনি এ কালের নিরিখে যাচাই-বাছাই করে দেখেছিলেন এবং এর উপযোগিতাকে যুগ ধর্মের আলোকে প্রস্তুত করার কথা ভেবেছিলেন। এডওয়ার্ড সাঈদের সাথেও তুলনা করলে বোঝা যায় আকরাম খাঁ কতো অসামান্য এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি কতো বড় মাপের মানুষ। এই রকম একজন বহুমুখী প্রতিভাধর ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রতিভূ পুরুষকে কেন আমরা ভুলে যাই? এর কারণও আমরা প্রাচ্যবিদ্যার জ্ঞানতত্ত্বের কাঠামো দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। আর যাই হোক মওলানা আকরাম খাঁ মুসলমান, তিনি মাদ্রাসা শিক্ষিত, সারাজীবন তার স্বধর্মী বাঙালি মুসলমানের হিতসাধনে প্রাণপাত করে গেছেন। সুতরাং তিনি মধ্যযুগীয়, অনগ্রসর ও মৌলবাদী হতে বাধ্য। আমাদের চিন্তা ও অনুভবকে প্রাচ্যবাদ, যা সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে এসেছে, এমনভাবে আবদ্ধ করে ফেলেছে যে মওলানা আকরাম খাঁ ও তার সহযোগীদের এর উপরে আমরা স্থান দেয়ার কথা ভাবতে পারি না।

ইসলাম কিংবা ইসলাম অনুবর্তীদের নিয়ে আমাদের এই যে হীনমন্যতা তা কিন্তু এই প্রাচ্যবিদ্যার জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর সৃষ্টি এবং এটি আমাদের কাছে এসেছে ইংরেজি ভাষা ও মূল্যবোধের ভিতর দিয়ে। আমাদের আধুনিকতাবাদীরা এই প্রাচ্যবাদের শিকলে আটকা পড়েছেন। আমরা আমাদের নিজেদের অজান্তেই আমাদের ভিতরে একটি পশ্চিমের উপনিবেশ গড়ে তুলেছি, যদিও রাজনৈতিক উপনিবেশ এখন আর আমাদের এখানে নেই।

আশার কথা মওলানা আকরাম খাঁ ও তাঁর যোগ্য সহযোগীরা প্রাচ্যবাদের এই বন্ধনকে ছিন্ন করেছিলেন শুধু তাদের নিজেদের প্রজ্ঞা ও আদর্শবাদের জোরে। একই কারণে সাম্রাজ্যবাদ এদেরকে তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। মওলানা আকরাম খাঁকে পরাভূত করা যায়নি, কিন্তু অনেকেই পরাভূত হয়েছেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। মওলানা আকরাম খাঁর সমকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আমরা জানি। এরাও কিন্তু প্রাচ্যবাদী এই জ্ঞানতত্ত্বের বাইরে যেতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র তার সময়ের বিরাট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুরোহিত হিসেবে তিনি আজও ঋষি হিসেবে পূজিত হন। তিনি মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। অথচ ঔপনিবেশিক ইংরেজকে তিনি ভারতের মিত্র, 'পরমোপকারী' রূপে অভিহিত করেছেন। তিনি এমন কথাও লিখেছেন, "আমরা পরাধীন জাতি অনেককাল পরাধীন থাকিব", অন্যত্র তার সাম্য বইতে এমন উক্তি আমরা পাচ্ছি, "স্ত্রী-পুরুষে যে রূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান, বাঙালি দুর্বল, ইংরেজ সাহসী, বাঙালি ভীরু, ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙালি কোমল?"

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাম্রাজ্যবাদের ব্যবস্থাপনাকে বুঝতেন না ঠিক এমন নয়, কিন্তু প্রাচ্যবাদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর শিকল ভাঙা তার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বাইরের চাপে 'সভ্যতার সংকট' নামে একটা লেখা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে নীরব ভর্ৎসনা করেছেন, যা দেখে তার ভক্তদের ক্লেশ কিছুটা লাঘব হলেও প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের উৎসাহী সমর্থক। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে ইংরেজকে 'পরমোপকারী' বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা এক পত্রে বৃটিশ সরকারকে ঈশ্বরের শাসন হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যে অন্যায় সে ফতোয়া দেন। অন্যত্র রমাঁরঁল্যার কাছে ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ভারতের পরাধীনতাকে স্বাগত জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে লেখা তার বিখ্যাত চিঠির উদ্ধৃতি এ পর্যায়ে দেয়া যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবি উপন্যাস ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর কবির সহযোগিতা চেয়ে তিনি একটা পত্র দেন। রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে লেখেন ঃ কল্যাণীয়েষু, তোমার পথের দাবি পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। ... আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম– আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম– একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। ... তোমাদের শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৭ মাঘ, ১৩৩৩)।

এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট সাম্রাজ্যবাদের জ্ঞানতত্ত্ব কিভাবে আমাদের গুণীজনদেরও কাবু করে ফেলেছে। ঐ জ্ঞানতত্ত্বে কি ছিল? সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশের মানুষদেরকে এই জ্ঞান দিয়েছিল যে, তারা শাসিত হবার জন্যই জন্মেছে, কেন না জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে তারা নিতান্তই পিছিয়ে পড়া, তাদের পক্ষে স্বাধীন হবার দরকার নেই, স্বাধীন হলে তারা বিপদে পড়বে। হয়তো এই বিপদের ভয়েই আমাদের গুণীজনেরা প্রাচ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সুড়ঙ্গে সুড় সুড় করে ঢুকে পড়েছেন, ওদিকে সাম্রাজ্যবাদ মুখে হাত চেপে মিটি মিটি করে হেসেছে।

আমাদের আলোচিত মওলানা আকরাম খাঁ উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ঠিকই বুঝেছিলেন। উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতাও তার জানা ছিল। সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে উপনিবেশের সংস্কৃতি দূষিত করে, তাকে উল্টা-পাল্টা বানায়, তাকে নিজের মতো ভাঙে আর গড়ে আর সবশেষে শাসিতদের দুর্বলতার সুযোগে তারা ধ্বনি তোলে তোমাদের শাসিত হওয়াই নিয়তি। প্রাচ্যবাদের এই জ্ঞানতত্ত্বের চক্র আকরাম খাঁ খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করেছিলেন বলেই তিনি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মগত সবদিক দিয়েই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় নেমে পড়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করে

www.pathagar.com

কখনো সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা যায় না– এটাও তিনি ভালো করে বুঝেছিলেন। তাই তিনি তার নিজের আদর্শবাদকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বলা আবশ্যক তার এই আদর্শ অনিবার্যভাবেই ইসলাম। এই কারণেই তাকে প্রাচ্যবাদের জ্ঞানতত্ত্বের কাছে ধরা দিতে হয়নি। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, আকরাম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, সৈয়দ আলী আশরাফ প্রমুখকে তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

আগেই বলেছি আকরাম খাঁর মোস্তফা চরিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার এক উত্তুঙ্গ নজীর। প্রাচ্যবিদদের একসময় প্রাচ্যবিদ্যার বদলে পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইসলামকে হেয় করা, ইসলামের পয়গম্বরের চরিত্র নাশ করা। মওলানা আকরাম খাঁ তার মোস্তফা চরিতের বিরাট অংশ জুড়ে এইসব মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন, অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এবং যুক্তিনিষ্ঠতার মধ্যে তিনি এইসব প্রাচ্যবিদের ভুলগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন এদের লেখালেখি সত্যাশ্রয়ী হওয়া দূরে থাক, পুরোপুরি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কল্পনাজাত। এইসব প্রাচ্যবাদী লেখকরা মনের দিক দিয়ে ছিলেন ঔপনিবেশিক ও ইসলামবিরোধী। এরা লেখক ও ঐতিহাসিকের ছদ্মবেশ ধারণ করে হিংসা-বিদ্বেষ প্রসূত দূরভিসন্ধিগুলোকে সাহিত্য-শিল্পের নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সাঈদ যেমন তার 'প্রাচ্যবিদ্যায়' মূলত পশ্চিমের সাহেব ঔপন্যাসিকদের বিভিন্ন উপন্যাস বিশ্লেষণ করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার মুখ খুলে দিয়েছেন এবং তাদের মনগড়া প্রাচ্যবাদী তত্ত্বের মূল লক্ষ্য যে প্রাচ্যের দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল বের করা তার কথাও জোরে-শোরে বলেছেন, আকরাম খাঁও তার কালে সেই কাজটি করেছেন। তিনি পাশ্চাত্যের লেখকদের কৃত ইসলাম ও তার পয়গম্বরদের নিয়ে বই-পুস্তকে কুৎসা রটনার ধারাটি বিশ্লেষণ করে বলতে চেয়েছেন এগুলো সদুদ্দেশ্যে করা হয়নি। কুরআন, ইসলাম, মুসলমান ও হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে এক সময় ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এসব সাহিত্যের সাহায্যে তারা ইসলামের কদর্যতা, ভ্রান্তি ও নিকৃষ্টতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল। তারা ইসলামের নবীকে একজন ভণ্ড, মিথ্যুক, যাদুকর, ইন্দ্রিয়বিলাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিল। এ সবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের উপর এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছিল। মওলানা আকরাম খাঁর মোস্তফা চরিত ইসলামের উপর পরিচালিত এ রকম হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে এক তুমুল প্রতিবাদের নাম। আকরাম খাঁ লিখেছেন ঃ এই আলোচনার ফলে আমাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে সত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে দুইটি ধারণা দুনিয়ার মানব সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে, 'এছলাম ও মোহাম্মদ' সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করার

www.pathagar.com

সময় পাশ্চাত্যের মনিষী সমাজে তাহার অস্তিত্ব ও পার্থক্য একেবারেই স্বীকৃত হয় নাই। সত্যের অপচয় ও মিথ্যার প্রচারের দিক দিয়া ইহার অধিকাংশ উপকরণই জগতের সাহিত্য ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ অতুলনীয়। (মোস্তফা চরিত)

মওলানা আকরাম খাঁর প্রতিবাদের কথা আমরা মনে রাখিনি এবং সেই প্রতিবাদের মূল্যও আমরা কখনো বুঝতে চেষ্টা করিনি। সাম্রাজ্যবাদের নষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে তার অবস্থানে থেকে সমসাময়িক কম বুদ্ধিজীবীই এমনভাবে বলতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ পারেননি, বঙ্কিম পারেননি, উনিশ শতকের বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু রেনেসাঁর কোন নায়কই পারেননি। আকরাম খাঁ পেরেছিলেন। তিনি অনবরত লিখেছেন, বক্তৃতা করেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন এবং অসাধারণ যোগ্যতার সাথে তিনি তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি ছিলেন অনমনীয় ও অতুলনীয়। বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার একটা বড় কাজ হচ্ছে পশ্চিমের হাতে ইসলামের, মুসলমানের যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক লাঞ্ছনা ঘটেছে তার প্রতিবাদ করা এবং সেই প্রতিবাদের ক্ষেত্র থেকে তিনি কখনো পিছিয়ে আসেননি।

৪

সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সাঈদের বড় কাজ হচ্ছে সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপকে চিহ্নিত করা। কিন্তু সাঈদের সংস্কৃতি চিন্তার অসুবিধার একটি দিক হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গির। সাঈদ অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বুদ্ধিজীবী। একই সাথে পাশ্চাত্যের উদারনীতিক চিন্তা-ভাবনায়ও বিশ্বাসী। সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপকে তিনি নিন্দা করেছেন, কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদের ভিতরে যে দর্শন কাজ করে, সেই দর্শনকে তিনি বিবেচনার বাইরে রেখেছেন। সাম্রাজ্যবাদ যে একটি দর্শন নিয়ে চলে সেই দর্শনকে তিনি আঘাত করতে চাননি। সাম্রাজ্যবাদ একটা দৈত্য, কিন্তু এই দৈত্যের শক্তি তার দর্শন ও বিশ্বাস। ঐ দর্শনের জোরে সে অন্যের সংস্কৃতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, অন্য দেশে গিয়ে সে হানা দেয়, দখল করে। উদারনীতিক সাঈদ তাই পাশ্চাত্যের এই সাম্রাজ্যবাদী দর্শনকে বুঝতে ভুল করেন।

সাঈদ ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করেন, কিন্তু শেখ ইয়াসিনের হামাসকে সমর্থন করেন না। ইরান বিপ্লবের পর বিপ্লবের নায়কদের নিয়ে পশ্চিমী মিডিয়ার অপপ্রচারের তিনি সমালোচনা করেন, কিন্তু ইরান বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রত্যয়কে তিনি গ্রহণ করেন না।

এটা উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা। সাঈদ যে সমস্যার বৃত্ত ভাঙতে পারেননি, আমাদের বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আলী আশরাফ সেই সমস্যাকে ডিঙিয়ে গেছেন। আবার সাঈদের পাশে আলী আশরাফের নাম দেখে আঁৎকে উঠবেন না

www.pathagar.com

কেউ। যোগ্যতার দিক দিয়ে সাঈদের চেয়ে তিনি কম নন। দুর্ভাগ্য আলী আশরাফের, সাঈদের মতো তিনি পশ্চিমী মিডিয়ার নজর কাড়তে পারেননি। সম্ভবত ঐ একটি কারণেই, তিনি যে মুসলমান।

কবি, সমালোচক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আলী আশরাফ বর্তমানকালে বন্দিত ও মর্যাদাবান হয়েছেন বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের ইসলামীকরণের পথিকৃত হিসেবে। এই জ্ঞানের ইসলামীকরণের ধারণা এসেছে মূলত বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও দর্শনের জওয়াব হিসেবে। উপনিবেশের কালে সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে তাদের দর্শন ও মূল্যবোধ দিয়ে উপনিবেশিত দেশের সংস্কৃতি ও চিন্তা-ভাবনাকে দূষিত, বিকৃত ও বিপর্যস্ত করে— তার ধকল এসব দেশের জনগণ আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সৈয়দ আলী আশরাফ মনে করতেন পাশ্চাত্যের সেকুলার ধ্যান-ধারণা, দর্শন মানুষকে শুধু তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির মোহে আবদ্ধ করে, কোন মূল্যবোধ গ্রহণে এটি প্রস্তুত নয়। যে দর্শনের মূলকথা হচ্ছে বস্তুগত সাফল্য তা গ্রহণ করার ফলেই আজও পৃথিবী জুড়ে লুটপাট, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হয়নি। এই অবক্ষয়ের হাত থেকে মানবতাকে রক্ষা করতে হলে মনুষ্যত্বের যে মানদণ্ড ধর্ম আমাদের দিয়েছে তারই আলোকে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞানসমূহের মর্মমূলে ধর্মের মূল্যবোধ কার্যকরী করা চাই। জ্ঞান মানুষকে ক্ষমতা দেয়, ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেনেসাঁর কাছ থেকে আমরা সে গোপন তথ্যটি পেয়েছি। আবার এ কালের আর এক দার্শনিক মিশেল ফুকো দেখিয়েছেন ক্ষমতা কিভাবে জ্ঞানকে ব্যবহার করে। আসলে একটি আরেকটির পরিপূরক। সাম্রাজ্যবাদীরা চায় নিয়ন্ত্রণ। এটা করতে গিয়ে তারা ব্যক্তিকে, দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রিত হতে যারা অসম্মত হয় তাদের উপর নেমে আসে শাস্তি। এই নিয়ন্ত্রণ ভাঙতে বিভিন্ন জন বিভিন্ন পথ বাৎলেছেন। ফুকো গিয়েছেন এক অরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ইতালীয় আন্তনিও গ্রামসি দেখিয়েছেন বিপ্লবের পথ। এডওয়ার্ড সাঈদ বলেছেন রাজনৈতিক প্রতিরোধের কথা।

আমাদের সৈয়দ আলী আশরাফ কি বলেছেন? সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায়ের পিছনে যেহেতু এক নৈরাজ্যকর জ্ঞানের উপস্থিতি বর্তমান, যার ভিতরে কোন মূল্যবোধ নেই, নৈতিকতা নেই, মনুষ্যত্ব ভাবনা নেই তাকেই সরিয়ে দিতে হবে। সেখানে নিয়ে আসতে হবে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নির্ভর জ্ঞান যে অন্যের দেশে হানা দিতে প্ররোচিত করবে না, মানুষকে করে তুলবে না উন্মূল, স্বার্থপর।

ইসলামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত এই Epistemeology বা জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৈয়দ আলী আশরাফ পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞান তত্ত্বকে রুখে দিতে চেয়েছেন। জ্ঞান তত্ত্বের জগতে একালে সৈয়দ আলী আশরাফের প্রস্তাবনা রীতিমত বৈপ্লবিক।

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ সাম্রাজ্যবাদের প্রাচ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সমালোচনা করেছেন, নিন্দা করেছেন সুপ্রচুর। এই জ্ঞানতত্ত্বকে কিছুটা সাংস্কৃতিক, কিছুটা রাজনৈতিক অর্থে প্রতিরোধের কথাও বলেছেন। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই জ্ঞানতত্ত্ব একটা দর্শনজাত ব্যাপার। এটিকে রুখতে আরেকটি বিকল্প দর্শন চাই। উদারনীতিক বুদ্ধিজীবী হওয়ার কারণেই সাঈদ সেটা দিতে পারেননি। সৈয়দ আলী আশরাফ আমাদের সে পথ বাৎলে দিয়েছেন।

৫

এডওয়ার্ড সাঈদকে নিয়ে কাজ করার অসুবিধার কথা বলেছি। এটা ঠিক তিনি যে সুবিধাগুলো রেখে গেছেন তা ফেলনা নয়। কিন্তু তার ফাঁক ও ফাঁকিগুলো বোঝা চাই। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা যদি আমাদের ভিতরের শক্তি তাড়িত না হয় তবে সেটি কখনো শানিত হবে না, অন্যদিকে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাও চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে কখনো এগিয়ে যাবে না। এই জন্যই আমাদের মুন্সী মেহেরুল্লাহ, আকরাম খাঁ ও সৈয়দ আলী আশরাফদের বেশি প্রয়োজন। তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিজীবীতা আমাদের জন্য এক অমূল্য উত্তরাধিকার। তারা তাদের জীবনব্যাপী সাধনায় আমাদের ভেতরের জগতকে উজ্জীবিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের দাপটে আমরা যেন পিছিয়ে না যাই– এই পিছিয়ে না যাবার শিক্ষাটাই তারা আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা যেন সেটা ভুলে না যাই।

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিক ভাবনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

এই মুহূর্তে আমাদের দেশে যে সব যুদ্ধ বিরোধী শান্তি মিছিল ও সমাবেশ আমরা দেখছি এর শ্রেণী ও চরিত্র খুব স্পষ্ট। গণমাধ্যমগুলোতে শান্তি মিছিলের সপক্ষে অংশগ্রহণকারীদের যে ইমেজ গড়ে উঠেছে তা এ রকম ঃ অধিকাংশ শান্তি মিছিলকারীর মুখে দাড়ী, মাথায় টুপি এবং পরনে দীর্ঘ পায়জামা ও পাঞ্জাবী। এ শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ধরন সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের পূর্ব থেকেই আছে। পশ্চিমী মিডিয়া এদেরকেই বলে মৌলবাদী। আমাদের দেশের শহুরে মধ্যবিত্ত, তথাকথিত শিক্ষিত 'আধুনিক' কিংবা প্রগতিবাদীরা এদের দেখে নাক সিটকায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে, মানবতার সপক্ষে এই যে বহুকালের অবহেলিত, লাঞ্ছিত, ধর্মান্ধ ও মধ্যযুগীয় হিসেবে গালপ্রাপ্ত মানুষেরা কেন তাহলে মাঠে নেমেছে? এদের স্বার্থ বা কোথায়? আমরাতো জানি এরা আমাদের পিছু টেনে ধরে রেখেছে, যুগের প্রয়োজনকে অস্বীকার করছে, প্রগতি ও অগ্রসরতার সবরকমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিকাশকে এরা স্তব্ধ করে দিচ্ছে তারা আজ কি করে, কোন শক্তির বলে কিংবা যাদুমন্ত্রের জোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য শক্তির সাথে লড়বার কথা বলছে অথবা সেই লড়বার মতো দার্শনিক বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অর্জন করেছে?

আমাদের দেশে যাদেরকে আমরা শিক্ষিত মনে করি, শয়নে-স্বপনে যারা নিজেদের প্রগতিশীল প্রমাণ করতে ব্যস্ত এদের কাউকেই বড় একটা এ মিছিলে দেখা যায়নি, এমনকি তারা ইরাকে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধেও খুব একটা প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন, শুনিনি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়, এই যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে অহর্নিশ ডন কুইকসোটের মতো ঢাল তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের অবস্থান স্পষ্ট নয়। তালেবানরা যখন বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙে তখন এরাই স্বউদ্যোগে একটি দীর্ঘ বিবৃতি রচনা করে সভ্যতা বাঁচানোর দাবি করেছিল। কিন্তু আজ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যতন্ত্রের তোপের মুখে ইরাকী শিশুরা, বৃদ্ধরা, নারীরা মরছে তখন এর বিরুদ্ধে এ শ্রেণীর কোন নীতিগত প্রতিক্রিয়ার কথা আজও জানা যায়নি। তাহলে কি আমাদের এই উপসংহারই টানতে হবে বৌদ্ধমূর্তি ভাঙায় সভ্যতার মৃত্যু হয় কিন্তু মানুষের মৃত্যুতে সভ্যতার কিছু যায় আসে না।

আমাদের খুব ভাল করে মনে রাখা দরকার এরাই ঘোর ইসলাম বিদ্বেষী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলামী ও তাবেদারী করা এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বলতে এরা বোঝে চোখ বুজে মৌলবাদের বিরোধিতা করা এবং বিনা

www.pathagar.com

সমালোচনায় পাশ্চাত্যের মডেলকে গ্রহণ করা। এদের কাছে উন্নতি মানে সাহেবদের দুনিয়া। শিক্ষা মানে সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেয়া আধুনিক শিক্ষা। আর মৌলবাদের বিরোধিতায় এদের কণ্ঠস্বরতো মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওয়াজকেও ছাড়িয়ে যায়। ইতিহাস মাঝে মাঝে তার ছাত্রদের নিয়ে বড় অদ্ভুত কৌতুক করে। সাম্প্রতিক সময়ের পরিবর্তনগুলো আমরা গভীরভাবে ভেবে দেখেছি কি না বলতে পারবো না। এক সময় ছিল এদেশে কাউকে প্রগতিশীল প্রমাণ করতে হলে অবশ্যই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর নিপীড়িতের পক্ষে কথা বলা আবশ্যকীয় ছিল। ষাটের দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যতন্ত্র যখন ভিয়েতনামে হানা দেয় তখন এ শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি। সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদই। ভিয়েতনামে প্রতিবাদ করা গেলে আফগানিস্তানে, ইরাকে, প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে আমেরিকার নীতির সমালোচনা করতে বাধাটা হচ্ছে কি? নাকি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুনিয়া জুড়ে আজ ইসলামী মৌলবাদীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে আমাদের প্রগতিশীল নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক ধরনের কৌতুককর মানসিক ভীতি কাজ করছে। আসলে এই মানসিক ভীতি এক ধরনের মানসিক দূরত্বও। যা কিছু ইসলাম, ইসলামী নীতি বা সংস্কৃতির সাথে জড়িত তার প্রতি ঘৃণা, অবিশ্বাস, সন্দেহ আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে কলোনির প্রভুরা। আমাদের দেশের শহুরে মধ্যবিত্ত, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আধুনিক বা প্রগতিবাদীরা সে সিলসিলা আজতক বহন করে চলেছে। কারণ এ শ্রেণীর মানসিক গঠনটি তৈরি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক জ্ঞান ও মতাদর্শিক কাঠামোর মধ্যে। তাই চতুর্দিকে আজ এই ঘোরতর ইসলাম বিদ্বেষ ও আমূল ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। সভ্যতার দ্বন্দ্ব নিয়ে মূল আলোচনায় ফেরার আগে এ প্রশ্নটার বিচার হওয়া জরুরি। কারণ আমাদের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা কাজ করছে, যে মতাদর্শিক বিভাজন তৈরি হয়েছে তা আসলে সাম্রাজ্যবাদের কৌশল এবং এই কৌশলকে জিইয়ে রেখে মুসলিম দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীরা আজও তাদের আধিপত্যের ধারা বজায় রেখেছে। সভ্যতার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে আজ মুসলিম দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে এবং সে লড়াইয়ে কার্যত ইসলামপন্থীরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে এ সম্পর্কে সবাই আজ মোটামুটি একমত। কিন্তু এটাও সত্য সভ্যতার দ্বন্দ্বের তত্ত্ব আসলে একটা ঘৃণারই তত্ত্ব এবং পশ্চিমেই এ তত্ত্বের জন্ম ও বিকাশ। ইসলামের বিরুদ্ধে আজ যে আঘাতটা ধেয়ে আসছে সেটাও সেই পশ্চিম থেকে।

সমাজতন্ত্রের অবসানের পর বোধ হয় পাশ্চাত্য নতুন করে ইসলামের সাথে একটা বোঝাপড়া করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এই বোঝাপড়া একটা জঙ্গিরূপ নিচ্ছে এবং পৃথিবী আজ এক নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে। সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব আছে এটা খুব খাঁটি কথা। এখনও সভ্যতার

www.pathagar.com

ইতিহাস অনেকখানি দ্বন্দ্ব ও রক্তপাতের ইতিহাস। কিন্তু এও আমাদের ভুললে চলবে না সভ্যতা কি কেবল সভ্যতার সাথে সংঘাতেই প্রবৃত্ত হয়েছে, সংসর্গ হয়নি, সম্প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা হয়নি এ একেবারে বাজে কথা। সংঘাত আর সংঘর্ষের বাইরে যে দীর্ঘস্থায়ী মানব সম্পর্ক, সীমান্ত পেরিয়ে মানুষের যাওয়া আসা, বোঝাপড়া, প্রীতি-ভালবাসা এর মূল্য একেবারে ফেলনা নয়।

তারপরেও আজকের পৃথিবীর বাস্তবতায় একটা বিতর্ক খুব বেশি প্রামাণিক হয়ে উঠেছে ঃ এসব সংঘাতের মূলে ইসলাম কি একমাত্র দাহ্য পদার্থ? মুসলিম, খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতরা নানারকমভাবে এটিকে গভীরভাবে বিচার করছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ John L. Esposito, Edward Said, Benjamin R. Barber, Samuel P. Huntington, Akbar S. Ahmed, Ziauddin Sardar প্রমুখ। এর কোনটা কোথায় কতটা সত্যের আলো ফেলেছে তা গভীরভাবে বিচার্য। তবে এসব থেকে একটা জিনিস খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজকের বিশ্বব্যবস্থা কতটা জটিল, কতটা হিংসাত্মক, কতটা সহযোগিতা শুন্য ও মর্মবিদারী এবং শেষ বিচারে ইসলাম ও পাশ্চাত্যই আজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দ্বন্দ্বের মূল কেন্দ্রে। সেদিকে এখন আমরা আমাদের মুখ ঘুরিয়ে ধরতে চাই।

২

আগেই বলেছি সভ্যতার সাথে সভ্যতার, সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির সংঘাত নতুন কিছু নয়। এ কালের মত সেকালেও এসব সংঘাত লোকক্ষয়, রক্তক্ষয় এমনকি পুরো একটা সভ্যতাই ক্ষয় করে ফেলেছে। কিন্তু আজকাল সভ্যতার দ্বন্দ্ব বলতে পাশ্চাত্য বনাম ইসলামকেই বোঝায় এবং এ তত্ত্ব এখন পাশ্চাত্যে বেস্ট সেলারের রমরমা কাটতি পেয়েছে।

কোন কোন পশ্চিমী বিশ্লেষক এমনকি সদ্য বিগত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন একবার যুক্তি দেখিয়েছেন আসলে পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের কোন সমস্যাই নেই, যা কিছু সামান্য ভুলবুঝাবুঝি তা ইসলামী উগ্রপন্থার সাথে। এই সরল প্রস্তাবনার সাথে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা কি এত সহজে একমত হবেন? বিগত চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসতো অন্য রকম কথা বলে। ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের সাথে, যে খ্রিস্টবাদের মর্মস্থল থেকে আজকের পশ্চিমী সভ্যতার বস্তুত উত্থান ঘটেছে, তার অম্লমিশ্রিত টানাপোড়েনের সম্পর্ক কারো অজানা নয়। বিশ শতকের ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় আমরা পশ্চিমী ধনতন্ত্র ও উদার গণতন্ত্রের সাথে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সংঘাতের একটা চেহারা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সে সংঘাতের তীব্রতা যত ব্যাপকই অনুভূত হোক না কেন, গভীরতার দিক দিয়ে তা ছিল সামান্য। অন্যদিকে ইসলামের সাথে খ্রিস্টবাদের ঐতিহাসিক কাল থেকেই নিরন্তর ও গভীর অসূয়া কাজ করে চলেছে। এটা সত্য

www.pathagar.com

এ দুটো সভ্যতার মধ্যে সংসর্গ হয়েছে, পারস্পরিক সহাবস্থানও কখনো কখনো সম্ভব হয়েছে কিন্তু তারপরেও এদের ইতিহাস মোটের উপর দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধেরই ইতিহাস। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিশেষজ্ঞ জন এল এসপোসিটোর ভাষায় ঃ...........often found the two communities in competition, and locked at times in deadly combat, for power, land and souls. (The Islamic Threat : Myth or Reality)

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দুটো ধর্মের মানুষের ভাগ্য বড় বেশি ওঠানামা করেছে। কখনো প্রবল গতিতে একটির ওপর আর একটি ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কখনো একটির প্রত্যাঘাতে অন্যটির গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। মনে রাখা দরকার ইসলাম যখন এ পৃথিবীতে আসে তখন কিন্তু খ্রিস্টধর্ম ছয়শো বছরের পুরনো হয়ে গেছে। অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের তুলনায় ইসলাম হচ্ছে নবীনতম এবং এ নবীনার প্রতি সেদিন পুরনো ধর্মগুরুদের নজর মোটেই প্রীতিপূর্ণ ছিল না। এটা অবশ্য সত্য কথা যখনই কোন নতুন চিন্তা, মতাদর্শ ও ধর্মের আবির্ভাব ঘটে তখন তার সাথে পুরনো ব্যবস্থার দ্বন্দ্বই অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ পুরাতন ব্যবস্থা এত সহজে নতুন চিন্তার জন্য পথ ছেড়ে দিতে রাজি হয় না, এমনকি পুরাতন পন্থীরা নতুনকেও গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। খ্রিস্টানদের সেদিনের প্রতিক্রিয়াটা তাই বোঝা কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়। কারণ মুসলমানরা তাদের নবীকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করে, আরো মনে করে ইসলামের আগমনের সাথে অতীতের নবীদের প্রচারিত ধর্মের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা এক ইসলাম বৈরিতায় জড়িয়ে পড়ে।

এই বৈরিতার আরো একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। ইসলাম তার আবির্ভাবের অল্প দিনের মধ্যে খুব দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করে। এক কালে যে সব এলাকায় খ্রিস্টীয় একাধিপত্য ছিল ইসলাম সেখানকার সামাজিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে এবং বলা চলে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মাইনর থেকে খ্রিস্টান ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। নিজের জন্মভূমি থেকে খ্রিস্টান ধর্মের এমনি উন্মূল হয়ে যাওয়ার ঘটনা খ্রিস্টান জগত কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, যে ইসলাম ঐ সমস্ত জনপদে প্রকৃত অর্থে ত্রাণকারীর ভূমিকায় এসেছিল। সিজার ও পোপের চাপিয়ে দেয়া নানা রকম নিষ্ঠুর নিয়মকানুনের ভারে জর্জরিত জনগণ ইসলামের মানবতাবাদী দর্শনকে স্বাগত জানায় এবং বিভিন্ন মতের চার্চ ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। একে অনেকটা গণআন্দোলনের মতো বলা যায়। খ্রিস্টান জগতে এর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাই সেদিনের খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও শাসকরা প্রচার করতে শুরু করে 'ইসলামের প্রসার ঘটেছিল আগুন আর তরবারির মাধ্যমে।' ইসলামের নবীকে তারা 'ভণ্ড' হিসেবে উল্লেখ করে এবং তাঁকে Mahound-লম্পট হিসেবে ডাকতে শুরু করে। ইসলামকে তারা যৌনতার সাথে

www.pathagar.com

গুলিয়ে ফেলে এবং প্রচার করে দেয় এটি বহু নারীর সাথে সংসর্গের অনুমতি দিয়েছে। এভাবেই ইসলামের সাথে বৈরিতা ইউরোপীয় মানসিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। এই বৈরিতা এক সময় পুরো ইউরোপ জুড়ে এক জঙ্গি আবেগের জন্ম দেয় যা ক্রুসেড নামে পরিচিত। ক্রুসেড হচ্ছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। ক্রুসেড শুধু পবিত্র ভূমি দখলের ব্যাপার ছিল না, দুটি সভ্যতার পৃথক জীবনবোধ ও বিশ্বাসের ধরনগুলোও এই অসূয়া নির্মাণে দাহ্য পদার্থ হিসেবে কাজ করেছে।

এটা সত্য ক্রুসেড যোদ্ধারা মুসলমানদের হাত থেকে তাদের পবিত্রভূমি উদ্ধারের জন্য অবিরাম লড়াই চালিয়ে যায়। এ লড়াইয়ের নির্মমতা এত প্রকাণ্ড ছিল যে দ্বিতীয় ক্রুসেডে যখন ইউরোপীয় যোদ্ধারা জেরুজালেম দখল করে নেয় তখন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে ঐতিহাসিকরা লিখেছেন মুসলমানের লাশে জেরুজালেম শহর পুরো ঢেকে যায় এবং মুসলমানের রক্তে পথচারীর পা হাটু পর্যন্ত ডুবে যায়। এই পাষবিকতা ও নির্মমতা থেকে মুসলমানদের ত্রাণ করতে আসেন গাজী সালাহউদ্দীন। তারপরে অবশ্য কিছুদিন মুসলমানরা ইউরোপীয় আধিপত্যকামিতা ঠেকিয়ে রাখে এবং সেই কাজে নেতৃত্ব দেন উসমানী খলিফারা, এরাই পূর্বীয় খ্রিস্টানদের প্রাণকেন্দ্র কনস্টানটিনোপল অধিকার করেন।

পনের-ষোল শতকের দিক থেকে ইতিহাসের চাকা আবার ঘুরতে থাকে। ইউরোপীয়রা মুসলমান দেশগুলোর উপর তাদের আক্রমণ বৃদ্ধি করে। স্পেন থেকে ইউরোপীয়রা ক্রুসেডীয় আবেগে মুসলমানদের উৎখাত করে। অন্যদিকে ইউরোপীয়দের নৌশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তারা মুসলমান দেশগুলোকে একে একে ঘিরে ফেলতে শুরু করে। এরি মধ্যে গ্রীস, ইটালী ও বলকান অঞ্চলের উপর উসমানী খেলাফতের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে রুশীয়রা দুশতাব্দীর তাতার শাসনের অবসান ঘটায়। যদিও তুর্কীরা শেষবারের মতো ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা অবরোধ করে, কিন্তু তা অকার্যকর হয়ে যায় এবং এই অকার্যকারিতার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিকরা বলেন তাদের পশ্চাদপসরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। ইউরোপের হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য ও রুশীয়দের সামরিক অভিযানের মুখে তুর্কী খেলাফত সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং এককালের Scourge of Christendom শীঘ্রই Sick man of Europe এ পরিণত হয়। মুসলমানদের আসল সর্বনাশটা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালী এই ত্রয়ী শক্তি মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে coup de grace -চূড়ান্ত অভ্যুত্থান ঘটায় যা তখনকার মতো ইসলামের অস্তিত্বকে প্রায় বিপন্ন করে তোলে। মাত্র চারটি দেশ সৌদী আরব, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান কোন রকম টলটলায়মান অবস্থায় পাশ্চাত্যের অধীনস্থ হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করে। মুসলিম বিশ্বের বাকী অংশ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্যের পদানত হয়। এই সামরিক পরাজয় মুসলিম

www.pathagar.com

দুনিয়ায় এক দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সেই পরাজয়ের সূত্র ধরে মুসলিম মানসও উপনিবেশিত হয়ে পড়ে। মুসলিম মানসের পশ্চাদ্ধাবন আজ মুসলিম দুনিয়ার প্রধান সমস্যা বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী খেলাফতের অবসান ঘটে এবং সেই খেলাফত নামীয় প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংস ত্বরান্বিত হয় তুর্কী নেতা কামাল পাশার বিশেষ উদ্যোগে। মনে রাখা দরকার খেলাফতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তির বেশ আগে থেকে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক সচলতা স্থবির হয়ে পড়ে এবং তুর্কীদের মধ্যে পশ্চিমীকরণের ঢেউ এসে লাগে। তুর্কী মানসে ইউরোপ আগে আধিপত্য বিস্তার করে, তারপর তাদের সত্যিকার পরাজয় অবধারিত হয়ে ওঠে। ইয়ং টার্কস ও তাদের নেতা কামাল পাশা তাই যুদ্ধের সময় তুর্কী প্রতিরোধ গড়ে তোলায় বড় ভূমিকা রাখলেও যুদ্ধের পর কোন সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। তুরস্ক বহুদিনের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউরোপের সংলগ্ন হয়ে ওঠে। তার পরিচয় তখনকার মতো ইসলাম না হয়ে ইউরোপ হয়ে যায়। তাই চৌদ্দ থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত তুর্কী খেলাফত গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে থাকলেও বিশ শতকের তুরস্ককে স্রেফ পশ্চিমের একটা বশংবদ রাষ্ট্রই বলা চলে। শিকড় ছেড়ে দিলে, ইতিহাস আর ঐতিহ্য থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়লে একটা জাতির কি পরিণতি হয় বিশ শতকের তুরস্কই তার প্রমাণ। আজ তুরস্ক ইইসির সদস্য হওয়ার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর সামনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্যদিকে ইউরোপীয়রা তাকে ফিরিয়ে দেয় প্রত্যাখ্যানের গ্লানি দিয়ে। তুরস্কের এই বিপর্যয়ে উৎফুল্ল এককালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন (১৯২৪) দাম্ভিকতার সুরে যা বলেছিলেন তা যথার্থ ঃ আসল বিষয় হলো তুরস্কের পতন ঘটানো হয়েছে এবং তুরস্ক আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, কেননা আমরা তার আধ্যাত্মিক শক্তি ইসলাম ও খেলাফতকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

অন্যদিকে তুর্কী খেলাফতের ছেড়ে দেয়া বিশাল আরবী ভাষী অঞ্চলগুলো ইউরোপীয় শক্তিগুলোর করদরাজ্য হয়ে ওঠে। আজকের যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যেমন করে বলছে ইরাকীদের মুক্ত করার জন্য তারা যুদ্ধ করছে সেদিনও এই বৃটেন কোন কোন আরব বশংবদ তৈরি করে তাদের বুঝিয়েছিল তুর্কীদের আধিপত্যের জোয়াল থেকে স্বাধীন হবার এই প্রকৃষ্ট সময়। বৃটেনই পয়সা দিয়ে, হাতিয়ার দিয়ে বিদ্রোহী আরব বাহিনী গড়ে তোলে এবং তুর্কী মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরবদের লেলিয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া এই গৃহযুদ্ধকে ঘোষণা করে দেয় এটা নাকি আরবদের স্বাধীনতা আন্দোলন। আরবদের এই গাদ্দারীর ইতিহাস কিছুটা দেখতে পাওয়া যায় T. E. Lawrenceকৃত Seven Pillars of Wisdom গ্রন্থে। তাহলে এক শতকের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় আরবরা দু দুবার স্বাধীনতা (?) পেতে চলেছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে বৃটেন ও ফ্রান্সের

www.pathagar.com

নীল নকশা অনুসারে, এখন আবার একুশ শতকের ঊষালগ্নে এসে সেই বৃটেন ও আমেরিকার কৃপাধন্যে। কিসের স্বাধীনতা, কার স্বাধীনতা, কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এ স্বাধীনতা? সাম্রাজ্যবাদের চাল সেদিনের মতো আজও মুসলমানরা ধরতে পারছে না। এবার বুশ ও ব্লেয়াররা কিন্তু খোলাসা করে বলেননি প্রথমবার আরবদের স্বাধীনতা পাইয়ে দেবার পর কখন তারা কাদের চক্রান্তে পরাধীন হলো, আর এখন কেন এত মারণযজ্ঞের আয়োজন করে তাদেরকে পুনর্বার স্বাধীনতা দেবার প্রস্তুতি চলছে? আসল কথা হচ্ছে আরবরা প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় খেলাফতের বিপর্যয়ের পর তা আর কখনো পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। যদি বা কেউ সে চেষ্টা করেছে আমেরিকা বা বৃটেন তাকে ঝাড়ে বংশে নির্মূল করে দিয়েছে। বাদশাহ্ ফয়সলের কথা চিন্তা করুন। আরবদের নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার এই ষড়যন্ত্র স্ফূর্তি লাভ করেছে, এর একটিই কারণ আরবদের অনৈক্য। এমনকি ফিলিস্তিন বা আজকের ইরাককে নিয়েও আরবদের ঐক্য প্রমাণিত নয়। তাহলে আরবদের নিজেদের দ্বন্দ্বই কি শেষ পর্যন্ত পশ্চিমকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? আরবরা আজ নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে না। মাহাথির মোহাম্মদই ঠিক বলেছেনঃ আজকে মুসলিম বিশ্বের নিজেদের সিদ্ধান্তগুলো বাইরের দেশ থেকে তৈরি হয়ে আসে। এই বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত তৈরি হয়ে আসার নামই তো সাম্রাজ্যবাদ।

আজকের মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ভাষী অঞ্চলগুলোর যে মানচিত্র ও ভৌগলিক সীমানা তাও কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মস্তিষ্ক প্রসূত। বিশ্বযুদ্ধের পর এরাই মধ্যপ্রাচ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে, এসব খণ্ডিত অঞ্চলগুলোর শাসককে তারাই তাদের স্বার্থে মনোনয়ন দিয়েছে আবার কালক্রমে এদের একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে উস্কেও দিয়েছে এরাই। মুসলিম বিশ্বের অনৈক্যই যাদের কাম্য, কৌতুকের বিষয় হলো তাদেরই ইংগিতে একসময় তৈরি হয় আরবলীগ। তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক উপনিবেশের দিন শেষ হওয়ার পর বৃটেন মনে করেছিল আরবদের মধ্যে অন্তত তার মানসিক উপনিবেশটা টিকে থাক। আরব লীগ তাই আরবদের ঐক্য আনতে পারেনি, যেমন পারেনি মুসলমানদের ঐক্য আনতে ওআইসি।

এটা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার বিশ্বযুদ্ধের পর খেলাফতের বিপর্যয়ের সাথে মুসলমানদের আর কোন Core state রইলো না। Core state বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিকভাবে অগ্রসর, সামরিকভাবে শক্তিশালী এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংহত ও সৃষ্টিশীল এমন একটা রাষ্ট্র যা শুধু নিজের অস্তিত্বকেই জানান দেয় না, অন্যান্য দুর্বল প্রতিবেশীকে নানাভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করতে পারে। আজকে খ্রিস্টানদের Core state হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেন, হিন্দুদের জন্য ভারত, বৌদ্ধদের জন্য চীন ও জাপান। কিন্তু মুসলমানদের এরকম কিছুই নেই। সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তান বা ইরাকের

www.pathagar.com

বিপর্যয় ও ধ্বংসকামিতার কথা সামনে রেখে এ কথা বলা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে কোন রাষ্ট্র যদি Super power হিসেবে বিরাজ করতো তবে মার্কিনীরা তাদের আগ্রাসনের আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বাধ্য হতো।

একইভাবে ইসলামের মধ্যে কোন Core state না থাকায় মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ও পরিকল্পনাহীনভাবে অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে কিন্তু বৈশ্বিকভাবে তার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। এরকম কোন Core state থাকলে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিরোধ যুদ্ধগুলো সমন্বয় করা সম্ভব হতো এবং অমুসলিমদের সাথে একটা বোঝা-পড়া করা যেত। এ সব প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানরা আজ স্থানীয়ভাবে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় প্রায় কোন সাহায্য ব্যতিরেকে টিকে থাকার চেষ্টা করছে এবং পরাধীনতাকেই একরকম ললাট লেখা হিসেবে মেনে নিয়েছে। ফিলিস্তিন, চীনের উইঘুর, ফিলিপাইনের মরো, রাশিয়ার চেচেন ও ভারতের কাশ্মিরী মুসলমানরা এই ট্রাজেডির শিকার। একে আজকাল বলা হচ্ছে 'fault line conflicts' বা 'Islam's bloody border' যা মুসলিম সভ্যতাকে প্রায় ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে।

অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের পর খ্রিস্টীয় বিশ্বের বড় লাভ হলো আরবদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের 'পবিত্র ভূমি' জেরুজালেমকে তারা পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়। ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ও তার জন্য খ্রিস্টীয় জগতের অকুণ্ঠ সমর্থনের পিছনে আছে শত শত বছরের ঐতিহাসিক ঘৃণা ও বিরোধের দাহ্যিক ভূমিকা। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খ্রিস্টীয় বিশ্ব সেই ঐতিহাসিক ক্রুসেডের আগুনকে নতুন করে উস্কে দিয়েছে। এতে পবিত্র ভূমি দখলে রাখার খ্রিস্টীয় বিশ্বের উদ্দেশ্য হয়তো এক প্রকার হাসিল হয়েছে, কিন্তু ক্রুসেডের আগুন নেভেনি। আজকের ক্রুসেডের উদ্দেশ্য তাই প্রসারিত হয়েছে একদিকে আরবদের সম্পদ তেল ও গ্যাস দখলের জন্য, অন্যদিকে তাদেরকে স্থায়ীভাবে পদানত করে রাখার জন্যও।

৩

ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের দ্বন্দ্বকে লেনিন বলেছিলেন ভূমি দখলের যুদ্ধ। এখানে কে কাকে আগ বাড়িয়ে যাবে, কে কাকে দাবিয়ে রাখবে সেটাই বিচার্য। লেনিনের ভাষায় ঃ Kto? Kvo? who is to rule? who is to be ruled?

লেনিন এ দ্বন্দ্বের বহিরাংগিক দৃশ্যই দেখেছিলেন বলে মনে হয়, এর অন্তর্গত চরিত্র বুঝবার চেষ্টা করেননি। পবিত্র ভূমি দখলে রাখার পিছনে খ্রিষ্টানদের একটা আত্মিক ব্যাপার আছে অবশ্যই এবং যুগ যুগ ধরে মুসলিম-খ্রিস্টান দ্বন্দ্বে ক্রুসেডের এই ধর্মীয় সত্তাটি কখনো মুছে যায়নি। কিন্তু আজকে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে খ্রিস্টান বিশ্বের যীশুর জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা যখন সফল হয়েছে তখন কেন এই যুদ্ধ চলছে, কেন আফগানিস্তান-ইরাক জ্বলছে? একুশ শতকের এই ক্রুসেডকে বুঝতে হলে পবিত্র ভূমি দখলের বাইরেও যে অন্তর্লীন কারণ আছে সেটাও যাচাই করা জরুরি। মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন একটা কারণ অবশ্যই কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ দুটি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থান। দুটির বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জীবনচেতনা এমনকি ভালমন্দের ধারণাও ভিন্ন ধরনের। মুসলমানদের বিশ্বাস ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান, এখানে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ মূল্যহীন। অন্যদিকে বর্তমান কালের পশ্চিমী খ্রিস্টীয় ধারণা বেড়ে উঠেছে সিজার ও পোপের পৃথক অবস্থানের ধারণার মধ্যে।

দুটি সভ্যতার মধ্যে কতকগুলো সাদৃশ্যও আছে। এই আপাত সাদৃশ্য কিন্তু বাস্তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ও বিবাদের উৎসও হয়ে উঠেছে। দুটিই হযরত ইব্রাহীমের উত্তরসুরীভূক্ত ধর্ম, দুটিই পৃথিবীকে আমরা ও তারা এই দ্বৈততার (Dualistic) ধারণার মধ্যে বিবেচনা করে, দুটিই বিশ্ববিস্তারী (Universalistic), দুটিই একমাত্র সত্য পথের দাবিদার এবং মনে করে সকল মানুষ এটির মধ্যে ত্রাণ পেতে পারে। উভয়ই মিশনারী প্রকৃতির, এরা বিশ্বাস করে সকল অবিশ্বাসীকে তাদের নিজ ধর্মে দীক্ষিত করা নৈতিক কর্তব্য। এই মৌলিক পার্থক্য চেতনাকে যুগে যুগে নানাভাবে উভয় সভ্যতাভূক্ত জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাযুক্তিক পরিবর্তন ও উৎকর্ষতা এবং ধর্মীয় আবেগ প্রভাবিত করেছে অবশ্যই। সাম্প্রতিক কালের এই দ্বন্দ্ব আবার দুটি বিশেষ দিককে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি লাভ করছে। একদিকে ক্রমজাগ্রত মুসলিম চেতনা, অন্যদিকে মুসলিম সমাজে ক্রমহ্রাসমান পশ্চিমের মতাদর্শিক আবেদন। কলোনির শাসন মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে এক প্রকার বিধ্বস্ত ও বিকৃত করে ছেড়েছিল বলা যায়। কলোনির সেই ভস্মস্তূপ থেকে মুসলিম সমাজে এখন একটা পুনরুত্থান প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, যা মুসলমানকে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পশ্চিমের বিপরীতে নতুন একটা আত্মবিশ্বাস এনে দিচ্ছে। মুসলিম সমাজের এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা মুসলিম মানসের পশ্চিমীকরণের বিরুদ্ধে, যাকে বলা হচ্ছে 'ঘারবজাদেগী' বা 'Westoxication of Muslim Societies', একটা বড় ভূমিকা রাখছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রগতি মানেই মুসলিম সমাজের পশ্চিমীকরণকে আদর্শ পন্থা বলে বিবেচনা করা হতো। আশি ও নব্বইয়ের দশকে এর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য যে ইসলামের অনিবার্য বন্ধু নয় একথা শুধু আজ নব-অভ্যুত্থিত মুসলিম জনতার কথা নয়, পাশ্চাত্য প্রভাবিত, সেকুলার চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাসী মুসলমানরাও স্বীকার করতে শুরু করেছেন। আমি মরক্কোর প্রগতিশীল ও উদারপন্থী লেখিকা বলে পরিচিত ফাতিমা মারনিসির Islam and Democracy থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। পাশ্চাত্যের প্রিয়ভাজন বলে পরিচিত এই

www.pathagar.com

মহিলাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন ঃ

The West is militaristic and imperialistic and has traumatized other nations through colonial terror (pp.3,9). Individualism, the hallmark of Western culture, is the source of all trouble (p.8). Western power is fearful. The West alone decides if satellites will be used to educate Arabs or to drop bombs on them........ It crushes our potentialities and invades our lives with its imported products and televised movies that swamp the air waves........ [It] is a power that crushes us, besieges our markets, and controls our merest resources, initiatives, and potentialities. That was how we percieved our situation, and the Gulf War turned our perception into certitude (pp.146-147). The West creates its power through military research and then sells the products of that research to underdeveloped countries who are its passive consumers. To liberate themselves from this subservience, Islam must develop its own engineers and scientists, build its own weapons and free itself from military dependence on the West. (pp. 43-44).

এই আত্মচেতনা একদিনে আসেনি। পাশ্চাত্যের খলচরিত্র, স্ববিরোধী ভূমিকা, ইসলামকে পদানত করে রাখার পাশ্চাত্যের গোপন অভিপ্রায় মুসলিম জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এর একটা কারণ মুসলিম সমাজে এখন শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি তাদের চোখ খুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি, পারস্পরিক সংসর্গ ও দেশবিদেশে যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি হওয়ায় মুসলিম সমাজের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র এসে পড়ছে, যা তাদের অধিকতর সচেতন করে তুলছে। সৌদী আরবের প্রিন্স বন্দর বিন সুলতানের একটি উক্তি এখানে প্রাসংগিক হবে বলে উল্লেখ করছি ঃ

'Foreign imports' are nice as shiny or high-tech 'things.' But intangible social and political institutions imported from elsewhere can be deadly- ask the Shah of Iran.......... Islam for us is not just a religion but a way of life. We Saudis want to modernize, but not necessarily westernize. (Bandar bin Sultan, New York Times, 10 July 1994)

এটা সত্য বিশ শতকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত সৌদী আরবেও পশ্চিমীকরণের ধাক্কা এসে লেগেছে এবং এই ধাক্কা এই দেশটির পক্ষেও পুরোপুরি হজম করা সম্ভব হয়নি। তবুও প্রিন্সের এই উক্তি পশ্চিমীকরণের বিরুদ্ধে এক

www.pathagar.com

ধরনের ক্ষেদোক্তি এবং তার এই বিবৃতি নিছক পশ্চিমের প্রতি ঘৃণার পরিচায়ক নয়, এটি তার সংস্কৃতি চেতনারও ইংগিত দেয়। এই আত্মচেতনা আজ কোন না কোনভাবে পুরো মুসলিম দুনিয়াকে নাড়া দিচ্ছে। কলোনির কালে সত্যি কথা বলতে কি মুসলমানরা নানা দলে-মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ছল ছুতোয় আটকে মুসলমানরা নানা রকম জাতীয়তাবাদ ও গোত্রীয় প্রেষণায় আটকে গিয়েছে। কখনো কখনো নিরন্তর ভ্রাতৃবিবাদ ও ভ্রাতৃক্ষয়ের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং তার ঘেরাটোপ থেকে আজও তারা পুরোপুরি মুক্ত হয়েছে বলা যাবে না।

তবে এই 'ঘারবজাদেগী' থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এখন একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। জাতিক, রাষ্ট্রিক কিংবা ভাষিক পরিচয়ের বাইরে ইসলাম এখন মুসলমানদের পরিচয় যোগাচ্ছে, এই চেতনার নাম হচ্ছে উম্মাহ্ বা বৃহত্তর ইসলামী জাতীয়তাবাদ। এই উম্মাহ্র পুনরুত্থান আজ একটা বৈশ্বিক ঘটনা। এর সাথে প্রোটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন আন্দোলনের তুলনা করা চলে। ইউরোপের রিফরমিস্টরা যেমন করে সমকালীন খ্রিস্টান সমাজের সংস্কার চেয়েছিলেন, স্বসমাজের জড়তা, সৃষ্টিহীনতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তেমনি করে Resurgent Islam বা পুনরুদীয়মান ইসলামের প্রবক্তারাও আজ মুসলিম সমাজের সংস্কার চান, তারা আজ এর অভ্যন্তরস্থ দুর্নীতি, অনাচার ও জড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছেন। হাসান আল তুরাবীর ভাষায় ঃ

The awakening is comprehensive-it is not just about individual piety; it is not just intellectual and cultural, nor is it just political. It is all of these, a comprehensive reconstruction of society from top to bottom. (Islamic Awakening's Second wave)

আগেই বলেছি কলোনির যুগে মুসলিম সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমদিকে পশ্চিমের ধাক্কায় ইসলামের বৌদ্ধিক-নৈতিক রূপটিও কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সেদিন মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্বও পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত আদর্শের ধ্বজাধারী হিসেবে আবির্ভূত হয়, এমনকি পশ্চিমের বিরোধিতায় জাতীয় আন্দোলনের সময় পশ্চিমের উদার নৈতিক জাতীয়তাবাদের কৌশল গ্রহণ করে। বিশ শতকের একটা সময় দেখা গেল মুসলিম এলিটরা সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসীয় চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং পশ্চিমী ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এটিকে জাতীয়তাবাদের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, মার্ক্সবাদ থেকে চীনের পশ্চাদপসরণ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপর্যয় আদর্শিক ক্ষেত্রে একটা চরম শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। এটা সত্য পশ্চিমী সরকার ও সংস্থাগুলো এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিও অর্থডক্স গণতান্ত্রিক ও

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে এসব ফাঁক ফোকর পূরণ করতে চাচ্ছে, কিন্তু মুসলিম সমাজে এর প্রতিক্রিয়া কোনভাবেই আর অনুকূল হবে বলে মনে হয় না। কমিউনিজম নামে এক ধর্মহীন খোদার উত্থান ও যুগপৎ পতন তারা দেখেছে এবং বর্তমানে কোন নতুন ধর্মহীন খোদার অনুপস্থিতিতে তারা প্রকৃত ইসলামের কাছে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পেতে চাইছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ (Religious Nationalism) এখন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের (Secular Nationalism) জায়গাগুলোর দখল নিয়ে নিচ্ছে। এ প্রক্রিয়াকে পাশ্চাত্যের কোন কোন ইসলাম বিশ্লেষক বলেছেন Re-Islamization. Gilles Kepel এর মতে ঃ

Re-Islamization from below is first and foremost a way of rebuilding an identity in a world that has lost its meaning and become amorphous and alienating. (Revenge of God)

অন্যদিকে এ কালে সাম্রাজ্যবাদীদের সহমর্মী ইসলাম বিশ্লেষক Bernard Lewis যা বলেছেন তা অনেকটা ইকবাল থেকেই ধার নেয়া বলে মনে হয় ঃ a recurring tendency, in times of emergency, for Muslims to find their basic identity and loyality in the religious community-that is to say, in an entity defined by Islam rather than by ethnic or territorial criteria. (Islamic Revolution)

সবচেয়ে মজার কথা লিখেছেন Regis Debray। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মুসলিম আমজনতার তেমন কোন উপকার হয়নি, উল্টো প্রান্তিক জীবন যাপনে বাধ্য হওয়া এই জনতা ইসলামের মধ্যে এখন খুঁজে পাচ্ছে মানসিক, সামাজিক, কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুগত সহযোগিতার দিক নির্দেশনা। ধর্ম আর এখন আফিম নয়, এই দুর্বল, কুরআন শরীফে যাদের বলা হয়েছে মুস্তাদাফীন, তাদের জন্য ভিটামিনেরও কাজ করে ঃ Religion for them is not the opium of the people, but the vitamin of the weak. (God and the Political Planet)

আজ মুসলিম দুনিয়ায় যে পুনরুত্থান প্রচেষ্টা লক্ষণীয় তা চরিত্রগতভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই Anti-Secular ও Anti Western। এই পশ্চিম বিরোধিতা মানে কিন্তু আধুনিকায়নের বিরোধিতা নয়, তারা সোচ্চার পশ্চিমের আত্মা ধনতন্ত্র, ভোগবাদ ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে। তারা কখনোই মুসলিম দুনিয়ায় নগরায়ন, শিল্পায়ন, পুঁজির বিকাশ, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি সে অর্থে তারা কখনোই অনাধুনিক নয়। সিঙ্গাপুরের জনপ্রিয় নেতা লি কুয়ান ইউ যেমন করে বলেছিলেন ঃ

They accept modernization and the inevitability of science and technology and the change in the life styles they bring, but

www.pathagar.com

they are unreceptive to the idea that they be Westernized. (Zakaria, conversation with Lee Kuan Yew)

হাসান আল তুরাবীর মতামতও প্রায় একই রকম ঃ

Neither nationalism nor socialism produced development in the Islamic world. Religion is the motor of development, and a purified Islam will play a role in the contemporary era comparable to that of the protestant ethic in the history of the West. Nor is religion incompatible with the development of a modern state. (Islamic Awakening's Second Wave)

ইসলাম পন্থীদের আন্দোলনে তাই দ্রুতগতিতে মুসলিম দুনিয়ায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এবং লক্ষণীয় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তারা তাদের বাণীকে সম্প্রসারিত করছেন। ইসলাম পন্থীরা আধুনিকতারই সন্তান এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করে তারা আধিপত্যকামী পশ্চিমী শক্তির মোকাবেলা করতে চাইছেন। এই ইসলামী পুনরুজ্জীবন তাই পশ্চিমের সাথে, পশ্চিম প্রভাবিত দেশীয় এলিটশ্রেণীর রাজনীতি, সংস্কৃতি ও নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ভাল করে বোঝা দরকার এই রিসার্জেন্ট বা রিফর্মিস্ট ইসলাম কিন্তু পশ্চিম ও তার অবক্ষয়িত সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু আধুনিক টেকনোলজীকে নয়। আসলে এ হচ্ছে 'ঘারবজাদেগীকে' পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান। মুসলমানরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এবার পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার পালা এবং তার প্রক্রিয়া রিফর্মিস্ট ইসলামের নেতৃত্বে হতে চলেছে। এখন বলার সময় ঃ We will be Modern, but we would'nt be you.

৪

ইসলাম যখন পাশ্চাত্যের শেকল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লড়াই শুরু করেছে, ঠিক তখন পাশ্চাত্যও উঠেপড়ে লেগেছে তার চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, বিশ্বাসের ধরন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বায়িত করতে, তার সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক শ্রেষ্ঠত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদনীতির প্রসার ঘটিয়ে অনৈক্য ও দ্বন্দ্বকে জিইয়ে রাখতে এবং সেই দ্বন্দ্বে শালিশী করবার জন্য খলনায়ক হিসেবে উপস্থিত হওয়া পাশ্চাত্যের এখন খুব একটা প্রিয় কাজ হয়ে উঠেছে। আজকের সভ্যতার দ্বন্দ্বটা বুঝতে হলে ঠিক এ জায়গায় আলো ফেলা জরুরি।

সভ্যতা হিসেবে পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি ও অর্জন তর্কাতীত। স্বাভাবিকভাবে ইসলামী সভ্যতার উপর কখনো কখনো পাশ্চাত্যের প্রভাবটা হয় ভয়ানকরকমভাবে ক্ষতিকারক ও স্থায়ী। এটা সত্য পাশ্চাত্যের শক্তি ও সংস্কৃতির

www.pathagar.com

সংসর্গে নীরব আত্মসমর্পণের চেয়ে এখন মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াটাই বেশিরকমভাবে দৃশ্যমান। কলোনির কালে মুসলমানরা প্রায় কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি। এখন মুসলিম দেশগুলোর শক্তি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমী আদর্শের কোন রকম দীর্ঘস্থায়ী সুফল না পাওয়ায় পশ্চিমী সংস্কৃতির আবেদন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। অন্যদিকে মুসলমানরাও নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে আত্মচেতনা ও জাগরণের পথ তালাশ করতে লেগেছে। দ্বন্দ্বটা তাহলে এখন এ জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছেঃ একদিকে পশ্চিমী সংস্কৃতির বিপণন ও প্রসারের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র যেমন উঠে পড়ে লেগেছে তেমনি একালের ইসলামের প্রতিরোধের মুখে সেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম বিদ্বেষ ও ক্রোধ পৌনপৌনিক হারে স্ফীত করে তুলছে।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর পশ্চিমের আত্মবিশ্বাস যেন মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকারান্তরে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে তাদের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই শেষ বিচারে বিজয়ী হয়েছে। এটিই হচ্ছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একমাত্র আদর্শ। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন তাই মনে করে অপশ্চিমী সভ্যতাগুলো বিশেষ করে ইসলামের উচিত পশ্চিমের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, আইনের শাসন প্রভৃতি আত্মস্থ করে নেয়া। দুর্বল রাষ্ট্র ও সভ্যতাগুলো হয়ত কোন না কোনভাবে পশ্চিমের দাপটের মুখে পদানত হতে পারে কিন্তু ইসলাম সামগ্রিকভাবে পশ্চিমীকরণের বিরোধী। আমাদের মনে রাখা চাই পশ্চিমের কাছে যা বিশ্বজনীনতা, ইসলামের কাছে তা সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। পশ্চিম আজ তার আধিপত্য কায়েম রাখবার জন্য তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা হিসেবে চালাতে চাইছে এবং পশ্চিম তার সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়কে একটা বৈশ্বিক বৈধতা দেবার চেষ্টা করছে। একটা উদাহরণ দেই। পাশ্চাত্য আজ কোন না কোন ভাবে চাইছে অপশ্চিমী বিশ্বের অর্থনীতিকে একটা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে ফেলে দিতে যেখানে সে সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। লক্ষ্য করুন বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আজকের যুক্তরাষ্ট্র এ কাজটিই করছে এবং নিজের অর্থনৈতিক নীতি ও স্বার্থকে একচেটিয়াভাবে দুর্বল দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। Georgi Arbatov আই এম এফ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে তাই যথার্থ বলেছেন ঃ Neo-Bolshevics who love expropriating other people's money, imposing undemocratic and alien rules of economic and political conduct and stiffling economic freedom. (Georgi Arbatov, "Neo-Bolsheviks of the I.M.F.", New York Times, 7 May 1992)

www.pathagar.com

পশ্চিমের এই মোনাফেকী, স্ববিরোধিতা ও দ্বিমুখী চরিত্র আজ অপশ্চিমী বিশ্বের কাছে দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যে সব পশ্চিমী এজেন্ডা আজ দ্রুত অপশ্চিমী বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে তার তিক্ততা বাড়িয়ে তুলেছে তাহলো নিরস্ত্রীকরণের একতরফা নীতি, গণতন্ত্রের দ্বিমুখী চরিত্র এবং বহির্গমন আইনের কড়াকড়ি নিয়মসমূহ।

পাশ্চাত্য চায় বিশ্বজুড়ে তার সামরিক একাধিপত্য এবং এর বিরুদ্ধে সে কোন চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে একটুও রাজি নয়। এজন্য সে তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশগুলোকে নিরস্ত্রীকরণের নীতির মাধ্যমে পুরোপুরি দাবিয়ে রাখতে চায়। তার মানে আমার কাছে যত খুশি গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র থাকুক তা সে আনবিক, রাসায়নিক, বায়লজিক্যাল যাই হোক না কেন তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু অন্যরা সেটা রাখতে পারবে না। আজকের ইরাকের কথা ভাবুন অথবা ইরান কিংবা উত্তর-কোরিয়ার কথা। নিরস্ত্রীকরণের নীতি এখানে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা চাই কিন্তু পাশ্চাত্যের সহমর্মী ইসরাইলের ক্ষেত্রে সে নীতির প্রয়োগযোগ্যতা একেবারে নেই বললেই চলে। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের তত্ত্বতো এখন একেবারেই অকেজো ও হাস্যকর হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য প্রায়শই অন্য সভ্যতাভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে তাদের সমাজে বিকশিত মানবাধিকারের ধারণা ও গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ গ্রহণের সদুপদেশ দেয়। সত্য কথা বলতে কি এই গণতন্ত্র তাদের কাছে কোন চিরন্তন মূল্যবোধ না, এটিকে তারা রাজনৈতিক অভিসন্ধি থেকে মারণাস্ত্রের মত মাঝে মাঝে ব্যবহারও করে। চীনের সাথে সম্পর্কের কথা উঠলে তারা মানবাধিকারের প্রশ্ন তোলে কিন্তু সৌদী আরবের ব্যাপারে তাদের মুখে রা নেই। গণতন্ত্র ঠিক আছে, কিন্তু সেই গণতন্ত্রের ফলে যদি মৌলবাদীরা ক্ষমতায় আসে তবে তাদের কাছে তখন সামরিক বা অন্য কোন একনায়কই প্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই একনায়ক দিয়ে মৌলবাদী গণতন্ত্রীদের ঠেকানো না পর্যন্ত পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের শিক্ষকদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। আলজেরিয়ার কথা ভাবুন। আজকের মধ্যপ্রাচ্যের শেখতন্ত্রগুলো টিকিয়ে রেখেছে পাশ্চাত্যের এই সব গণতন্ত্রের পূজারীরা। শেখতন্ত্রগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের অবাধ্য হয়ে উঠছে না ততক্ষণ তাদের গণতান্ত্রিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার আগ্রহ পাশ্চাত্যের আদৌ নেই। পাশ্চাত্যই চায় না, মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র আসুক, কারণ সেখানে কোন জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্যের প্রভাব আর থাকবে না। সুতরাং এটা পরিষ্কার কেন জরাজীর্ণ ও অবক্ষয়ী শেখতন্ত্রগুলো পাশ্চাত্যের এত প্রিয়।

এবার আসা যাক অন্য একটি দিকে। পাশ্চাত্য তার সংস্কৃতি বহির্ভুত লোকজনকে কি একই রকমভাবে বিচার বিবেচনা করে? যে পাশ্চাত্য অহর্নিশ আমাদের মানবাধিকার আর মানবতার সবক দিচ্ছে সে কিন্তু পাশ্চাত্য বহির্ভূত

www.pathagar.com

দরিদ্র পীড়িত লোকজনকে তার বিপুল সম্পদের একটি সামান্য অংশও দিতে রাজি নয়। এইড বা গ্রান্টের নামে পৃথিবীর দারিদ্র্য পীড়িত মানুষকে পাশ্চাত্য যেটুকু করুণা করে তা দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়, উল্টো এটি দারিদ্র্য স্থায়ী করার কৌশল হিসেবে কাজ করে। দরিদ্র দুনিয়ার কেউ যদি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সুবিধার সামান্য সুযোগ নেয়ার জন্য সে দেশে ঢুকে পড়ে তবে বহির্গমন আইনের দৈত্য তাকে পেঁচিয়ে ধরে। আজকের পাশ্চাত্য দরিদ্র দুনিয়া থেকে আগত কোন রিফিউজী বা মুহাজিরকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, উল্টো তাদের ঠেকানোর জন্য যাবতীয় যত ব্যবস্থা আছে তা কার্যকরী করে তোলার কথা ভাবছে। একদিকে বলা হচ্ছে Universal Civilization-এর কথা অন্যদিকে নিজেদের সাংস্কৃতিক সমসত্বতা (Homogenization) টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য কাউকে তাদের দেশে ঢোকবার মতো অনুমতি যাতে না দেয়া হয় তার সবরকমের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা, মোনাফেকী যার মজ্জাগত খাসলত হয়ে উঠেছে।

ইসলামকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য পাশ্চাত্যের যে তিনটি কৌশলের কথা বললাম এগুলোকে স্থায়ী ভিত্তি দেয়ার জন্য পাশ্চাত্য কতকগুলো অবকাঠামো গড়ে তুলেছে এবং এই অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণ ভারও রয়েছে তার হাতে। এই পৃথিবীর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত তা এই কাঠামোগুলোকে ব্যবহার করেই পাশ্চাত্য এখন পর্যন্ত সম্ভব করে তুলছে। এটা সত্য পশ্চিমী সভ্যতারই আজ কেবলমাত্র অন্য সভ্যতা বা ভূখণ্ডে কোন না কোন স্বার্থ আছে এবং অন্য সভ্যতা বা ভূখণ্ডের রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও আছে তার। এমনকি কতক ক্ষেত্রে অন্য সভ্যতাভুক্ত দেশের নিরাপত্তা কিংবা অর্থনৈতিক স্থিরতাও নির্ভর করে পাশ্চাত্যের উপর। Jeffery R. Barnett দেখিয়েছেন এই গ্রহের বহুমুখী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার উপর প্রবল শক্তিধর পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। পাশ্চাত্য আজ একাধারে ঃ

- আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাদির মালিক ও পরিচালক
- সকল হার্ড কারেন্সীর নিয়ন্ত্রক
- পৃথিবীর পণ্যসমূহের প্রধান ক্রেতা
- পৃথিবীর অধিকাংশ পরিশোধিত মালামালের সরবরাহকারী
- আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারের প্রধান কর্তা
- যে কোন সমাজের নৈতিক নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারে পারঙ্গম
- প্রবল সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষমতাসম্পন্ন
- সমুদ্র পথের নিয়ন্ত্রক
- সর্বাধুনিক প্রাযুক্তিক গবেষণা ও উন্নয়নের পরিচালনাকারী
- সর্বাধুনিক প্রাযুক্তিক শিক্ষার ব্যবস্থাপক

www.pathagar.com

০ মহাশূন্যে প্রভাবশীল
০ মহাশূন্য যান তৈরিতে অগ্রগামী
০ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক
০ হাইটেক অস্ত্রের প্রধান নির্মাতা

এই রকম নানা ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অগ্রগামিতা ও প্রবলতা অনস্বীকার্যভাবে অনুভূত হলেও মুসলিম দুনিয়ার শক্তি ও সামর্থ্য পাশ্চাত্যের আধিপত্যের মধ্যেই মাথা তুলতে চাইছে, কলোনির যুগে যা প্রায় অভাবনীয় ছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তেল আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মুসলমানদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ আসে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই আজ পেট্রোডলার বিশ্ব অর্থনীতিতে একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। ৭৩ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর বাদশাহ ফয়সলের নেতৃত্বে আরবরা যে তেল অস্ত্র প্রয়োগ করে তার কথা পাশ্চাত্যের অনেকদিন মনে থাকার কথা।

এটা সত্য অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিকভাবে মুসলিম দুনিয়া পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে, কিন্তু এই সময়ে কলোনির তুলনায় মুসলিম দুনিয়ার অর্জন একেবারে ফেলনা নয়। পাকিস্তানের মত দেশ আনবিক শক্তি অর্জন করেছে, এখন ইরানও সেদিকে এগুচ্ছে। মালায়েশিয়ার মত দেশ সম্পূর্ণ দেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু এটুকুই কি যথেষ্ট? পাশ্চাত্যের আধিপত্যকামিতা ঠেকাতে যেটা জরুরি প্রয়োজন সেটা হলো মুসলিম জনগণের মধ্যে নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই ঐক্য অর্জন হতে পারে ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে অথবা বর্তমানের ওআইসিকে ন্যাটোর মতো ক্রিয়াশীল করে তোলা, যার ফলে মুসলমানদের একটা কমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। যেখানে পাশ্চাত্যের আধিপত্যের মুখে কোন মুসলিম দেশ আক্রান্ত হলে সদস্য দেশগুলো যৌথভাবে সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার জন্য জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এর ফলে মুসলিম দেশগুলোর core state এর অভাব পূর্ণ হবে এবং বর্তমানের নেতৃত্বের সংকট মোচনও দ্রুততা লাভ করবে। কিন্তু এর জন্য যেটা দরকার সেটা হলো মুসলিম নেতৃত্ব ও জনগণের অসীম কোরবানী। ব্যক্তিস্বার্থ, ভ্রাতৃবিবাদ ও গৃহদাহ ভুলে গিয়ে এবং ভাষিক, ভৌগলিক ও জাতপাতের তফাৎ মোচন করে ইসলামের পরিচয়ে একটি এককেন্দ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি। মুসলমানদের সামনে বর্তমানে এর কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় আজকের পশ্চিমী সভ্যতা যাকে মোহাম্মদ আসাদ প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন তাকে মুসলমানরা কোনক্রমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

www.pathagar.com

কলোনির কালে ইসলাম পশ্চিমী সভ্যতার দ্বারা আক্রান্ত ও পদানত হয়। এতকাল ইসলামের সাথে পশ্চিমের সংসর্গ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, অনেকক্ষেত্রে উন্নত প্রাযুক্তিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নিপুনতার ভিত্তিতে পরিচালিত। এই প্রথম ইসলাম পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের সামনে ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মুখে এক নতজানু অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে মুসলিম সমাজে এক বড় রকমের ভাঙচুর ও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়। আর্নল্ড টয়েনবী তার বিখ্যাত A Study of History-তে দেখিয়েছেন মুসলিম সমাজ দুভাবে সেদিন পশ্চিমের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। একদল ছিল যারা পশ্চিমী সভ্যতাকে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর ও দুষণীয় বিবেচনা করে, পশ্চিমের সামরিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে ঠেকানোর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করে এবং নিজেদের আত্মপরিচয় বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইসলামের মূলনীতির কাছে মুসলমানকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানায়। টয়েনবী এদেরকে বলেছেন Islamic Zealots এবং এদের উদাহরণ হিসেবে তিনি আফ্রিকার সানুসী এবং এশিয়ার ওহাবীদের কথা বিশেষভাবে বলেছেন।

মুসলমানদের মধ্যে আর একদল ছিল যারা টয়েনবীর ভাষায় Herodian, এরা কলোনির প্রভুদের সাথে একটা আপোষরফায় চলে আসে। এর উদাহরণ হিসেবে টয়েনবী তুর্কী নেতা কামাল পাশার সংস্কার প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। তখনকার মতো এরা মনে করেছিল ইসলামের সাথে যেহেতু আধুনিকতা চলতে পারে না, তাই একে পরিত্যাগ করাই ভাল। নিজেদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে হঠাৎ করে এরা মুসলিম সমাজকে পশ্চিমীকরণ করতে উদ্যোগী হয়। কারণ পশ্চিমীকরণ ছাড়া আধুনিকায়ন সম্ভব নয় এই তত্ত্ব তারা পুরোপুরি হজম করে ফেলেছিল।

কামাল ও তার মতো অনেকের প্রচেষ্টা মুসলিম সমাজে দীর্ঘস্থায়ী কোন সুফল আনেনি। কামাল ওসমানী খেলাফতের ভস্মস্তুপ থেকে উঠে আসা তুরস্ককে পশ্চিমীকরণ করতে যেয়ে এর ইসলামী অতীতকে অস্বীকার করে বসেন। এর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার এক হিংসাত্মক ও রক্তাক্ত পথ বেছে নেন এবং সেখানে একটি নতুন সংস্কৃতির পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন। এটি করতে যেয়ে তিনি তুরস্ককে মতাদর্শিকভাবে একটি Torn country-বিভাজিত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। মোটকথা ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই ধরনের অদ্ভুত দ্বন্দ্বে শুধু তুরস্ক নয়, আজকের পুরো মুসলিম দুনিয়া দোদুল্যমান। পশ্চিমের অনুকরণ করতে যেয়ে মুসলিম নেতারা নিজ সমাজের কিয়দংশকে পশ্চিমীকরণ করে ফেলেছেন, কিন্তু তারা যা মনে করেছিলেন পশ্চিমীকরণ করতে পারলেই মুসলিম দুনিয়া ইপ্সিত প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করবে তা খুব একটা অর্জিত হয়েছে বলা চলে না।

www.pathagar.com

মিসরীয় বুদ্ধিজীবী আলী আল আমিন মাজরুই এ চিত্রের একটি প্রাণদ বর্ণনা দিয়েছেন : Painful process of cultural westernization without technical modernization. আসল কথা হচ্ছে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোন জাতি তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না।

ইসলামকে তাই আজ শুধু পশ্চিমের সাথেই লড়াই করতে হচ্ছে না, নিজের ভিতরে নিজের সাথেও লড়াই করতে হচ্ছে। এই গৃহদাহ কলোনির সৃষ্টি, ইসলাম আজ সেকুলার ও মৌলবাদী শক্তি এই দুই প্রবণতায় বিভক্ত। সেকুলার মুসলমানরা, সংখ্যায় তারা যাই থাকুক না কেন, এরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, ভয়ানকভাবে ইসলাম বিদ্বেষী এবং পাশ্চাত্যের তল্পিবহনকারী। এরা মেনস্ট্রিম মুসলিম জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এ নিবন্ধের প্রথমেই যে মানসিক বিভাজনের কথা বলেছিলাম যার কারণে ইসলামপন্থীদের সাথে যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশে আমাদের দেশের প্রগতিশীল বলে পরিচিত অংশ একাকার হতে পারছে না তার উৎসটা এখানেই খোঁজা দরকার।

কলোনির কালে মুসলমানরা ইউরোপীয় আধিপত্যবাদের মুখে যে রকমভাবে তাদের তাৎক্ষণিক ও আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, আজকের মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া সেদিনের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত ও সংহত। তারা বুঝতে পেরেছেন পশ্চিমী সভ্যতাকে রুখতে হলে যেমন একদিকে চাই আপন সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার, ইসলামের কাছে নিজের আত্মপরিচয় সন্ধান তেমনি প্রাযুক্তিক জ্ঞানে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা। একে বলা যায় Re-Islamization, Technical Modernisation and Rejection of Cultural Westernization। শুধু আবেগ দিয়ে পাশ্চাত্যকে ঠেকানো যাবে না।

প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যের আধিপত্যের মুখে টয়েনবীর ভাষায় Islamic Zealotism এর উত্থান ঘটলেও সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে এই ধারা থেকে উঠে আসে রিফরমিস্ট বা রেনেসাঁপন্থী মুসলমানরা। এদের নেতৃত্ব দেন জামালুদ্দীন আফগানী, মুফতী আবদুহু, ইকবাল, মোহাম্মদ আসাদ, আলী শরীয়তির মতো বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারকরা। এদের ভাষায় যেমন যুক্তি ছিল তেমনি তাদের পথের দিশা দেবার মতো সামর্থ্যও ছিল। এরা বললেন ভিন্ন কথা। ইসলামকে এগিয়ে যেতে হলে এর পশ্চিমীকরণের দরকার নেই, এর মূলনীতির আলোকে সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে সংস্কার করে নিলেই যথেষ্ট হবে। এটা ঠিক ইসলাম ও পশ্চিমের জীবন ভাবনা দুটো বিপরীতমুখী অস্তিত্ব কিন্তু ইসলাম ও আধুনিকতা পরস্পরকে গ্রহণ করতে সমর্থ, ইসলাম ও আধুনিকতা তাই সহাবস্থান করতে পারে। এই সব বুদ্ধিজীবী জোর দিয়ে বলেছেন পশ্চিমীকরণ ছাড়াই ইসলাম তার অন্তর্গত শক্তি ও ডায়নামিজমের জোরে এগিয়ে আসতে পারবে। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিশ্লেষক ম্যাক্সিন রডিনসন লিখেছেন :

www.pathagar.com

Islam and modernization do not clash. Pious Muslims can cultivate the sciences, work efficiently in factories, or utilize advanced weapons. Modernization requires no one political ideology or set of institutions: elections, national boundaries, civic associations, and other hallmarks of Western life are not necessary to economic growth. As a creed, Islam satisfies management consultants as well as peasants. The Sharia has nothing to say about the changes that accompany modernization, such as the shift from agriculture to industry, from country side to city, or from social stability to social flux; nor does it impinge on such matters as mass education, rapid communications, new forms of transportation, or health care. (উদ্ধৃত ঃ Daniel Pipes, Path of God)

এই মন্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার খুব একটা কারণ নেই। পশ্চিমীকরণ ছাড়াই মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণ আজ শুরু হয়েছে এবং এই আধুনিকীকরণের ফলে ইসলামের আত্মা আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং তার সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ইসলামের একালের ভূমিকা তার বড় নমুনা। ওরিয়েন্টালিস্টরা যেমন করে বলতেন মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম জীর্ণ ও পুরাতন হয়ে গেছে, এটি এ যুগে অচল। এই ধারণা অবশেষে ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে।

৬

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার ইতিহাস শেষ হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব অনেককেই ভাবিয়েছে। ইতিহাস তো শেষ হয় একবার এবং কোন কোন বিশেষ সভ্যতার ক্ষেত্রে হয়তো বারবার। সভ্যতার উত্থান-পতন আছে। কালের ধাক্কায় সভ্যতা হারিয়ে যায় আবার কালেরই প্রয়োজনে সভ্যতা উঠে আসে। মানুষই সভ্যতার স্রষ্টা, তাই মানুষের মতো সভ্যতাও কোন চিরন্তন অস্তিত্ব নয়। সময়ে সভ্যতার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মানুষ তার সৃষ্টি দেখে কখনো কখনো নিজেই হতবাক হয়ে যায়, নিজের উপর নিজের আত্মবিশ্বাস প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে টয়েনবী বলেছেন the mirage of immortality। সভ্যতার ক্ষেত্রেও এরকম mirage of immortality আসতে পারে যখন এর জনগণ তাদের অর্জন দেখে অন্ধ হয়ে যায়। এই অন্ধতা এক ধরনের নৈতিক অন্ধতা যখন মানুষ বিশ্বাস করতে থাকে এই বুঝি মানব সমাজের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ। এটি একটি সভ্যতার বিপর্যয় ও পতনকালীন চেহারাও বটে। একই রকম ঘটনা ঘটেছিল

www.pathagar.com

গ্রীকদের ক্ষেত্রে, রোমানদের ক্ষেত্রে, তারপরে আব্বাসীয়, মোঘল ও উসমানীয় খেলাফতের ক্ষেত্রে। এই সব সভ্যতার লোকেরা এক সময় ভাবতে শুরু করেছিল তারা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছে গেছে এবং তাদের চূড়ান্ত অর্জনও হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। টয়েনবীর ভাষায় ঃ

The citizens of such universal states in defiance of apparently plain facts....... are prone to regard it, not as a night's shelter in the wilderness, but as the Promised Land, the goal of human endeavors. (A Study of History)

একই ঘটনা ঘটেছিল Pax Britannica'র ক্ষেত্রে। বৃটেনের মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল, টয়েনবী লিখেছেন ঃ as they saw it, history for them, was over....... and they had every reason to congratulate themselves on the permanent state of felicity which this ending of history had conferred on them. (A Study of History)

তারপরেও বিশ্বশক্তি হিসেবে বৃটেনের পতন ঠেকানো যায়নি। এবার যুক্তরাষ্ট্রের পালা। তাহলে কি Pax Americana ইতিহাসের এই চিরন্তন উত্থান-পতনের ধারা থেকে ব্যতিক্রম অথবা ইতিহাসের ধাক্কাকে সয়ে সে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে? আসলে যুক্তরাষ্ট্রও ইতিহাস ও প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে নয়। তার অর্জন যত মহৎ ও প্রবল হোক না কেন ইতিহাসের ধারাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। ইসলামের পুনরুত্থান আজ দেখিয়ে দিচ্ছে সভ্যতা হিসেবে এটি মৃত নয়, পুরোপুরি জীবিত ও মতাদর্শ হিসেবে পশ্চিমের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব। আজকে পশ্চিমী সভ্যতাকে অবশ্য বলা হচ্ছে Universal Civilization। ইসলামের পুনরুত্থান বলে দেয় এই পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র একা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সুতরাং পশ্চিমা সভ্যতা মানেই বৈশ্বিক সভ্যতা এ দাবি ঝুটা হতে বাধ্য। পশ্চিমীরা যেমন আজকাল বলে থাকে অপশ্চিমীরা তাদের নীতি, মূল্যবোধ, রাজনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করবে কারণ তারাই হচ্ছে সবচেয়ে আলোকিত, উদারনৈতিক, যুক্তিবাদী, সবচেয়ে আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ। এই পৃথিবীর বাস্তবতা এ দাবির যাথার্থ্য প্রমাণ করে না। পাঁচ হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা বর্ষণ করে নারী ও শিশু-হত্যার মাধ্যমে কিভাবে আলোকিত ও যুক্তিবাদী হওয়া সম্ভব তার বিচার জরুরি।

এ কথা সত্য সংস্কৃতি সাধারণত শক্তিকে অনুসরণ করে। পাশ্চাত্য আজ মতাদর্শিক দিক দিয়ে ইসলামের কাছে পেরে উঠছে না। আর পারছে না বলেই সে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী ধারাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদকে ফিরিয়ে এনেই সে তার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য স্থায়ী করতে চায়। ইরাকের কথা ভাবুন। শেক্সপিয়ারের ব্রুটাস যেমন করে যুক্তির পর যুক্তি তুলে ধরতো, ঘুনে

www.pathagar.com

ধরা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব আজ সে পথ নিয়েছে। ব্রুটাসের যুক্তিগুলো শুনুন ঃ

Our legions are brim-full, our cause is ripe.
The enemy increaseth every day;
We at the height, are ready to decline.
There is a tide in the affairs of men,
Which taken at the flood, leads on to fortune;
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows and miseries.
On such a full sea are we now afloat,
And we must take the current when it serves,
Or lose our ventures.

ব্রুটাসের ক্ষুরধার সব যুক্তি কিন্তু তাকে যুদ্ধে জয় এনে দেয়নি। ফিলিপ্পিতে তার পরাজয় হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পরিণতি কি তাই হতে চলেছে? মনে রাখা দরকার সংস্কৃতি হচ্ছে একটা আপেক্ষিক সত্য, নৈতিকতা চিরস্থায়ী। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান খুব উঁচুতে কিন্তু তার নৈতিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। এই দুর্বল ভিত্তিকে মজবুত করতে তার কোন প্রস্তুতি আছে বলে মনে হয় না। এটা সত্য পাশ্চাত্যের কারণে সভ্যতার বস্তুগত সমৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু যত কথাই বলা হোক না কেন এই পৃথিবীতে আজও কোন না কোন ভাবে দাসত্ব, অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, ধ্বংস, যুদ্ধ, সন্ত্রাস, ড্রাগ, মাফিয়া, মানবাধিকার লংঘন এ সব কিছুই বহাল তবিয়তে টিকে আছে। রিজন আর টেকনোলজী দিয়ে পৃথিবীর মানুষ এগুলো রুখতে পারেনি। বিশ্বজুড়ে একটি নৈতিক অভ্যুত্থান (Moral coup) দরকার যা এই সর্বনাশ থেকে মানবজাতিকে এখন রক্ষা করতে পারে। সেই পথ প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। পাশ্চাত্যের বিকল্প হিসেবে অনাগত মানব সভ্যতার জন্য ইসলামের বিজয়ের ইংগিত আজ অবধারিত হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ

ইতিহাসের বিভ্রম

মুসলিম দুনিয়াকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদের খেলা সেই নেপোলিয়নের কাল থেকে। ফরাসী বিপ্লবের এই মস্ত সন্তান 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার' তকমা ঝুলিয়ে বন্দুক আর কামানের গোলায় ঝাঁঝরা করে দেন ইজিপ্টের মামলুকদের। তারপর থেকে একে একে এই রক্তারক্তি খেলায় রাশিয়া, বৃটেন, পর্তুগাল, ইটালী শামিল হয়। মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য আর আফ্রিকার কোন মুসলিম ভূখণ্ডই অরক্ষিত থাকে না। মুসলমানের রক্তে যখন সাম্রাজ্যবাদের হাত রাঙা হয়ে উঠছে ঠিক তখন সাম্রাজ্যবাদের পিতৃভূমি ইউরোপে শুরু হয়ে গেছে রেনেসাঁ, সেই পথ ধরে শিল্প বিপ্লব, এ সবের আগে দানা বেধেছিল রিফরমেশনের আন্দোলন। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন এই রেঁনেসা-রিফরমেশনের প্রধান দান হলো যুক্তি আর মানবিকতা। মানুষের যুক্তির বিবেচনা তার উপর আরোপিত ধর্ম শাসন শিথিল করবে, নিজের শক্তিতে বাঁচবার প্রেরণা যোগাবে। একে বলা হয় চিন্তার সেকুলারাইজেশন। এই সেকুলারাইজেশনের আন্দোলন তাদের ভাষায় জন্ম দিল প্রগতিশীল মানবতাবাদী চিন্তার। ইউরোপের পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন ইতিহাসের বিচারে তাদের এই দাবির সবটুকু সত্যতা মেলে না। রেনেসাঁ উদ্ভুত আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার জ্ঞান ও দর্শনকে হাতিয়ার করে রেনেসাঁর সন্তানরা তখন দিকে দিকে বিশেষ করে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে শৃংখলিত, উপনিবেশিত করবার জন্য ছুটতে শুরু করেছে। তার পরবর্তী ইতিহাস এক বেদনা বিধুর অধ্যায়। লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংস, বিপর্যয়, যাবজ্জীবন, কালাপানি উপনিবেশিত দেশগুলোর ললাট লেখা হয়ে উঠলো। এ হলো ঘটনার একটা দিক। এবার অন্য দিকটায় নজর ফেরানো যাক। এখন থেকে উপনিবেশিত দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠনের এক ভয়ংকর প্রতিযোগিতা ও পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তারের এক রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হলো। মনে পড়বে নেপোলিয়নের ফ্রান্স ও ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের সন্তানরা এ নিয়ে বছরের পর বছর পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছে। রেনেসাঁর যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা ও মানবিকতার বোধ দিয়ে, রেনেসাঁর পতাকাবাহীদের হাতে এই মানবনিগ্রহকে কিভাবে সদর্থক ব্যাখ্যা করা যায়? রেনেসাঁ থেকে জাত যুক্তি ও বুদ্ধি সত্যি কি মানুষকে আলোকিত করেছিল না কখনো কখনো কুবুদ্ধি ও কুযুক্তিরও প্রশ্রয় দিয়েছে? আমাদের মনে রাখা চাই রেনেসাঁর সন্তানরা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েম করে বহু জনগোষ্ঠী, ছোট বড় জাতি ও জাতি সত্তার অস্তিত্ব ও ইতিহাস ঝাড়ে বংশে

www.pathagar.com

বিলকুল খতম করে দিয়ে আজকের আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে। একালে আমেরিকার সভ্য সন্তানরা আবার সেদিনের ইউরোপের উত্তরসূরী হিসেবে আফগানিস্তান দখল করেছে, ইরাক দখল করেছে, তার চোখ এখন মধ্য এশিয়ার দিকে। আরবদের তেলের ওপর জবর দখল প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য। মোট কথা পুরো মুসলিম দুনিয়াই আজ নতুন 'আর্মাগেডন'-ন্যায় ও অন্যায়ের সংগ্রামের শেষ রণভূমি।

রেনেসাঁ যেমন করে সাম্রাজ্যবাদের তপ্ত কড়াইয়ে ঘি ঢেলেছিল তেমনি করে যাবতীয় এথিকস আর ধর্মবোধকে আগুন দিয়ে ভস্ম করেছিল। সেই ভস্মাবশেষ থেকে যে চেতনা উঠে এলো তাহলো ধর্মকে পশ্চাৎপদতার চিহ্ন গণ্য করা ও রেনেসাঁপন্থীদের ভাষায় ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দর্শন। মনে রাখা চাই রেনেসাঁর পথ ধরে যে আধুনিকায়নের ধারণা এলো তা কিন্তু ঔপনিবেশিকতার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং উপনিবেশিত দেশের মানুষের মনোজগতও উপনিবেশিত হয়ে পড়েছে এই আধুনিকতা গ্রহণের ভেতর দিয়ে। এই তথাকথিত আধুনিকরা মনে করে ধর্ম হলো এক মধ্যযুগীয় ভাবধারা এবং মানব সমাজকে প্রগতির দিকে অগ্রসর হতে হলে ধর্মকে বাদ দিয়ে এক যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক নিরপেক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ধর্ম যেহেতু দূষণীয় ব্যাপার– যাবতীয় উন্নতি-প্রগতির বাধক ধর্মানুসারী যেই হোক না কেন আধুনিকতাবাদীদের কাছে তাই তারা নিছক মৌলবাদী। মৌলবাদ শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য যাই হোক না কেন, মৌলবাদ বা মৌলবাদী এসব শব্দবন্ধ আজ এক নির্ভেজাল গালি। রেনেসাঁর যুক্তি-বুদ্ধি আমাদের গালমন্দ আর অসূয়ার কৌশলও শিখিয়েছে।

এতকাল যারা মৌলবাদী হিসেবে চিত্রিত হয়ে আসছে সভ্যতার সন্তান আমেরিকা আজ তাদেরকে বলছে সন্ত্রাসী। এজন্য কি বচনটির জন্ম ঃ Truth is stranger than fiction। হিরোশিমা কিংবা নাগাসাকিতে কি কোন মৌলবাদী আনবিক বোমা ছুঁড়েছিল কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিছনে কোন মৌলবাদীর হাত ছিল? আজ যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও প্যালেস্টাইনে সভ্য আমেরিকা ও তার দোসররা যুদ্ধ করে, ষড়যন্ত্র করে যে পরিমাণ মানবক্ষয় ও রক্তগঙ্গা বইয়েছে, মৌলবাদীদের হাত কি তার চেয়ে লাল ও কলুষিত? তালেবানরা যখন বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙল, তখন তাদের অসভ্য, বর্বর বলে সারা পৃথিবীতে রব উঠলো। সভ্যতা রক্ষার জন্য পশ্চিমা মিডিয়া এগিয়ে এলো, ভাবটা এমন সভ্যতার সামনে এরকম মসীবত আর কখনো আসেনি। বেচারা তালেবানরা দুটো বৌদ্ধ মূর্তিই ভেঙেছিল। তাও বুদ্ধের মূর্তি রক্ষার জন্য যখন সভ্য দুনিয়া কাড়ি কাড়ি ডলার নিয়ে হাজির হলো, তালেবানরা তখন দাবি করেছিলো আফগান শিশুদের অনাহার, অপুষ্টি ও মৃত্যু রোধের জন্য

www.pathagar.com

অন্তত এর কিছু অংশ যাতে খরচ হয়। সভ্য দুনিয়া তাতে রাজি হয়নি। ওটা নাকি অচল মৃত মূর্তির জন্য। তালেবানরা তখন মূর্তি ভেঙে দিল। আর যায় কোথায়? তালেবানদের উপর শুরু হলো ঘৃণার বৃষ্টি বর্ষণ।

এখনো অনেকে মনে করতে পারবেন ষাট আর সত্তরের দশকে আমেরিকা হাজার হাজার টন বোমা ছুঁড়ে এবং বন্দুক ও গোলা ক্ষয় করে ভিয়েতনামে যে বেশুমার মূর্তি নয়, জীবিত বৌদ্ধ মেরে ফেলেছিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু ধনবাদী বিশ্ব ও তার মিডিয়া তেমন কোন নিন্দা বর্ষণ করেনি। এই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা। ইতিহাস ও সভ্যতার এই বিভ্রমের প্রেক্ষিতেই বিশ্বায়ন ও মৌলবাদের বিচার করা জরুরি। ইসলামী মৌলবাদের বিকাশ ও তার বাড়-বাড়ন্ত নিয়ে পশ্চিমের চোখে আজ ঘুম নেই। কিন্তু একে ঘিরে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের ভাবনাটাও বুঝে দেখবার মতো। এই ভাবনার মূলে আছে বিশ্বব্যবস্থার সংকট। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়, জীর্ণতা ধরা পড়তে শুরু করেছে– তার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংকট গভীর হয়ে উঠেছে। এই সংকট মুসলিম সমাজকেও কম বেশি নাড়া দিচ্ছে। ধনবাদী বিশ্ব মুক্তবাজার অর্থনীতি, পুঁজির বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ প্রভৃতি করেও সামলাতে পারছে না। আবার অন্যদিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর শক্তি বিন্যাসও পুরোপুরি ওলট পালট হয়ে গেছে, বদলে গেছে শত্রু মিত্রের সংজ্ঞা। লেনিনের রাশিয়া আর মাওয়ের চীন আজ ওয়াশিংটনের সহযোগী, সমব্যাথী। এর সাথে আছে ইসরায়েল ও ভারত। এরা সবাই আজ কমবেশি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার শরীক, ধনবাদী বিশ্ব, এদের সাথে করেই নতুন এক হলি এ্যালায়েন্স গড়ে তুলেছে। জুনিয়র বুশ আমাদের ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন এই এ্যালায়েন্সের শত্রু হলো ইসলাম– ইসলামী মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, এর বিরুদ্ধে ক্রুসেড জরুরি। বিশ্বায়নের এই নয়া উপনিবেশবাদী অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির প্রেক্ষিতেই মুসলিম দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর বোঝা দরকার। এক মেরু বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত আধিপত্য, শোষণ, লুণ্ঠন অন্য দিকে সাক্ষীগোপাল জাতিসংঘ– এসবের প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজের পালাবদল যেমন তীব্রতর হচ্ছে তেমনি ইসলামের আবেদনও গভীর হয়ে উঠছে। ইসলাম আজ বাকি বিশ্বের ক্রুসেডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে রেনেসাঁর পশ্চিমী সন্তানরা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি কপচিয়েও ক্রুসেডের যুগে ফিরে গিয়েছে– সেখানে ইসলামের জেহাদ কি অপরিহার্য হয়ে উঠবার কথা নয়?

মৌলবাদের উৎস সন্ধানে

একালে সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের সবচেয়ে বড় প্রচারক স্যামুয়েল হান্টিংটন ও অন্যান্য পশ্চিমী ভাষ্যকার ও নীতি নির্ধারকরা ইসলামী মৌলবাদের পুনরুত্থান ভাবনা নিয়ে দারুণ বিচলিত। হান্টিংটনরা মুসলিম সমাজের এই

www.pathagar.com

পুনরুত্থানবাদীদের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত তা বুঝতে পেরেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুনরুত্থানবাদীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে রীতিমত ফরাসী, রাশিয়ান বা আমেরিকান বিপ্লবের সাথেও তুলনা করেছেন। একটা জিনিস খুব গভীরভাবে বোঝার বিষয় সেটি হলো এই মৌলবাদী বা ইসলামবাদীরা আমজনতার খুব কাছাকাছি চলে আসছেন বা খুব দ্রুত তাদের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠছেন। মৌলবাদী চিন্তাভাবনার মধ্যে যদি সেরকম কোন সবল elements বা উপকরণ-উপায়াদি না থাকে তবে আমজনতা কেন তাদের দিকে ঝুঁকছে? ইরান, ইজিপ্ট, সুদান, আলজেরিয়ার উদাহরণ আমরা দিতে পারি।

মুসলিম আমজনতার 'মূল' ইসলামের দিকে ফেরার কতকগুলো কারণ আছে। উপনিবেশ উত্তর মুসলিম দেশগুলোর আমজনতার দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার এ যাবৎকাল তেমন একটা লাঘব হয়নি। আমজনতা এখন নতুন নিশ্চয়তার সন্ধান চায়। এটা সত্য উপনিবেশপূর্বকালে মুসলিম দুনিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। মুসলিম গণজীবনের সর্বত্র, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র থেকেই ইসলামকে অপসারণ করা হয়েছিল। বস্তুত এ প্রক্রিয়া স্বাধীনতা উত্তরকালেও অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। এখন থেকে সরাসরি মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ইউরোপের নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও পাশ্চাত্যের আধিপত্য কিন্তু ঠিকই বজায় থাকলো। তার মানে মুসলমানের সামনে চ্যালেঞ্জটা আগের মতোই রয়ে গেল। বিশ্বায়নের এ যুগে এখন বলা হচ্ছে দুনিয়াটা ছোট হয়ে আসছে। মিডিয়া, তথ্য প্রযুক্তি এবং যাতায়াতের নতুন নতুন ব্যবস্থার জোরে পশ্চিমা বিশ্ব এখন আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ছে। সে এখন অপ্রতিরোধ্য। সীমান্ত বন্ধ করো ক্ষতি নেই। ই-মেল, ফ্যাক্সের মাধ্যমে আমেরিকা এখন ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে।

দুঃখের বিষয় হলো প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমাদের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের অধিকাংশই ছিলেন দূরদৃষ্টি বর্জিত। এদের আবার অনেকেই ছিলেন পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুগ্রাহী এবং অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমের পেটোয়া। তাই স্বাধীনতার পর দেখা গেল আদতে এদের দেওয়ার কিছুই নেই। স্বাধীনতার এসব ধ্বজাধারীরা মূলত দেউলিয়া। জাতীয় মুক্তি, জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতার চেতনা– প্রভৃতি ছাড়া মূলত তাদের কিছু বলারও নেই। অর্থনীতি কেমন হবে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, সাংস্কৃতিক নীতিমালাই বা কিভাবে তৈরি হবে কিংবা জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন বা বাস্তব সমস্যার সমাধানে বিকল্প পন্থা হাজির করতে এরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর নেতৃত্ব শুধু ঔপনিবেশিক শাসকদের হটিয়ে ক্ষমতা দখলের কথাই ভেবেছিলেন।

এর পরে এলো সমাজতন্ত্র। পশ্চিমী প্রভুত্ব ঠেকাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলিম দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মিতালী করলো। মূলত

www.pathagar.com

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে অনেক মুসলিম দেশে সে সময় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা আন্দোলন দানা বেধে উঠলো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেসব আন্দোলনও মুখ থুবড়ে পড়লো। দেখা গেল স্বাধীনতা উত্তর জাতীয়তাবাদী লিবারেল ও গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর মতোই এসব সমাজতন্ত্র ঘেঁষা সরকারগুলোও দুর্নীতি, অপদার্থতা ও অবিচারের আখড়া। ইজিপ্টের নাসেরের কথা ভাবুন। তার সমাজতন্ত্র, আরব ঐক্য, প্যান আরব জাতীয়তাবাদের বুলি যে পুরোপুরি ঝুটা তার প্রমাণ হলো আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সময়। মিসরের অপমানজনক পরাজয় দেখিয়ে দিল ভেতরে ভেতরে দুর্নীতি ও অপদার্থতায় ফোপরা সেকুলার সরকারগুলো আসলে জাতীয় স্বার্থরক্ষা অথবা সামাজিক ন্যায় সাধন কোনটিই করতে পারেনি। ইজিপ্টের মতো সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাকের মতো দেশগুলোতে মস্কো ধাচের সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি মার্কিনীদের সাথে ভাব ভালবাসার নানা পর্বও আমরা দেখেছি। শেষ পর্যন্ত এসব দেশ প্রত্যেকটি কোন না কোন ভাবে একনায়কতন্ত্রের শিকার।

আবার একনায়কতন্ত্রের বিচারে ইঙ্গ মার্কিন মদদপুষ্ট শেখতন্ত্রগুলো রীতিমত মুসলিম বিশ্বের জন্য দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন প্রভৃতি দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বলে আদতেই কিছু নেই। প্রকৃত পক্ষে যা আছে, বাদশাহ মনোনীত একটি পরামর্শ সভা তা আসলে পুরনো দিনের মরুভূমির বেদুইন সমাজের জন্যই উপযুক্ত। সৌদী আরব, কুয়েতের মতো দেশগুলোতে চলছে পরিবারতন্ত্র। সৌদী আরবের ইবনে সউদ, কুয়েতের আল সাবাহ ও জর্দানের হাশেমী পরিবার হচ্ছে মূলত মার্কিন পেটোয়া। মার্কিনীদের ইশারায় এরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, মুসলিম জনগণের স্বার্থরক্ষার চেয়ে পশ্চিমীদের স্বার্থ রক্ষাতেই এদের আগ্রহ বেশি। এই অর্ধশিক্ষিত, ভোগবাদী নষ্ট শেখেরা পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ জনগণকে জিম্মি রেখে সীমাহীন ভোগ বিলাস আর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ডুবে আছে। তারা কোন গণতান্ত্রিক এমনকি ইসলামী কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষপাতী নয়। কেউ যদি কখনো চেষ্টা করে আমেরিকা, বৃটেন তখনই তাতে বাধা দেয়। হয় সরাসরি সামরিক শক্তি প্রয়োগে নয় গুপ্ত হত্যা করে। আলজেরিয়ার কথা স্মরণ করুন। বিন লাদেনের বন্ধু সৌদী বুদ্ধিজীবী আব্দুল বারী আতওয়ান এই নষ্ট শেখ ও তাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে বক্রোক্তি করেছেন এভাবে ঃ এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে মুসলমানরা বিশেষ করে আরবরা গ্লোবালিজম-এর সবচেয়ে বড় শিকার। সে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নিরাপত্তাগত বা অন্য যে কোনও ধরনেরই হোক না কেন। .... এরা অতিদ্রুত এই গ্লোবালিজম-এর দিকে ছুটছে। কারণ এতে তারা ক্ষমতা হাতে পাবে এবং বাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারবে। এদের সবচেয়ে 'বাস্তববাদী' প্রবণতা হলো ঃ কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা লাভ, বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস,

www.pathagar.com

জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলে সেখানে অতিদ্রুত পৌঁছানোর চেষ্টা এবং ইসরায়েল যে থাকছেই, সেটা নিশ্চিত করে ফেলা। (Joseph Bodanoski; Bin Laden, The Man who Declared war on America)

পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে অয়েল বুমের পরেও তাই সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়েছে, নয়া উপনিবেশবাদী নষ্টামীর প্রক্রিয়ায় এসব দেশে আমেরিকার আধিপত্য গভীর হয়ে উঠেছে এবং বলা চলে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় /এসব দেশের পশ্চিমীকরণ দ্রুত গতি লাভ করেছে। এসব দেশে অয়েল বুম ঠিকই হয়েছে, কিন্তু মুসলিম আমজনতার পকেটে সেই দুর্লভ পেট্রো ডলার আসেনি। ইজিপ্টের প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ হেইকেল লিখেছেন ঃ বৈভবশালীদের তৈরি করা বিভ্রমে, মরিচীকার মায়ায় গ্রাম থেকে, মরুভূমি থেকে কৃষিজীবী এবং পশুপালনকারী মানুষ ইটকাঠ পাথরের মরুদ্যানে ছুটে আসেন। তাদের তৃষ্ণা রুটি-রুজির জন্য। সামান্য কিছু পেয়ে, অথবা কিছুই না পেয়ে, তারা শহরের প্রান্তসীমায় প্রান্তিক জীবন যাপনে বাধ্য হলেন। তারা সম্পদ, বৈভবকে চোখে দেখতে পারছেন। কিন্তু কিভাবে তারা টুকরোটা হাতে পাবেন সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না। সম্পদ যাদের কুক্ষিগত, তাদের নাক উঁচু দেখানেপনা বঞ্চিতদের ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে তুলল (The Illusion of Triumph)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উপনিবেশ উত্তরকালে মুসলিম জনগণের ভাগ্যের তো পরিবর্তন হয়ইনি, উল্টো তারা এক প্রান্তিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। একের পর এক আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে পরাজয়ের হতাশা ও গ্লানি, ফিলিস্তিন নিয়ে নিস্ফল ক্রোধ ও ঘৃণা, অয়েল বুম পরবর্তী ক্রমবর্ধমান ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সব মিলিয়ে আমজনতা নতুন বিকল্পের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে পড়েছে। এই আদর্শগত শূন্যতার পর্বেই এলো ইসলামিক পুনরুজ্জীবন বাদ। পশ্চিমী মিডিয়ার ভাষায় ইসলামী মৌলবাদ। মোহাম্মদ হেইকেল লিখেছেন ঃ আমজনতা তখন নতুন নিশ্চয়তার সন্ধানে কাতর। কিন্তু তারা যার খোঁজ পেলো তা অনেক পুরানো। তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হল ইসলাম আসলে গরীব মানুষের বিদ্রোহের ধর্ম। তাদের স্মৃতিতে ফিরে এল মোহাম্মদ (স.) মুস্তাদআফীন তথা শোষিত ও দুর্বলদের মধ্য থেকে উঠে আসা লড়াকুদের ভরসায় লড়েছিলেন। মক্কার মুস্তাকবিরিন বা সম্পদশালী ও ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহে ওরাই ছিলেন তার সহগামী। .... ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের পর আরব আমজনতার আশা জাগল একজন নতুন মসিহার জন্ম হবে। তিনি আরব তথা ইসলামিক বিশ্বে দুর্নীতি, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নতুন এক বার্তা বহন করে আনবেন। শুধু তাই নয়, ওয়াশিংটন এবং তেল কোম্পানিগুলির সেবাদাসদের বিরুদ্ধেও এক নতুন দিশা মিলবে (The Illusion of Triumph)।

www.pathagar.com

ধনবাদী বিশ্ব আজ ঈশ্বরের ভূমিকায় নেমেছে। বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও আমেরিকার উত্থানের সাথে পৃথিবীর ইতিহাসেরও সমাপ্তি ঘটেছে। এর মতো ঝুটা কথা আর হতে পারে না। ইতিহাসের গতি কেউ স্তব্ধ করতে পারে না। ইতিহাসের চাকা গড়াবেই যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ দুনিয়া ও মানবজাতিকে ধ্বংস না করেন। তবে এটা সত্য সব ধর্মের ইতিহাসে উত্থান পতন আছে এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামের ফিরে আসবার ক্ষমতাও রয়েছে। ইসলামিক পুনরুজ্জীবনবাদ তারই ইংগিত দিতে শুরু করেছে। সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। ধনবাদী বিশ্ব আজ তার সীমাহীন লোভ লালসা, নীতি নৈতিকতাহীনতা ও ভোগ সর্বস্ববাদিতা দিয়ে পৃথিবীকে মহাবিপর্যয়ের প্রান্তে নিয়ে এসেছে। মানুষ তাই বিকল্প পথের সন্ধান করবেই। মুরাদ হফম্যানের ভাষায় সেটি হচ্ছে Islam the Alternative।

ইসলামী পুনরুজ্জীবন বা রেনেসাঁ মুসলিম দুনিয়ায় একদিনে আসেনি। প্রথম দিকে উপনিবেশের দিনগুলোতে এটি ছিল আত্মরক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য বাঁচানোর লড়াই। সাম্রাজ্যবাদের খড়গের সামনে নিজের ঈমান কিভাবে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টাই মুসলমানরা তখন করেছেন। এর পরে এল রেনেসাঁ। পুরনো পুথিপত্র আর কেতাব ঘেঁটে নয়, নতুন যুগের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে ইসলামের ভাষ্য জানা চাই। তার পর তৈরি হলো কর্মসূচী। আন্দোলনের জলতরঙ্গ শোনা গেল। ইসলামকে ঘিরে আর আত্মরক্ষা নয়, এখন পুরোপুরি জেগে ওঠা। মধ্যপ্রাচ্য, উপমহাদেশ, আফ্রিকা প্রথমে সর্বত্রই এ আন্দোলন ছিল এলিটিস্ট– আমজনতা থেকে দূরে। পরবর্তীকালে গণজোয়ারের সূচনা হয়। ইরান বিপ্লব, আলজেরিয়ার স্যালভেশন ফ্রন্টের আন্দোলন, সুদান, তুরস্ক, ইজিপ্ট সর্বত্রই ছিল গণআন্দোলন এবং পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। বস্তুত এই সব ইসলামবাদী রেনেসাঁপন্থীরা শরীয়তের শাসন চান। এসব ইসলামিক আন্দোলনগুলোর হাতে ধনবাদী বিশ্বের বিকল্প হিসেবে ইসলামকে ভিত্তি করে একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখাও রয়েছে। অর্থনীতির প্রশ্নে তারা বস্তুবাদের বিপক্ষে এবং ইসলামের সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে তারা অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। সংস্কৃতির প্রশ্নে তারা মনে করেন বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বলে আলাদা কিছু নেই, এটির সমন্বয়ই হচ্ছে উত্তম পন্থা। ইসলামের রেনেসাঁপন্থীদের এইসব হিসাব-কিতাব ও কর্মসূচী দেখে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকলপরা নিপীড়িত শ্রেণী, যাদের কুরআন শরীফে বলা হয়েছে মুস্তাদআফীন তারা যদি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, তাকে কি খুব অস্বাভাবিক বলা যাবে?

বিশ্বায়নের সোনার হরিণ

বিশ্বায়ন নিয়ে এ যাবৎ পশ্চিমী বিশ্বের পণ্ডিত ও নীতি-নির্ধারকরা কেউ কম মেধা খরচ করেননি। অপশ্চিমী বিশ্বের কেউ কেউ বিশ্বায়নকে আমেরিকায়ন বা পুরো বিশ্বের পশ্চিমীকরণ বলে খারিজ করতে চাইলেও বিশ্বায়নের ফেরিওয়ালাদের

www.pathagar.com

উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তারা বলছেন বিশ্বায়ন মানে আমেরিকায়ন নয়। বিশ্ব মানবতার অভিভাবকরা, যারা আফগানিস্তানে ক্লাস্টার বোমা ছুঁড়ে বলে ভুল হয়েছে তাদের কথায় নির্ভর করতে ভয়ই লাগে।

আলী মাজরুই তার Cultural Forces in World Politics বইতে বিশ্বায়নের এই ফাঁকির দিকটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। পশ্চিমের সাথে ইসলামের সম্পর্কটা আজ মোটেই equal partner এর মতো নয়। যেহেতু পশ্চিম অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক দিক দিয়ে অগ্রসর তাই তার অন্যকে প্রভাবিত ও উপনিবেশিত করার ক্ষমতাও বেশি। পশ্চিমের দিক দিয়ে অন্য কোন সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক ও সেতু রচনা করতে যাওয়া মানে অনেকটা শেষ বিচারে তার ভাষায় dialogue of the deaf হয়ে যায় এবং বিশ্বের নতুন করে Coca-colonization সম্পন্ন হয়। এসব শব্দ তিনি প্রতীকার্থে ব্যবহার করলেও আদতে ঘটছেও তাই। Kenneth Boulding তো রাখ ঢাক না করে তার বইয়ের নাম রেখেছেন The world as a total system। আসলে ধনবাদী বিশ্ব পুরো দুনিয়াটাকেই একই command-control এর আওতায় নিয়ে আসতে চায় সেখানে যেমন অর্থনৈতিক সিস্টেমটাও এক হওয়া চাই তেমন কালচারটার ধরন ও প্রকাশভঙ্গি তাদের মনমত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সমাজতন্ত্রের পতনের পর ধনবাদী বিশ্বের এই আগ্রাসী ক্ষুধা আরো ভয়ানক ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার ঘাড়ের উপর তা নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। অতীতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব প্রথমে নৌশক্তির জোরে উপনিবেশ কায়েম করেছে, তারপর একচেটিয়া দেশীয় শিল্প ধ্বংস ও ঔপনিবেশিক বাজারগুলো দখল করেছে। বিশ্বায়নের এই পর্বে এসে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ দেশ দখলের কৌশল পাল্টিয়ে বাজার দখলের নীতি গ্রহণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ এখন স্বশরীরে আবির্ভূত না হলেও চলে। তার জায়গায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, এনজিও ও বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো হাজির হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব সুযোগ সুবিধাদি। বহুজাতিক সংস্থাগুলো দক্ষতার সংগে বিশ্বব্যাপী বাজার খোঁজার ও সম্পদ লুণ্ঠনের এক ভয়ানক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে এবং বিশ্বের কর্পোরেট তথা বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে লগ্নি পুঁজির জালে জড়িয়ে। পুঁজি ও পুঁজির অবাধ যাতায়াত, আরও বড় বাজারের জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা, বিশ্বকে শ্রম বিভাজনের কায়দায় বিশেষ বিশেষ পণ্য বা কাঁচামাল উৎপাদনের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভাজন, জাতীয় সার্বভৌমত্বকে কাচকলা দেখিয়ে উপগ্রহ বাহিত আগ্রাসন, সস্তা শ্রমের খোঁজে ক্রমাগত out-resourching এসব হচ্ছে বিশ্বায়ন নামী নতুন সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য।

এই সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করতে পশ্চিমা বিশ্ব এতখানি আন্তরিক যে প্রয়োজনে দেশে দেশে 'মিশনারী ও মার্সিনারী' সন্ত্রাস রফতানী করতেও তাদের দ্বিধা নেই।

www.pathagar.com

এই সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করতে সবরকমের সামরিক ও সাংস্কৃতিক প্রোটেকশন দিতে তারা সদা উন্মুখ। বহুজাতিক কোম্পানী ইউনিকলের কথা ভাবুন। এর তেল ও গ্যাস লিপ্সার আগুনে পুড়ে আফগানিস্তান আজ জ্বলছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে ইরাকে। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের পাশাপাশি আসছে বিশ্বজোড়া ভোগবাদী সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক সমসত্বতা (Cultural Homogenization) গড়ে তোলার জের। একে আজ বলা হচ্ছে Super Culture। এই Super Culture এ আত্মীকৃত হওয়াই বোধ হয় আজ অপশ্চিমী বিশ্বের নিয়তি হতে চলেছে। জার্মান নও মুসলিম মুরাদ হফম্যান এই Super Culture এর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে যেয়ে লিখেছেন ঃ এই সংস্কৃতির সবার আচরণে এক ধরনের সুষম বৈশিষ্ট্য থাকবে– এরা সবাই CNN দেখবে, Coca Cola পান করবে, Jeans পরিধান করবে, Mc donald এ খাবে আর সামাজিক রীতি হিসেবে (আদি ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন) বুঝিবা রবিবাসরীয় গীর্জার প্রার্থনা সভায়ও যাবে।

Super Culture এর হোতাদের বিশ্বাস এভাবে সারাবিশ্ব একই ধরনের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের নীতির ভিত্তিতে একীভূত হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য এ নীতিসমূহ অবশ্যই পশ্চিমা মূল্যবোধ ভিত্তিক হতে হবে এবং অপশ্চিমা বিশ্বের বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার আত্মীকরণ ঘটবে শক্তিশালী পশ্চিমা সভ্যতার বুকে।

কি বিপজ্জনক কথা। যে পাশ্চাত্য আমাদের ডেমোক্রাসী, প্লুরালিজমের দীক্ষা দিয়েছে তাদের এ কেমন আচরণ? আসলে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ডেমোক্রাসী, প্লুরালিজম আদতে একটা বিশাল শ্লোগান। এই শ্লোগান না হলে মানুষ বিভ্রান্ত হবে কি করে? সাম্রাজ্যবাদের যুগে আমরা তা ভালভাবে টের পেয়েছি, এখন বিশ্বায়নের যুগে তার পুনরাবৃত্তি দেখছি। এখানে পাশ্চাত্যের আধিপত্যই চূড়ান্ত, বাকি বিশ্ব তার দাস। এই ব্যবস্থাকেই এখন বলা হচ্ছে New World Order-নতুন বিশ্বব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় ধনবাদীরা মনে করছে পুরো দুনিয়াটা তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। অর্থনৈতিকভাবে অপশ্চিমী বিশ্ব তাদের অনুগ্রাহী হয়ে থাকবে, কারণ পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণের কলকাঠিতো পাশ্চাত্যের হাতেই। অপশ্চিমী বিশ্ব পুরোপুরি হয়ে পড়বে Debt slave-ঋণদাস। আজকের আই.এম.এফ. ওয়ার্ল্ড ব্যাংকতো সে কর্মটিই করছে। অন্যদিকে Cultural Homogenization এর তত্ত্ব এসেছে অপশ্চিমী বিশ্বের আত্মপরিচয় টুটো-ফাটা করে দেয়ার জন্য। আসলে এ হচ্ছে Cultural Hegemony অথবা Westernization of the World। এত সব করেও যদি অপশ্চিমী বিশ্বকে বাগে না আনা যায় তা হলেতো এ্যাটম বোমা, ক্লাস্টার বোমা,

www.pathagar.com

নাপাম বোমা এবং আরও সব নাম না জানা মারণযজ্ঞের আয়োজনতো আছেই। আফগানিস্তান ও ইরাকের কথা চিন্তা করুন।

যে পাশ্চাত্য এতকাল ইসলামকে মনোলিথিক-একমার্গী বলে গাল পাড়তো, তাদের এসব আধিপত্যবাদী বিশ্বভাবনাকে কি বহুত্ববাদের প্রতি অংগীকার হিসেবে আমাদের আত্মস্থ করে নিতে হবে? পাশাপাশি বিশ্বায়নের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম আমজনতার বিক্ষোভের গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুকে কি করে আমরা অস্বীকার করি? বিশেষ করে যারা প্লুরালিজমের কথা উচ্চারণ করেন তারা কেন ধর্মীয় অনুষঙ্গ দেখলেই নাক সিটকাবেন। এর বিচার আজ জরুরি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা : স্বরূপ ও সংকট

আগেই বলেছি সমাজতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে পশ্চিম থেকে শোনা গিয়েছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ এক ঘোষণা– ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। ক্যাপিটালিজম ও লিবারেল ডেমোক্রাসীর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে মানব সভ্যতার দীর্ঘ যাত্রাপথ। ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের লালনকারী পশ্চিমে পৌছতে পারলেই হলো। মানব ইতিহাসে নতুন করে ঘটার আর কিছুই নেই, যা আছে তাকে একটু গোছগাছ করে নিলেই হলো, অনন্ত সুখের আস্বাদ মিলবে পুঁজিবাদ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্যে।

মানুষ এই স্পর্ধিত ঘোষণা শুনে হতবিহবল হয়ে যায়। তাহলে ধনতন্ত্র মানে কি যুদ্ধ নয়? সংকট নয়? ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে কয়েক বছর না ঘুরতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইতিহাস শেষ হয়নি।

ধনতন্ত্র মানেই যুদ্ধ, ধ্বংস, হানাহানি– ধনতন্ত্রের এই গোপন চেহারাটা আবার বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে আমরা দেখেছি উপসাগরীয় যুদ্ধ। তারপর সুদান, বসনিয়া, আফগানিস্তান হয়ে আবার ইরাক। ইতিহাস থেমে থাকছে না মোটেই। রেনেসাঁর এনলাইটেনমেন্ট আর রিজন দিয়ে ধনতন্ত্রের অনাচার ঠেকানো যাচ্ছে না, যেমন যায়নি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ। তাহলে কি রেনেসাঁর বিশ্লেষণে ফাঁক ছিল কোথাও।

রেনেসাঁর লক্ষ্য ছিল ঐহিক সুখ, এই ঐহিক সুখ নিশ্চিত করতে যা যা দরকার তাই ব্যবহার করো– এ জন্যই চূড়ান্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথাটা উঠেছিল। ব্যক্তিই এখানে সব-কালেকটিভিজম, পরার্থপরতা এ সবের মূল্য নেই। পারত্রিকতারতো কোন জায়গাই নেই। রেনেসাঁর মানুষ এক স্বার্থপর মানুষও বটে। পৃথিবী গোল্লায় যাক তাতে কিছু আসে যায় না, আমারটা চাই। আজ পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

দেশের ভেতরে বাক স্বাধীনতা, ধর্মচিন্তা ও শিল্পের স্বাধীনতা, প্লুরালিজম, হিউম্যান রাইটস আরও অনেক চমৎকার চমৎকার জিনিস। আর দেশের বাইরে দমন নিপীড়ন আর পদানত করার স্বাধীনতা-আর এসব স্বাধীনতা সাধারণত

www.pathagar.com

নিয়োজিত হয় ধনতন্ত্রের যে ধর্ম সেই বাজার দখলের সেবায়। তাই ধনবাদীদের Infinity justice অন্যদের জন্য রীতিমত Infinity Injustice এ পরিণত হয়েছে।

আজ ধনবাদী বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ধনবাদী বিশ্বের জোট আবার ঘটনাক্রমে খ্রিস্টান ধর্মীয় জোটও। তাই এদের ক্রুসেডের ঘোষণা দিতে মোটেও দেরী হয়নি। এদের হাতেই আজ মানুষ মারার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার। সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ করেছে এরা। এ কালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা, পররাজ্য দখল, এক একটি জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ ও মানবাধিকার হরণের ঘটনা ঘটিয়েছে এরাই। এরা হিংসা ও যুদ্ধের পূজারী। আবার এদের মুখেই সবচেয়ে বেশি শান্তির ললিত বাণী। কেবল টেকনোলজী, কেবল যুক্তিবাদ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তাতো চোখের উপরই দেখছি।

বলার অপেক্ষা রাখে না নৈতিক অর্থে ধনবাদী বিশ্ব আজ ভগ্নপ্রায়, অর্থনৈতিক, সামরিক ক্ষমতা তার যাই থাকুক না কেন। প্রতিদিন তার ঘর সংসার ভাঙছে, দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে তার সমাজ কাঠামো। ধর্মশূন্য অপরাধপূর্ণ পশ্চিম, ড্রাগ, কুমারী মাতা, বয়ঃপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী এসব নিয়ে আর কতদিন পৃথিবী শাসন করতে পারবে তারা। বহু চিন্তাশীল মানুষ এ কালে এসব কথাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। অনেক মূল্য দিয়ে এ কালের মানুষ আজ তাই বুঝতে শুরু করেছে শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা, সমানাধিকারের বুলি দিয়ে সত্যিকারের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। মানব মর্যাদা, বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করতে হলে এক core of morality-নৈতিকতার মর্ম আবিষ্কার করা জরুরি। বলার অপেক্ষা রাখে না পাশ্চাত্য সে পরীক্ষায় বার বার ব্যর্থ হয়েছে। হয়তো এ কারণেই End of History, End of West-এও পর্যবসিত হতে পারে।

নৈতিকতার যেখানে বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যে কোন উপায়ই কার্যত ন্যায় হিসেবে গণ্য। আদতে হয়েছেও তাই। পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিশেষ করে আমেরিকার অর্থনৈতিক একাধিপত্য আজ ভেঙে পড়ছে। এই একাধিপত্য আবার একালে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল জনভোগ্যপণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে অস্ত্রের বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। এই প্রেক্ষিতেই বিশ্বরাজনীতিতে ধনবাদী বিশ্বের ভূমিকা বিচার করা জরুরি। বিশ্বে যদি যুদ্ধের অস্তিত্বই না থাকে তাহলে ধনবাদী বিশ্বের অর্থনীতি চলবে কি করে? তাই সমাজতন্ত্রের পতনের পরেও যুদ্ধের দামামা শোনা যাচ্ছে এবং ধনবাদী বিশ্বের শাসকশ্রেণীকে হন্যে হয়ে এখন ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে এক বিশ্বাসযোগ্য প্রবল শত্রুর সন্ধানে। এ প্রেক্ষিতেই পাশ্চাত্যে এখন শোনা যাচ্ছে হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘর্ষের' তত্ত্বের কচকচানি।

www.pathagar.com

মানবতা ও মানবাধিকারের উপাসক সেজেও তাই ধনবাদী বিশ্ব আজও এ গ্রহে এক নম্বর অস্ত্র বিক্রেতা। এদের সামরিক ব্যয় বাকি বিশ্বের সম্মিলিত সামরিক ব্যয়ের চেয়েও বেশি। ধনবাদী বিশ্বের গভীর অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই আজ তাদের একটা যুদ্ধ জরুরি। ১৯৯০ সালে ধনবাদী বিশ্বের একদা মিত্র ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন তাদেরই ইন্ধনে কুয়েত আক্রমণ করলে তখন ধনবাদী শাসকশ্রেণী পেয়ে যায় 'এক ঈশ্বর প্রেরিত সুযোগ।' বিপুল উদ্যমে তারা ইরাকের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আবার তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। পুঁজিবাদ মানেই যে যুদ্ধ, সংঘাত আর হানাহানি সেটাও আজ বুঝবার সময় এসেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানেই যে যুক্তিবাদ আর আত্মমর্যাদার ধারণা নয় সেটাও আজ নতুন করে বিবেচনার সময় এসেছে আমাদের।

মৌলবাদীরা কি সত্যি ঘৃণা ছড়াচ্ছেন

পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো মুসলমান মানেই 'সন্ত্রাসী' এই ধারণাটি দুনিয়া জুড়ে ভালভাবেই পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। মুসলমান মানেই মধ্যযুগীয়, বর্বর ও পশ্চাদপদ এই অভিধায় অভিষিক্ত হতে এখন তাদের মোটেও শ্রম স্বীকার করবার দরকার নেই। ভাবটা এমন মুসলমান মানেই খারাপ, তারা পশ্চিমের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য অহর্নিশ প্রস্তুত হচ্ছে আর পশ্চিমের লোকেরা সুশীল, তারা যুদ্ধ করে না, সন্ত্রাস করে না। মিডিয়ার এই স্টেরিও টাইপ এখন মুসলমানদের তাড়া করে ফিরছে। আর মিডিয়ার নিয়ন্ত্রক যেহেতু শক্তিশালী পশ্চিমই, সুতরাং মুসলমানদের নির্বিচারে চরিত্র হনন করা এদের কাছে ডাল-ভাত।

বুশ-ব্লেয়ার চক্র আজ ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। আর ক্রুসেড মানে যে মুসলমানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ এতো দুগ্ধপোষ্য শিশুরও জানা। কিন্তু মুসলমানদের বিভক্ত রাখবার জন্য এরা বলছে এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধেও না, মুসলমানের বিরুদ্ধেও না। এ যুদ্ধ নাকি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। ইরাকে অবরোধ জারী রেখে যে মাসুম শিশুগুলো হত্যা করা হয়েছে তারা কি মুসলমান না? অথবা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলী হামলা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে যারা মারা যাচ্ছে তারা কি অন্য ধর্মের মানুষ? ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ও মার্কিনীরা এরকম কথাই বলেছিল। এ যুদ্ধ ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধ আসলে সন্ত্রাসী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, যারা স্বাধীনতা ও সভ্যতার শত্রু। আসলে সন্ত্রাসী কারা? কারাই বা বেশি করে ঘৃণা ছড়াচ্ছে? নোয়াম চমস্কির কথাই ঠিক। শক্তিধররাই সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে এ যাবৎ হাত পাকা করেছে। শক্তিধরদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসই তাই শেষ বিচারে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু সমস্ত প্রচার মাধ্যম থাকে তাদের হাতের মুঠোয়। ফলে তারা এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করে যে তাদের সন্ত্রাস চেনা

www.pathagar.com

দুষ্কর হয়ে পড়ে। আর সেই সন্ত্রাসের শিকার দুর্বল মানুষেরা যখন তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেয়, প্রত্যাঘাত করে, তখনই শোরগোল পড়ে যায়। শক্তিধররাই সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে তাদেরকে ছাপ মেরে দেয় সন্ত্রাসী হিসেবে। এ কালে দুনিয়া জুড়ে সন্ত্রাসের প্রকৃত উৎস হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু মানবতা ও গণতন্ত্রের নামাবলীর আড়ালে তার বিরোধিতাকারীকেই যুক্তরাষ্ট্র আজ সন্ত্রাসী বানিয়ে দিচ্ছে। আলজেরিয়ার কথা ধরুন। সেখানেও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামী আন্দোলন এগুতে চেয়েছে, কিন্তু তারাও অত্যাচার নিবর্তন থেকে রেহাই পায়নি। আর দশটা রাজনৈতিক দলের মতোই তারা নির্বাচনে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল তারা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে জিতে গিয়েছে, ক্ষমতায় আসতে চলেছে। এবং তখনই পাশ্চাত্যের মদদে সেখানকার সামরিক একনায়কতন্ত্র তাদের উপর আঘাত হানল ব্যাপকভাবে। একই ঘটনা ঘটেছে ইজিপ্টে মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্ষেত্রে বা সিরিয়া, ইরাকে।

পশ্চিমীরা গণতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু এই গণতন্ত্রের ফলে ইসলামপন্থীরা কোথাও ক্ষমতায় এলে অবধারিতভাবে তাদের পিষে মারার ব্যবস্থা হয়। পশ্চিমী শক্তিগুলোর কাছে গণতন্ত্র কোন বিশ্বজনীন বা চরম মূল্যবোধ নয়। তুরস্ক বা আলজেরিয়ায় এটা প্রমাণ হয়েছে। গণতন্ত্র এখন এক ছাগ শিশু। পশ্চিমীদের ইচ্ছায় এর সংজ্ঞা নিয়ত পরিবর্তনশীল।

লক্ষণীয় আমেরিকা আজ তাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে যারা তার রাজনৈতিক বিরোধী অথবা তার দৃষ্টিতে আমেরিকার স্বার্থ ক্ষুণ্নকারী। আমেরিকা কি সব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে? সন্ত্রাসবাদী হয়েও যারা মার্কিন শাসকচক্রের পেটোয়া বা তাদের পক্ষের লোক, তাদেরকে তো তারা সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিতই করছে না, আক্রমণ করাতো দূরে থাক।

ওদের মানবাধিকার তত্ত্বতো আরও হাস্যকর। মৌলবাদীরা হাজারে হাজারে জেলে থাকলেও পশ্চিমীরা রা কাড়ে না। অথচ ওদের দুএকজনের গায়ে 'ফুলের আঘাত লাগলেও' মুর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা আর কি!

চেচনিয়া, বসনিয়া, মিন্দানাও, প্যালেস্টাইন সর্বত্রই একই অবস্থা। মরছে মুসলমান, সন্ত্রাসীর ভূমিকায় পাশ্চাত্য বা তার পেটোয়া সরকার। বসনিয়ায় আমরা যে মানবতার কারবালা দেখেছি তাকি কখনো সম্ভব হতো যদি ওখানকার মানুষ ঘটনাক্রমে মুসলমান না হয়ে খ্রিস্টান হতো? আসলে পশ্চিমের এসব কীর্তি বৃহত্তর ক্রুসেডেরই অংশ। বুশ-ব্লেয়াররা হিসেবে ভুল করেনি এবং এখন তারা একটা মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের মোকাবেলা করছে। পশ্চিমের এই ক্রুসেড একই সাথে একটি বর্ণবাদী যুদ্ধও। স্বভাবতই পাশ্চাত্যের মিডিয়া মুসলমানদের বর্বর, অসভ্য, পশ্চাদগামী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ কাউকে অসভ্য, অমানুষ, পশ্চাদগামী প্রমাণ করতে না পারলে তো এত সহজে গরু

www.pathagar.com

ছাগলের মতো বোমা মেরে হত্যা করা যাবে না। এবং শেষ বিচারে আমরা এখন যা দেখছি তা একটা ক্রুসেড এবং তার বিপরীতে মুসলমানের জেহাদ। তার মানে যুদ্ধটা এখন খ্রিস্টান ও মুসলমানের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। শুধু পশ্চিমের নানা কৌশলের কারণে এর স্বরূপ চেনা হঠাৎ করে দুষ্কর হয়ে পড়ে। আজ ক্রুসেডের নেতৃত্বে আছে পশ্চিমের সব পান্ডারা। পুরো খ্রিস্টান জগত আজ ঐক্যবদ্ধ, অর্থ ও সামরিক বলে তারা প্রায় অবধ্য। অন্যদিকে মুসলমানের জেহাদও চলছে কিন্তু পুরোপুরি অপরিকল্পিত ও নেতৃত্ব শূন্য। আর্থিক ও সামরিক অনগ্রসরতাও চোখে পড়বার মতো। এই অসম যুদ্ধে জেহাদকারীদের স্থান কোথায়? বোধ হয় তারা একজন গাজী সালাহউদ্দীনের অপেক্ষায় আছেন।

মৌলবাদের পন্থা কি সত্যি সেকেলে

কাজী আব্দুল ওদুদের মত লেখকেরা এক সময় ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনকে পশ্চাদগামী আন্দোলন হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ওদুদ সাহেবের চিন্তা-ভাবনার লোকেরা আজও কম নয়। শুনেছি ওদুদ সাহেব রেনেসাঁ পন্থী ছিলেন। ইসলামের সংস্কার তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু তার সেই সংস্কার চিন্তার সাথে মেনস্ট্রিম মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সেকালেই একটা মৌলিক তফাৎ ছিল। ওদুদ সাহেব কামাল পাশার গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন ইসলামকে কাটছাট করে Westernize করে ফেলতে। ওদুদ সাহেব তার দিক থেকে ঠিক কথাই বলেছিলেন কারণ তিনি পরের মুখে ঝাল খেয়েছিলেন। ওদুদ সাহেবরা যাদের মতাদর্শগত দিক দিয়ে ফ্রেন্ড, ফিলসফার ও গাইড মনে করতেন সেই ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ওহাবী ফরায়েজীদেরকে প্রথম পশ্চাৎমুখী হিসেবে ছাপ মেরে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ওহাবী ফরায়েজীদেরকে টেররিস্ট বলতেও কুপিত হয়নি। আজ যে পশ্চিমের বহুল আলোচিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এ কোন নতুন কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই তাদের প্রতিপক্ষকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে এসেছে। পার্থক্য এই একালে আমেরিকা যা করছে সেকালে এ দায়িত্ব ছিল বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির হাতে।

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ওহাবী-ফরায়েজীদের সংগ্রাম আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়। সেই গৌরবের বর্ণনা কিছুটা দেখতে পাওয়া যায় ব্রিটিশ আমলা উইলিয়াম উইলসন হান্টারকৃত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদীর জন্য ওহাবী-ফরায়েজীদের চেয়ে কে বেশি রক্ত ঝরিয়েছে? অথচ সেই রক্তরাঙা ইতিহাসও আজ আমরা বেঘোরে ভুলে গিয়েছি অথবা সেটার যথার্থ মূল্যায়ন করা আমরা প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করি না। কারণ সেটা মুসলমানদের লড়াই, ইসলাম যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছে সুতরাং সেটা সাম্প্রদায়িক ও

www.pathagar.com

মধ্যযুগীয় হতে বাধ্য। শুধু ইসলামপন্থী হওয়ার কারণে আজাদীর সৈনিক হবার পরও ওহাবী-ফরায়েজীদের কপালে তাই প্রগতিশীলতার তকমা জোটেনি। তাহলে প্রগতিশীলতার মানদণ্ডটা কি?

ফরায়েজীদের কথা ভাবুন। দুদুমিঞা ঘোষণা দিয়েছিলেন 'আল্লাহর জমিনে সকল মানুষ সমান', 'জমিদার নয়, জমির মালিক আল্লাহ', 'লাঙ্গল যার, জমি তার'। এসব শ্লোগানের ভাষা কি মধ্যযুগীয়? নিপীড়িতের পক্ষে ইসলামের এ লড়াইয়ের নাম কি পশ্চাৎমুখীনতা কিংবা প্রতিক্রিয়াশীলতা অথবা প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ড? প্রায় একই রকম কথা বলেছিলেন তিতুমীর, মোমেনশাহীর টিপু পাগলা, নোয়াখালীর শমশের গাজী আর উত্তর বঙ্গের ফকীর বিদ্রোহের নায়করা।

একটা জিনিস ভেবে অবাক হই, যে সব কমিউনিস্ট এদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে মুখে রীতিমত ফেনা তুলে ফেলেন তারাও ইসলামের এসব বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে নিষ্কুণ্ঠ ভাবে মেনে নিতে রাজি হন না। নানা রকম শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের আড়ালে এগুলোকে তারা খারিজ করতে চেয়েছেন। সূর্যসেন-ক্ষুদিরামের মৌলবাদী চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে আমরা মানতে রাজি, সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার লিবারেশন থিওলজিস্টদের কার্যক্রমে আমাদের আপত্তি নেই, এমনকি চার্চের বিরুদ্ধে যে লুথারের লড়াই সেখানেও ধর্মই প্রধান নিয়ামক শক্তি, তাও স্বচ্ছন্দে আমরা হজম করে ফেলি কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে যত আপত্তি। এই একটা ব্যাপারে কমিউনিস্ট, সেকুলার, লিবারেল ডেমোক্রাট সকলেই একমত- ইসলাম যেন সবার কমন এনিমি। ইসলামকে ভয় বলেই সাম্রাজ্যবাদের তল্পি বহনে আমাদের এলিট শ্রেণীর আপত্তি নেই।

ইসলামের এই কুশ্রী, অনাধুনিক ও বর্বর চেহারাটা তুলে ধরার কৃতিত্ব অবশ্যই পাশ্চাত্যের। কাকে আধুনিক বলা হবে, আর কাকে বর্বর বলা হবে তার ছাড়পত্র দেয়ার দায়িত্বও যেন আজ পাশ্চাত্যের। কিন্তু পাশ্চাত্যের আধুনিকতার ব্যাখ্যায় অন্যরা একমত হবেন এমন কোন কথা নেই। বিশেষ করে ইসলামকে নিয়ে যারা কাজ করছেন কিংবা ভাবছেন, তারা যে পাশ্চাত্যকে বাদ দিয়ে ভিন্ন রকমভাবে আধুনিকতার ধারণাকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন তাতো খুব স্বাভাবিক। পাশ্চাত্যের বাইরেও যে আধুনিকতা থাকতে পারে রেনেসাঁপন্থী ইসলামিস্টরা তাই আজ দেখাতে চেষ্টা করছেন। ইসলামের প্রগতিশীল ভূমিকার কথা কারও অজানা নয়। এসব ভূমিকার কথা এক সময় জোরে সোরে প্রচার করেছিলেন কমরেড এম এন রায়। রায় সাহেব Historical Role of Islam নামে একটা বিখ্যাত বইও লিখেছিলেন। সে বই আজকের কমিউনিস্ট কিংবা প্রগতিশীলরা পড়েন বলে মনে হয় না। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বিখ্যাত রোজার গারোদী এসব বিষয় নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি করেছিলেন। দুর্ভাগ্য হলো আমাদের দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের এসব পড়বার মতো সময় কৈ?

www.pathagar.com

যারা মনে করেন ইসলামকে নিয়ে আধুনিকতার চর্চা করা যায় না, তারা মিসর-ইরান-ইরাক-আলজেরিয়া সুদান প্রভৃতি দেশগুলোর পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দিকে চোখ ফেরাতে পারেন। মুসলমানের দুর্বলতাগুলো নিয়েই পশ্চিমের মিডিয়া অপপ্রচার চালায়। সেই দুরভিসন্ধি থেকেই তারা সালমান রুশদী, তসলিমাদের ব্যবহার করে। কিন্তু ইসলামের অন্তর্গত শক্তি সম্বন্ধে তারা মোটেও আগ্রহী নয়। তারা ভুলে যাচ্ছে ইসলামে পরিবর্তিত সময় বা আধুনিক জীবনের টানাপোড়েনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ইজতিহাদ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। ইজতিহাদ হলো সময়োপযোগী পরিবর্তনের জন্য স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের কৌশল। আধুনিক জীবন যুদ্ধের নানা রকম জটিলতার সব সমস্যার সমাধান আক্ষরিক অর্থে কুরআন-হাদীস থেকে নাও পাওয়া যেতে পারে– তার উত্তর খুঁজতে হয় কুরআনের নীতির ভিত্তিতে স্বাধীন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে। এই ইজতিহাদ প্রয়োগ করেই ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন সময় স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মসজিদে অনেকেই খুতবা পড়েছেন, এর পরিণতি হয়েছে দুঃখজনক। তাই বলে রাজা-বাদশার ব্যাখ্যাত বিধানকেই আল্লাহ বা রসুলের বিধান বলে স্বীকার করেনি ইসলাম। ইজতিহাদ আজও কাজ করছে এবং সেই কারণে মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম আজও অত্যন্ত শক্তভাবে টিকে আছে এবং পাশ্চাত্যের দিকে নতুন করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

রিভাইভালিস্ট বা রিসার্জেন্ট ইসলাম তো আজকের ভাবনা নয়। এর প্রবক্তারাও নিছক তকলীদ বা ভাগ্যবাদী নন। এরা পশ্চিমী চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে ইজতিহাদের আলোকে যুগ সমস্যার সমাধান চাইছেন। পশ্চিমের বাইরে ছাড়া কি আধুনিক হওয়া যায় না?

নবী মোহাম্মদ (স.) সেকালের আরবের প্রচলিত ফিউডাল ব্যবস্থার মধ্যে রীতিমত এক শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছিলেন। ইসলামে আরব-আজম, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন কোনো ভেদ নেই। ইসলামের নবীই তো ঘোষণা দিয়েছিলেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। শুধু ঘোষণা দিয়ে তিনি চুপ থাকেননি, কাজের মাধ্যমে তিনি সমাজ থেকে পুরোহিততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার সবকিছু ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করে দিয়েছিলেন। ইসলামের মধ্যে যে রাজতন্ত্র বা ক্ষমতাতন্ত্রের পত্তন ঘটেছে সেটা অনেক পরের ঘটনা এবং সেই ভেদজ্ঞানটাও রচিত হয়েছে সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কারণে। এখানে ইসলামের কোন অনুমোদন নেই। আমাদের জানা দরকার জামালুদ্দীন আফগানীর মতো রিভাইভালিস্টরা একালেও ইসলামের দুর্বলতার দিকগুলো সম্বন্ধে বলতে যেয়ে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিকে চিহ্নিত করতে ভুল করেননি। তবে ইসলামের মধ্যে যে অনাচার ঢুকে পড়েছে সেটা মিথ্যে নয় কিন্তু তার মানে এই নয় ইসলামের প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ইসলাম যে ধরনের মানবিক বা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে কিংবা তার নজীরও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখেছি তার তুলনীয় কি কিছু হতে পারে? এমন কি একালে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবিদাররা অনেক বিপ্লবী ঘটনার পরও সেরকম কিছু করে দেখাতে পারেননি। তাদের গুরু লেনিনের সময়ও না। আদতে কমিউনিজম বলতে বাস্তবে আমরা দেখেছি নতুন ধরনের প্রোলেতারিয়েত স্বৈরাচার।

আসলে ইসলাম কমিউনিজমও নয়, ধনতন্ত্রের লেসেজ ফেয়ারও নয়, দুয়ের মধ্যবর্তী একটা পন্থা। ইসলাম মানুষকে যন্ত্রও বানায় না কিংবা সীমাহীন স্বাধীনতাও দেয় না। এর মধ্যবর্তী একটা অবস্থান ও সমাধান দেয়।

পুঁজি আর সম্পদ নিয়ে ইসলামের ব্যাখ্যাটা আরও যুগান্তকারী। ইসলামে সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়, তারা শুধু আমানতদার। প্রয়োজনটা কার কেমন সেটাই সম্পত্তির হকদার হবার বৈশিষ্ট্য। তাই অব্যবহৃত জমি কারো দখলে থাকা ইসলাম অনুমোদিত নয়, তেমনি অতিরিক্ত ধনসম্পদ সঞ্চয়কেও ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। ইসলামের এসব ব্যাখ্যাকে কি প্রগতিশীল মনে হয় না?

ইসলামের আর একটা ব্যাপার নিয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ও তার এদেশীয় এজেন্ট এলিটরা বড় বেশি হৈচৈ করেন। তা হচ্ছে ইসলামের চোখে নারীর স্বাধীন সত্তা আছে কি নেই। কি অদ্ভুত প্রশ্ন? এ দুনিয়ায় ইসলামের আগে এমন কি পরেও ইসলাম যে রকম করে নারী অধিকারের কথা বলেছে, তার তুলনীয় কেউ কি করতে পেরেছে? পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতা মানে যৌন স্বাধীনতাও এবং সেই যৌন স্বাধীনতা নারীর মানবী পরিচয় কেড়ে নিয়ে স্রেফ রমনীয়তাকেই উস্কে দিচ্ছে। যৌন সম্পর্কের একান্ত চরিত্রগুলো আজ সেখানে অনুপস্থিত। বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধনগুলো আজ শিথিল, বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক বস্তুবাদ ও রাজনৈতিক সেকুলারিজম যেমন বহু মুসলমানের ধর্মীয় ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি পশ্চিমের খোলামেলা জীবনধারা আমাদের এখানে অনেক নারীকেও করে তুলেছে শেকড়হীন। বাণিজ্যিক স্বার্থে শরীরী সুখের জন্য নারী আজ অহর্নিশ ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের মডেলে শরীরের পোচ দিতে যেয়ে আজ চতুর্দিকে কাম হুতাশন উস্কে দিচ্ছে নারী। (মডেল কন্যা তিন্নির মর্মান্তিক পরিণতির কথা স্মরণ করুন) বোঝা দরকার কমিউনিজমে নারী গণসম্পত্তি, ধনতন্ত্রে নারী ভোগ্যপণ্য। অন্যদিকে ইসলামের নারী এক শুদ্ধ ও কল্যাণব্রতের প্রতীক।

ইসলাম নারীর সব রকমের অধিকারই দিয়েছে। সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, জিহাদের অধিকার, ব্যবসার অধিকার, চাকরীর অধিকার, প্রার্থনায় যোগদানের অধিকার। এটা সত্য পরবর্তীকালে শরীয়তের নানা অপব্যবহার হয়েছে। শরীয়তকেই অনেকক্ষেত্রে অপব্যবহার করা হয়েছে নারীর

www.pathagar.com

অধিকার হরণে। ঐতিহাসিক অবক্ষয়ের ধাক্কায় সদর্থক ভবিষ্যৎ চিন্তার বদলে রক্ষণশীল কুপমণ্ডুকতায় আটকে গেছে মুসলমান সমাজ। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে আজকের পশ্চিম। আর পশ্চিমের মুখে ঝাল খেয়ে আমরা অনেকেই এখন বলতে শিখেছি ইসলামের সাথে আধুনিকতা মানায় না। এ লজ্জা আমাদের।

মৌলবাদ কি বিশ্বায়নের বিকল্প

বিশ্বায়নের নিও কলোনিয়ালিজম সম্বন্ধে এখন অনেকে সচেতন হচ্ছেন। দুনিয়া জুড়ে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগে ছোট বড় সবজাতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির তত্ত্ব যে একটা বড় ধরনের ভাওতা এবং পাশ্চাত্যের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার আদপে এটি যে ধনতন্ত্রের এক নতুন প্রোজেক্ট তা বুঝতে এখন কারো বাকি নেই।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুটোরই পরীক্ষা নিরীক্ষা মুসলিম দুনিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে কিন্তু শেষ বিচারে কোনটিই কাঙ্ক্ষিত ফল দেয়নি বা মুক্তি আনেনি। পুরো মুসলিম দুনিয়ায় চলছে এক মতাদর্শিক সংকট। সেই সংকট মোচনে ইসলাম এগিয়ে এসেছে।

তার উপর রয়েছে ব্যাপক পশ্চিম বিরোধী ঘৃণা। পশ্চিমী সভ্যতা আসছে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে। বিশ্বায়নের যুগে দেশীয় অর্থনীতিগুলো ভেঙে পড়ছে, সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি তছনছ হচ্ছে। তার উপরে ইরাক প্যালেস্টাইনে পশ্চিমী সামরিক আগ্রাসনতো চলছেই। এসব ক্ষেত্রে ইসলাম একটা বড় ভূমিকা নিচ্ছে। পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজস্ব সত্তা বজায় রাখতে ইসলামই এখন এদের পরিচয় ও উৎসাহ যোগাচ্ছে।

এসব ক্ষেত্রে মৌলবাদের বিচারে ইসলামপন্থীদের থেকে অন্যধর্মের মৌলবাদীদের ফারাকটা বোঝা দরকার। ভারতের সংঘ পরিবার মার্কা হিন্দুত্ববাদীরা কিংবা ইউরোপের Catholic Opus Die, ফরাসী Archbishop Lefebre-এর প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন কিংবা নিউইয়র্কে Maire Kahane-এর অনুসারীরা হিন্দু বা খ্রিস্টান জনসাধারণের মধ্যে ওরকম জনপ্রিয় নন, যতটা ইসলামপন্থীরা মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে। কারণ হিন্দুত্ববাদে কিংবা মৌলবাদী খ্রিস্টানদের নীতির মধ্যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকাঠামো এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিধান নেই। ইসলামে সে ঐতিহ্য আছে। ইসলামপন্থীরা কুরআনী নীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদের যুগোপযোগী ব্যবহার করে ইসলামিক সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতি। বাস্তবিক তারা করছেনও তাই।

মৌলবাদ শব্দটার ব্যাপ্তি হালজামানায় এত প্রসারিত হয়েছে মূলত রাজনৈতিক কারণেই। অতীতে মৌলবাদ বলতে প্রোটেসট্যান্ট খ্রীস্টানদের এক সম্প্রদায়কে বোঝানো হতো। এই মৌলবাদী দলের বিশ্বাস ছিল বাইবেলের প্রতিটি বাক্য আক্ষরিকভাবে সত্য ও অভ্রান্ত। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করাকে তারা

www.pathagar.com

গুরুতর অপরাধ বলে মনে করতেন। আদতে বাইবেলের মৌলিকত্ব বলে এখন কিছুই নেই এবং এটা কয়েকটি ভাষায় রচিত বইয়ের সংগ্রহ মাত্র। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানরা ভাল করেই জানে।

সে অর্থে ইসলামের কুরআনের ভাষা ও খ্রিস্টানদের বাইবেলের ভাষায় কোন মিল নেই। রসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর যে কুরআন নাজিল হয়েছিল তা অদ্যাবধি অবিকৃত আছে। পৃথিবীর সব অঞ্চলের মুসলমানরা কিন্তু কুরআনের একই পাঠের সাথেই পরিচিত। বাইবেলের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। তাই যে প্রক্রিয়ায় বাইবেলের মূল বিকৃত হয়ে গেছে এবং যে কারণে খ্রিস্টানদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন মূল বাইবেলে প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে সত্যিকার কল্যাণের উপায়, সে প্রক্রিয়া ইসলামে কখনোই দেখা যায়নি। খ্রিস্টানরা যে অর্থে মৌলবাদ শব্দের ব্যবহার করে, সে অর্থে মুসলমানরা কখনোই মৌলবাদী ছিলেন না।

কিন্তু আজকাল মৌলবাদ বলতে পাশ্চাত্য মিডিয়া দুনিয়া জুড়ে এমন একটা পরিবেশ বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাতে এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক মৌলবাদ মানেই কোন ইসলামীপন্থা অথবা কোন না কোন মুসলিম এর সাথে জড়িত। মৌলবাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য যাই থাকুক না কেন মৌলবাদ বলতে আজকাল একটা ভয়ানক ও কুশ্রী জিনিস বোঝায়, যা নাকি মানব সভ্যতার জন্য গভীর বিপদাশংকার কারণ হয়ে উঠতে পারে। ভাবটা এমন মৌলবাদ দমন করতে অপারগ হলে পৃথিবীতে যেন গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কোন কিছুই আর টিকে থাকবে না। সুতরাং যে উপায়েই হোক এটাকে নির্মূল করা চাই।

আজকাল মৌলবাদের সাথে Fanaticism, বাংলায় যাকে বলে ধর্মান্ধতা তাকে এক সাথে যুক্ত করে দেখা হচ্ছে। সে অর্থে ইসলামপন্থীরা কখনোই Fanatic নয়।

ধর্মান্ধতা আলাদা জিনিস। অনেকটা ফ্যাসিবাদী চিন্তা চেতনা প্রসূত। ধর্মান্ধতার মানে হচ্ছে, আমার নিজের ধর্মবিশ্বাসের সাথে যে জীবনধারার মিল নেই তার উপর আক্রমণের বা তাকে নির্মূল করার চেষ্টা। অন্য কথায় অন্য কোন জীবন বিশ্বাস নিয়ে কেউ বেঁচে থাকুক এটা আমি বরদাশত করবো না। ইসলামপন্থীরা সে অর্থে কখনোই Fanatic নয়। ইসলামপন্থীরা ইসলামের সংস্কার চান, ইসলামের উন্নতি প্রগতি দেখতে চান। তার অর্থ এই নয় তারা অসহিষ্ণু বা পারস্পরিক সহাবস্থানে অবিশ্বাসী। ধর্মান্ধতার দুএকটা উদাহরণ দেই। ভারতে প্রতি বছর কোরবানী নিয়ে যে সব কাণ্ড ঘটে তা হচ্ছে ধর্মান্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিজেপি বা সংঘ পরিবারের সরকার পুরো ভারতেই এখন চাচ্ছে গরু কোরবানীকে নিষিদ্ধ করে দিতে। তার মানে একদল লোক গো-দেবতা পূজা করে বলে অন্যদেরকেও বাধ্যতামূলকভাবে গরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটা ফ্যানাটিসিজম ছাড়া আর কি?

www.pathagar.com

একালে ধর্মান্ধতার আর একটা বড় নজীর হচ্ছে জায়নিজম বা ইহুদীবাদ। যে প্রক্রিয়ায় ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা শুধু ধর্মান্ধতাই নয়, রীতিমত মধ্যযুগীয় বর্বরতা। আমার দেশ বা বসতবাটী নেই বলে অন্যকে নির্মূল বা ধ্বংস করে আমার দেশের পত্তন ঘটাতে হবে এ ধারণা যদি ফ্যানাটিসিজম না হয় তা হলে ফ্যানাটিসিজমের অর্থই নতুন করে সংশোধন করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য মিডিয়া এ সব কর্মকাণ্ডকে কখনোই মৌলবাদ বলে না। এমনকি ভারত বা ইসরায়েলকে মিডিয়া কখনোই মৌলবাদী বা সন্ত্রাসবাদী হিসেবে উল্লেখ করে না। গুজরাটের নরমেধযজ্ঞ কিংবা প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, মিডিয়া বরাবরই এগুলোকে উপেক্ষা করে চলে। তাদের দৃষ্টিতে ভারত কিংবা ইসরায়েল হচ্ছে প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট নমুনা। এ হচ্ছে পাশ্চাত্যের ভণ্ডামী।

আগেই বলেছি এখন মৌলবাদ ও মুসলমান এ দুটো শব্দ একার্থ হয়ে গেছে। বিশেষ করে মৌলবাদ শব্দটার ব্যবহার জোরে-শোরে শুরু হয় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যখন একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র তেল আবিষ্কারের ফলে রাতারাতি অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর প্রতাপশালী হয়ে ওঠে এবং এসব দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে তখন থেকেই পশ্চিমের ইংগিতে মৌলবাদী আন্দোলন বলার একটা রেওয়াজ শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের জনগ্রহণযোগ্যতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য এখন আর ধর্মীয় ও সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। এরা পুরোপুরি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের দিকে এগুচ্ছে এবং কোথাও কোথাও সফলও হয়েছে। এরা একই সাথে ইসলামের ভিতরকার অনাচারগুলো দূর করে একে আরো বিকশিত করতে চান পাশাপাশি মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে বড় রকম ভূমিকাও রাখছেন। পাশ্চাত্যের কাছে এখন তাই মনে হচ্ছে এই তথাকথিত মৌলবাদী সম্প্রদায় ক্ষমতার অধিকারী হলে পাশ্চাত্যের প্রভাব আর টিকবে না। আর এখানেই পাশ্চাত্যের নীতিবর্জিত মৌলবাদ বিরোধিতার রহস্য লুকিয়ে আছে।

আগেই বলেছি পাশ্চাত্য বাক স্বাধীনতার কথা বলে, কিন্তু বিশ্বাস করে না। ইসলামের পক্ষে মত প্রকাশ করাকে সে অবধারিতভাবে মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে। এ এক ধরনের স্ববিরোধিতা। এক দিকে আমরা বলছি গণতন্ত্রে সকলের কথা বলার অধিকার থাকবে, অন্যদিকে অবশ্যই মৌলবাদীরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

বিখ্যাত কথাশিল্পী জর্জ অরওয়েল তার অ্যানিমেল ফার্ম উপন্যাসে সাম্যবাদী জন্তু জানোয়ারের এক কৌতুহলোদ্দীপক ছবি এঁকেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি হাস্য রসাত্মক বর্ণনা মনে হলেও এর গভীরে অনেক সত্য লুকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

খামারে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার পর ঘোষণা করা হলো all animals are equal। কিন্তু দিনে দিনে এরি মধ্যে শুকররা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলো। তারা সব ক্ষমতা কুক্ষীগত করলো। সাম্যবাদের শ্লোগান আগের মতোই থাকলো কিন্তু দেখা গেলো নতুন একটি শ্লোগান খামারের সাইনবোর্ডে যায়গা করে নিয়েছে- all animals are equal but some animals are more equal than others।

তার মানে বাকস্বাধীনতা ঠিক আছে কিন্তু ইসলামপন্থীদের দমন করেই বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের উজ্জীবন ঘটাতে হবে। পাশ্চাত্যের পান্ডারা আজ এ নীতিই অবলম্বন করেছে আর পুরো পাশ্চাত্য হয়ে উঠেছে অরওয়েলের একটি অ্যানিমেল ফার্ম।

মতাদর্শ দিয়ে অন্য মতাদর্শকে ঠেকাতে হয়। পশ্চিমের মতাদর্শগত জীর্ণতা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই পাশ্চাত্যের প্রভুরা ইসলামকে ঠেকাতে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিচ্ছে। কিন্তু তাতে কি ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকানো যাবে?

ভবিষ্যতের মুখোমুখি

ইসলাম আজ এক গভীর রূপান্তর ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলেছে। এর এক প্রান্তে রয়েছে ইসলামের জন্য নব অভ্যুত্থানের আভাস। অন্যদিকে আছে ইসলাম অনুসারীদের অনুকরণশীলতা, দুর্নীতি, অসদাচার ও নিমজ্জমান চেহারা। ইরাকের কথা ভাবুন। পাশ্চাত্যের ভয়ানক রকমের আগ্রাসনকামিতা ও ধ্বংসযজ্ঞ এর দিকে এখন ধেয়ে আসছে। ত্রয়োদশ শতকে বাগদাদের উপর যেমন করে হালাকু খানের দুর্ধর্ষ মঙ্গোল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার সাথে এ অবস্থার অনেকখানি তুলনা করা চলে। মঙ্গোলরা যখন আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ দখল করে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় তখন তারা শুধু ইসলামকে ধ্বংস করেনি, একটা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অবক্ষয়িত সমাজকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে এত বড় একটা মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র ধ্বংস স্তুপে পরিণত হওয়ার কারণ খুঁজে ও বুঝে দেখার চেষ্টা করেছেন।

শেষের দিকে আব্বাসীয় খেলাফতের নামমাত্র অস্তিত্ব ছিল। খেলাফত পরিণত হয়েছিল পরিবারতন্ত্রে, খেলাফতকে তারা মনে করতেন পারিবারিক সম্পত্তি। শরীয়াহর ব্যবহার যোগ্যতা অকিঞ্চিতকর হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তির ইচ্ছাই শরীয়াহর জায়গা দখল করে নিয়েছিল। জনগণের সাথে খলিফাদের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যবহৃত হতো খলিফাদের ইচ্ছায়। একটা উদাহরণ দেই। যারা আরব্য উপন্যাসের গল্পের সাথে পরিচিত তারা বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ বস্তুগত ভোগ ও লালসা তখনকার মুসলিম আমীর ওমরাহদের বেঁধে ফেলেছিল। খলিফা মোতওয়াক্কিলের ছিলো ৪০০০ শয্যা সঙ্গী। এরকম নজির অগণিত দেওয়া সম্ভব। এবার বুঝুন এরকম একটা খেলাফত যার ভিতর থেকে দুর্নীতি ও

www.pathagar.com

অনাচারের ঘুনপোকা কেটে কেটে এমন জীর্ণ করে ফেলেছিল যে এর পক্ষে আর বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করার সামর্থ্য আদৌ ছিল না। মঙ্গোল আক্রমণ তাই প্রায় অবধারিতই ছিল।

এটা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা এবং একালের মুসলমানদের জন্য ভাববার বিষয় মঙ্গোলরা যখন বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছিল তখন তারা পবিত্র কুরআন থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের এই ধ্বংস কামিতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতো। হালাকু খান এক চিঠিতে লিখেছেনঃ

Prayers against us will not be heard, for you have eaten forbidden things and your speech is foul, you betray oaths and promises, and disobedience and fractiousness prevail among you. Be informed that your lot will be shame and humiliation. "Today you are recompensed with the punishment of humiliation, because you are so proud on earth without right and for your wrongdoing." (Surah 46, Al Ahqaf), "Those who have done wrong will know to what a (great) reverse they will be overturned" (Surah 26, Ash Shuara)."

হালাকু আরো নিশ্চিতভাবে ভবিষদ্বাণী করেন ঃ

You will suffer at our hands the most fearful calamity, and your land will be empty of you.

সেকালের বহু আলেম বাগদাদের এই সব অবক্ষয়িত শাসকের বিরোধিতা করেছেন। এমনকি সেকালের শীর্ষ স্থানীয় শিয়া আলেম নাসিরুদ্দীন তুসী, ইমাম খোমেনী যাকে প্রশংসা করেছেন তিনি মঙ্গোল বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কিতাব-উল-ফকরীতে উদ্ধৃত একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে চাই। আল্লাহর আইনের নিরপেক্ষতা সন্দেহাতীত এবং এর প্রয়োগশীলতা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে কাজ করে। কিতাব-উল-ফকরীর লেখক বলেছেন শাসকের জন্য ন্যায়ানুশীলন আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এর থেকে বিচ্যুতি আল্লাহর কাছেও অপছন্দনীয়। বাগদাদ ধ্বংসের পর হালাকু খানের সামনে যখন দুর্ভাগা খলিফা আল মুস্তাসিনকে হাজির করা হলো তখন হালাকু খান সে সময়ের সেরা মুসলিম আলেম ও ফকীহদের ডেকে এ ব্যাপারে একটি ফতওয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন যার উপরে খেলাফতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল ঃ

Which is preferable (according to the Shariah) the disbelieving ruler who is just or the Muslim ruler who is unjust—শরীয়াহর দৃষ্টিতে কোনটি উত্তম, অবিশ্বাসী ন্যায়পরায়ন শাসক নাকি অত্যাচারী মুসলিম শাসক? হালাকু খানের এ প্রশ্নে যখন সব আলেমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন সে সময়

www.pathagar.com

তখনকার দিনের বড় আলেম রিজাউদ্দীন আলী ইবনে তাবাস উঠে দাঁড়ান এবং ঘোষণা দেন ঃ ন্যায়পরায়ন অবিশ্বাসী শাসকই উত্তম। অন্যান্য আলেমরাও তার ফতওয়াকে একে একে অনুমোদন করেন। এর পরেই খেলাফতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

আমরা জানিনা হালাকু খান কোনো রকম চাপের মুখে এ ধরনের ফতওয়া জোগাড় করেছিলেন কি না। যে ভাবেই ঘটুক না কেন এ প্রশ্ন ও তার উত্তরের মধ্যে সেদিনের সমস্যার গভীরতা বোঝা যায়। যে সমস্যা আজও মুসলিম বিশ্বকে তাড়া করে ফিরছে কোন সন্দেহ নেই। সেদিনের বাগদাদ ও এদিনের বাগদাদের মধ্যে কি গভীর মিল দেখুন।

একালের বাগদাদের শাসক সাদ্দাম হোসেন একজন পুরোদস্তুর স্বৈরশাসক ও একনায়কও বটে। ইসলামে তার কোন আস্থা নেই। তার বাথ পার্টি অবিশ্বাস, নাস্তিক্য আর দুঃশাসনের আখড়া। এমনই স্বৈরশাসক তিনি ক্ষমতান্ধ হয়ে নিজের দেশের হাজার হাজার মানুষকে বিষাক্ত গ্যাস বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করতেও দ্বিধা করেননি। এমনকি তার ছেলেও রেহাই পায়নি। পুরো দেশটাকে তিনি পরিবারের সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছেন। এ চিত্র আজ ইরাকের নয়, মুসলিম দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই। সাধারণ মুসলমান আজ দ্বিধান্বিত তারা কোথায় যাবে ঃ তারা না পারছে সাদ্দামকে সমর্থন করতে না পারছে পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা আসন্ন ধ্বংসযজ্ঞ ঠেকিয়ে দিতে।

তাহলে কি সেদিন হালাকু খানের সামনে রিজাউদ্দীন আলী ইবনে তাবাস সত্য কথাটাই বলেছিলেন। অনেকেরই তাবাসের সাথে মতান্তর হতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয় আবার তাবাসের পক্ষ সমর্থনকারীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কিংবা জাতি সবার পক্ষেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তাবাসের পক্ষে কথা বলতে এগিয়ে এসেছেন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী নও মুসলিম মার্মাডিউক মোহাম্মদ পিকথল। তার বিখ্যাত বই Cultural Side of Islam থেকে প্রাসংগিক অংশটুকু উদ্ধার করছি ঃ

All knew that it was the right answer, for the Muslims can not keep two standards, one for the professed believer and the other for the disbeliever, when Allah, as His messenger proclaimed, maintains one standard only. His standard and His judgement are the same for all. He has no favourites. The favoured of Allah are those who ever and wherever they may be, who keep His Laws. The test is not the profession of a particular creed, nor the observance of a particular set of ceremonies; it is nothing that can be said or performed by any

www.pathagar.com

body as a charm, excusing his or her shortcomings. The test is conduct. The result of good conduct is good, and the result of evil conduct is evil, for the nation as for the individual. That is the teaching of Islam, and never has its virtue been more plainly illustrated than in the history of the rise and decline of Muslim civilization.

পিকথলের কথার মর্মোদ্ধার করা কঠিন কিছু নয় এবং এখানে তার সাথে মতান্তর হবার সম্ভাবনাও কম। আসলে ইসলাম তার মতাদর্শিক শক্তি দিয়েই একদিন বিশ্বজয়ী হয়েছিল। পাশ্চাত্যের আধিপত্যকামিতা ঠেকাতে এখনও আমরা ইসলামের এই নৈতিক শক্তির অভ্যুত্থানের কথাই বলি। ভাববার বিষয় হলো মুসলমানের এই নৈতিক শক্তি কতটুকু আজ অবশিষ্ট আছে? সাম্প্রতিক কালে মালায়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জনাব মাহাথির মোহাম্মদ ইরাক সমস্যা মোকাবেলা করবার জন্য মুসলমানদের করণীয় কি সে নিয়ে বর্তমান ওআইসির চেয়ারম্যান কাতারের আমীরকে সদস্য দেশগুলোর একটি জরুরি শীর্ষ সম্মেলন ডাকবার অনুরোধ করেছিলেন। কাতারের আমীর, যিনি আবার যুক্তরাষ্ট্রের অনুগ্রাহীও সে প্রস্তাবে যথাযথ সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভাবুন এবার আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের নীতি ও মূল্যবোধ আজ কোথায় এসে ঠেকেছে। এমনি করে বসনিয়া, চেচনিয়া, মিন্দানাও. কাশ্মীর, প্যালেস্টাইন কোথাও মুসলমানরা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। আমরা এক গা বাঁচানোর নীতি নিয়েছি। মুসলিম উম্মাহর ধারণা কি মীথ (Myth) হয়ে যাচ্ছে না?

আবার একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে যাই। বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস করে দিয়েছিল মঙ্গোল ট্রাইবসের লোকজন। যেমন করে এর আগে আরবের মরুভূমি থেকে উঠে আসা ট্রাইবসগুলো সেকালের বড় দুই সাম্রাজ্য পারস্য ও রোমকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। এ দুটো ঘটনার মধ্যে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও একটা মৌলিক তফাৎও স্পষ্ট। মঙ্গোলদের কাছে তাদের ট্রাইবালিজম ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, কিন্তু আরবদের হাতে ছিল এক বিশ্বজনীন মতাদর্শ। সেই মতাদর্শিক শক্তির সামনে কয়েক বছরের মাথায় মঙ্গোলরা পরাজিত হলো। ১২৬০ সালে সিরিয়ার আইন জালুতে মামলুকরা মঙ্গোলদের চিরতরে ঠেকিয়ে দিল। কয়েক দশকের মধ্যে মঙ্গোল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আশ্চর্যের ঘটনা কালে কালে এদের আবার অধিকাংশই ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং মুসলমান হয়ে গেল। এই নব-অভ্যুত্থিত মুসলমানরাই পরবর্তীকালে উসমানী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করে। মঙ্গোলদের অন্তর্জগতের এই মহা-বিপ্লব ও রূপান্তরকে লক্ষ্য করে ইকবাল লিখেছেন ঃ দেবালয় থেকে বেরিয়ে এল কাবার প্রহরী।

www.pathagar.com

সেকালের মতো এ কালেও ইসলামের আত্মা আবার দুলে উঠেছে। একই সাথে আশা ও নৈরাশ্য, জয় ও পরাজয়, বেদনা ও সুখ, স্বস্তি ও সমস্যা, প্রগতি ও অগতি তার আত্মাকে চারদিক থেকে আন্দোলিত করছে। মনে হচ্ছে পুরো মুসলিম উম্মাহ্ নিশ্চিত অনিশ্চিতের এক ভেলায় উঠে পড়েছে।

কারো কারো ধারণা হতে পারে ইসলামের জন্য এ এক ক্রান্তিকাল। কালের এই চ্যালেঞ্জকে ইসলাম কি মোকাবেলা করতে পারবে? আসল কথা হলো চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়লে একটা জাতি তার উপর আপতিত জড়তার ভার কিভাবে ছুঁড়ে ফেলবে? আজকের ইউরোপ বা পশ্চিমী সভ্যতা একদিনে বর্তমানের পর্যায়ে পৌঁছেনি। কয়েকশ বছর ধরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে নানা রকমের সংস্কার আন্দোলন, অন্তর্যুদ্ধ ও বিপ্লবের দাপট সহ্য করতে হয়েছে। ইকবাল মনে করতেন এ ধরনের নানা রকমের আঘাত এখন মুসলমানদের জন্য এগিয়ে আসছে। এটিকে তিনি মূলত মুসলিম জাতির জন্য স্বাস্থ্যকর মনে করতেন। তার কথায় ঃ

এখন ইসলামের আত্মা সেরকম ঝঞ্ঝায় আন্দোলিত,
এতে কার্যকরী হচ্ছে আল্লাহর গোপন ইচ্ছা-
যার অর্থ ভাষায় অপ্রকাশ্য।
সেই সমুদ্রের গভীরতার দিকে তাকাও
এবং দেখ, কি এগিয়ে আসছে।
দেখ, কিভাবে বর্ণাবলীর পরিবর্তন হচ্ছে
সেই সুনীল গম্বুজের বেস্টনীতে।

এখানে 'আল্লাহর গোপন ইচ্ছা' কথাটা মূল্যবান। তিনি কুরআনীয় নীতির ভিত্তিতে ইতিহাসের ধারা অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন এবং এ অনুধাবনের চেষ্টা একবার সফল হলে আর পিছনে ফিরে তাকাবার দরকার নেই। তখন মুমিন-বিশ্বাসীদের কর্তব্য হচ্ছে পরস্পরকে সহযোগিতা করা, সুন্দর ও ন্যায়ের বাস্তব রূপায়নের জন্য আল্লাহর নীতির পক্ষে কাজ করা এবং সফলতার জন্য অপেক্ষা করা। আমার মনে হয় সে সময় এখন সমুপস্থিত।

www.pathagar.com

সংস্কৃতির বিশ্বায়ন

১

বিশ্বায়ন কথাটা ভ্রমাত্মক এবং কখনো কখনো রীতিমত দিক বিদেশহীন। গভীরভাবে বিবেচনা করলে বিশ্বায়ন কথাটার তাৎপর্য আমাদের কয়জনের কাছে অর্থবোধক ও উপলব্ধি সাপেক্ষ সেটাও একটা প্রশ্ন। ইদানীং পাশ্চাত্য মিডিয়ার জোরে শব্দটি এক অভাবিত ব্যঞ্জনা লাভ করেছে এবং সে সূত্রেই বলা হচ্ছে এখন নাকি বিশ্বায়নের যুগ। কিন্তু এ যুগের রূপ, প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো কি যার জন্য বিশেষভাবে বলা হচ্ছে বিশ্বায়নের কথা তা যদি না বোঝা যায় তাহলে পুরো ব্যাপারটাই অস্পষ্টতার অন্ধকারে তলিয়ে থাকবে।

অনেকেই মনে করেন তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উৎকর্ষতার পাশাপাশি পারস্পরিক যোগাযোগ ও তথ্য প্রবাহের বদৌলতে পৃথিবীর দূরতম কেন্দ্রটিও আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তে কোন ঘটনা ঘটলে মুহূর্তেই তা অন্যপ্রান্ত স্পর্শ করছে। বলা চলে কোন তথ্যই আজ প্রকৃতপক্ষে মানুষের অগোচরীভূত থাকছে না। এই রূপান্তর ও যোগাযোগ প্রক্রিয়াগুলো বিশ্বায়নের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের কালে এবং আমাদের চোখের সামনে সালমান রুশদী ও তার সাটানিক ভার্সেসকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা ও উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল তা মুহূর্তের মধ্যে যুক্তরাজ্য থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্ত স্পর্শ করে। এ বইয়ের প্রতিবাদকারী কয়েকজন মুসলিম শহীদ হন। উপর্যুপরি সরকারী ঘোষণা, মিডিয়া আলোচনা ও প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও প্রতিবাদসমূহ একটা প্রবল ঝড়ের সূচনা করে। এত প্রবল গতি ও মাত্রায় ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি। এই প্রবলতা, প্রবহমানতা ও গতির ঝাপটা একান্তভাবে বিশ্বায়নের যুগের বৈশিষ্ট্য। সংগত কারণেই বিশ্বায়নের যুগকে আমরা মিডিয়ার যুগও বলতে পারি। আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্য মিডিয়া ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে যুক্ত কতকগুলো শব্দ চয়ন করে যেমন জিহাদ, ফতওয়া, আয়াতুল্লাহ, হারেম ও হিজাব। এসব শব্দ চয়নের পিছনে তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যও কাজ করে। পশ্চিমী দুনিয়ার ট্যাবলয়েডের বদান্যতায় এসব শব্দ এখন ইংরেজি ভাষায়ও প্রবেশ করছে। এসব শব্দের ধর্মীয় তাৎপর্য যাই থাকুক না কেন পশ্চিমী দুনিয়ায় এগুলো এখন কদর্থ গালির পর্যায়ভুক্ত। এ অবস্থা ইসলাম ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের একটি দিক নির্দেশ করে এবং ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের নেতিবাচক মনোভাবের ইংগিত দেয়।

www.pathagar.com

একইভাবে পাশ্চাত্য মিডিয়া মুহূর্তের মধ্যে কাউকে সেলিব্রেটি বানিয়ে ফেলে, কাউকে ভিলেন তৈরি করে। মুসলিম জগতের ইমাম খোমেনী, গাদ্দাফী ও সাদ্দাম হোসেন এবং সাম্প্রতিক সময়ের ওসামা বিন লাদেন এর বড় উদাহরণ। এদের মানবিক গুণাবলী যাই থাকুক না, শক্তিশালী মিডিয়ার জোরে এদের ইমেজ সংকট এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেন ভয়ংকর কোন বস্তু বা জীবও এদের সমতুল্য নয়। তথ্যের এই অনুপম বিকৃতি, বিচ্যুতি, বিপর্যয়, ধ্বংস ও অপব্যবহারের তুলনাও এ যুগের মতো আর কখনো ঘটেনি। বিশ্বায়নের যুগে এটিও আমাদের মনে রাখা চাই।

হিজাব ও হারেম মুসলিম সংস্কৃতিতে যতো বিশুদ্ধতার প্রতীকই হোক না কেন পাশ্চাত্য মিডিয়ার বদৌলতে হিজাব এখন এক মধ্যযুগীয় পন্থা, সবরকমের পশ্চাদপদতা, অনগ্রসরতা, অনবধানতা ও নারী নিগ্রহের নমুনা। অন্যদিকে হারেমের অর্থ এসে দাঁড়িয়েছে সকল রকমের যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও লাম্পট্যের অভয়ারণ্য হিসেবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মিডিয়া দ্বারা আমরা প্রভাবিত হচ্ছি, মিডিয়াকৃত এসব বিকৃতি আমরা গ্রহণ করছি এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এসব পশ্চিমী প্রভাবের সমালোচনা করাও এক ধরনের অযৌক্তিক রক্ষণশীলতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একটি শব্দ কখনো কখনো একটি সংস্কৃতির আত্মাকে ধারণ করে। জিহাদ, ফতওয়া কিংবা হিজাব তেমনি ইসলামী সংস্কৃতিলগ্ন শব্দ যা এই সংস্কৃতির চারিত্র্য নির্দেশক। সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য মূলে যদি ভাঙন ধরানো যায় তবে সেই দুর্বল মাটিতে থাবা বসানো খুব সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রধানত আমেরিকা এই বিশ্বায়ন বা ভূবনায়ন তত্ত্বের পশরা ছড়িয়ে দিতে চাইছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে। এ তত্ত্ব আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নয়া পদ্ধতি।

গণমাধ্যমগুলোতে প্রায়শঃই আমরা এখন বিশ্বায়নের ভাবনা-চিন্তার কথা পড়ছি বা শুনছি। বিশ্বায়ন কি আলাদীনের চেরাগ যার অর্জনেই সবকিছুর প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ ঘটবে? বিশ্বায়ন শব্দ বা তত্ত্বের মধ্যে একটা মাদকতা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে অনেকেই এখন আসক্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু আদতে এটি একটি ছল। বিশ্বায়ন মানে এই নয় যে এর বিরাট আকাশের তলে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের সীমার মধ্যে থেকেও বিশ্ব ভাবনার সাথে নিজেকে মেলাতে পারি অথবা নিজের বোধকে সমর্পণ না করেও আমরা বিশ্ব নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারি। বিশ্বায়নের ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে একালে এটিও মনে করা সংগত হবে না সর্বমানবিকতার স্বার্থে বিশ্বের তাবৎ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সহাবস্থান ও যোগাযোগ এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত হবে। সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে যে প্রবণতা চলছে তার ফলে দেখা যাচ্ছে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমী সংস্কৃতি সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলছে,

www.pathagar.com

বিশেষ করে দুর্বল অর্থনীতি সম্পন্ন দেশগুলোর সাংস্কৃতিক মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো বিপণ্ন হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের এই আগ্রাসী প্রক্রিয়া চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে প্রধানত তাদের অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতার কারণে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার নানা শাখা-প্রশাখায় যেহেতু পশ্চিমের উৎকর্ষতা আজ অনস্বীকার্য, অতএব যে কোন দেশের উপর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাব মূলত তাদের অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগামিতা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল।

তৃতীয় বিশ্ব বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা ও নানা রকম সামাজিক সমস্যার কারণে পশ্চিমী সংস্কৃতি এখানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। হাইটেকের ঘাড়ে চড়ে পশ্চিমী সংস্কৃতি এখানে ঢুকে পড়ছে এবং বিশ্বায়নের ঘোড়াকে সর্বতোভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। এভাবে বিশ্বায়ন ও হাইটেক পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

হাইটেককে নির্ভর করে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হয়েছে তাতে একতরফাভাবে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব ও জয়জয়কার আজ অবিসম্বাদী হয়ে উঠেছে। যার হাতে যতো বেশি প্রাযুক্তিক মাল-মশলা রয়েছে তার পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে অন্যকে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও উপনিবেশিত করা। ভিসিআর, স্যাটলাইট, ডিশ কিংবা অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তির কোন ভৌগলিক সীমানা বা সীমাবদ্ধতা নেই। এটি সহজেই মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে এবং এভাবেই অন্যান্য হাইটেক বঞ্চিত সংস্কৃতির তুলনায় পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাব ও আধিপত্য হচ্ছে সুদূরপ্রসারী।

২

সমকালীন পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের নিরংকুশ প্রাধান্য নিয়ে কোন মতান্তর নেই। আর এ কথাও সত্য পশ্চিমী সভ্যতা এখন বৈশ্বিক সভ্যতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে পশ্চিমের প্রভাব আজ অনুভূত হচ্ছে না। এ প্রভাব কতখানি ভয়ংকর বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর উপর পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব ও তার পরিণতি বুঝতে হলে চাই পশ্চিমী সংস্কৃতির চারিত্র্য লক্ষণগুলো উদ্ধার করা।

পশ্চিমী সভ্যতার অন্তঃস্থলে আছে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপ এবং এর সারাৎসার হলো প্রাযুক্তিক ও মানববিদ্যার নানা বিভাগে উৎকর্ষতা ও অধিকার। এই সভ্যতার কমন ভাষা (Lingua Franca) হিসেবে ইংরেজির অধিকার এখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমশ এটিই এখন প্রধান ভাষা হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে। ভৌগলিকভাবে অস্ট্রেলিয়া ও ইসরাইলের মতো অপশ্চিমী দেশ ও জাপানীদের মতো অপশ্চিমী জনগণও এই সভ্যতার সাথে আত্মিকভাবে যুক্ত। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াও এখন এই

www.pathagar.com

সভ্যতার দিকে ঝুকতে শুরু করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ যাদের রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তারাও এখন অনেকে এই সভ্যতার চোরাবালিতে আবিষ্ট হয়ে উঠছে। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেকেই যারা পশ্চিমী প্রভাব সম্পর্কে সংরক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে থাকেন তারাও তো অনেক সময়ই পাশ্চাত্যের শিক্ষা, দর্শন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, জেন্ডার ইস্যু, নারীর সমতা প্রভৃতি শব্দের মাদকতায় চমকিত ও প্রভাবিত হয়ে ওঠেন, যা একান্তই পাশ্চাত্যের সম্পদ। তৃতীয় বিশ্ব বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কথা ধরা যাক। এখানকার মধ্যবিত্ত ধীমান বুদ্ধিজীবীরা তাদের সমাজের উপর যতই পশ্চিমী প্রভাবের সমালোচনা করুন না কেন, আদতে তাদের সন্তানরা ঠিকই জিন্স ও জগারস পরিধান করছে, বেসবল ক্যাপ মাথায় তুলে নিচ্ছে, হাতে শোভা পাচ্ছে কোকের বোতল আর নিজেরা টেলিভিশনে টুইন পিক, টারজান অথবা কোন ওয়েস্টার্ন সিরিজ দেখে সময় কাটাচ্ছেন। আমরা সাধারণত পাশ্চাত্য (West), বৈশ্বিক সভ্যতা (Global Civilization), জি-৭ রাষ্ট্রসমূহ (G-7 Nations), ইইসি দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য এ সব শব্দগুলো পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পরের জন্য রূপান্তর যোগ্য হিসেবে ব্যবহার করি। পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতেও আমরা এসব ভৌগলিক এলাকার সভ্যতাই বুঝি। যদিও এইভাবে কোন সভ্যতাকে ভূগোলবন্দী করা ভ্রমাত্মক, কেননা একটি সভ্যতার মধ্যে নানা উপাদান-উপকরণ, নানা জাতের মানুষ এমনকি বৃহত্তরভাবে চিন্তা করলে পুরো বিশ্বটাই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন অস্ট্রেলিয়া সাংস্কৃতিক ও আত্মীয়তার সূত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার অংশ, কিন্তু ভৌগলিকভাবে এটি একটি পূর্বীয় দেশ। তবু মোটের উপর বলা চলে ইংরেজি ভাষী জাতি রাষ্ট্রসমূহই এই সভ্যতার মৌলকেন্দ্রে অবস্থান করছে।

কনজুমারিজম হচ্ছে এ সভ্যতার মৌল বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যকে গতিময় করেছে জাঙ্ক ফুড (Junk Food), জিন্স, হলিডে ও লংড্রাইভ, রক সংগীত, টিভি প্রোগ্রামসমূহ, পপ তারকা ও মিডিয়া সেলিব্রেটি। এই ভোগ সুখ সর্বস্ব সভ্যতার তীর্থ কেন্দ্র হচ্ছে ডিজনীল্যান্ড। কোটি কোটি মানুষ আজ এই তীর্থভূমি সন্দর্শনে যায়।

এটা সত্য ডালাস ও ডায়ন্যাস্টি (Dallas and Dynasty) সিরিজ, কার্টুন মিকি মাউস (Micky Mouse), ইটি (ET) এবং কোক এই সভ্যতার বহিরাংগিক প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু পুরো পশ্চিমী সভ্যতা আসলে দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত করে। এই যে দর্শন সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার চরম পরিণাম হচ্ছে প্রত্যয়-প্রত্যক্ষবাদ, সংশয়বাদ, হিতবাদ, দেহাত্মবাদ, ক্ষণিক সুখবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ। এই দর্শনে স্বাভাবিকভাবে তাই নৈতিকতা আদৌ গ্রাহ্য বস্তু নয়, আধ্যাত্মিকতার মূল্য নেই এখানে। সন্দেহ নেই এই সভ্যতার বদৌলতে বিজ্ঞানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়েছে। পাশ্চাত্যের মানুষের চরিত্রে দেখা যায় উদ্যম, কর্মনিষ্ঠা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা। জীবনযাত্রার উন্নত মান, সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার নিশ্চয়তা আছে এই সভ্যতায়। বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার তীব্র স্রোত অহর্নিশ প্রবাহিত হচ্ছে এখানে (একমাত্র বৃটেনেই প্রতিবছর ৬০,০০০ বই প্রকাশিত হয়)।

পাশ্চাত্যের মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, স্বাতন্ত্র্যপরতা। শাসন ও শোষণ হচ্ছে তাই এই সভ্যতার চাহিদা। কিন্তু এই সভ্যতায় নেই সেই নীতি ও কল্যাণবোধ যা মানুষকে মানুষের কাছে টানে, মানুষে মানুষে ঘটায় অপার মিলন। বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন মানুষের পথের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। টেকনোলজির কল্যাণে বিশ্ব চলে এসেছে ঘরের কোণে। কিন্তু কথাটা কি সর্বতো অর্থেই ঠিক? পথের দূরত্ব যতখানি কমেছে মানবিক দূরত্ব কি ঠিক ততখানি বাড়েনি?

আজকের পশ্চিমা বিশ্বের ভূবনায়ন প্রক্রিয়ায় মানব সমাজের ভিতর যে অসমতা ও বিশৃঙ্খলা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাকি নেহায়েত মিথ্যে কথা? ভূবনায়ন বা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রধান অস্ত্র যে টেকনোলজী তার সুযোগ-সুবিধা কি পৃথিবীর সর্বত্র সুষমভাবে বণ্টিত হতে পেরেছে? উল্টো এই টেকনোলজীকেই বাগে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব পৃথিবী জুড়ে কি আধিপত্য ও অহমিকা বিস্তারের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়নি?

টিভি, ভিসিআর, স্যাটলাইট, ইন্টারনেট, ফোন, ফ্যাক্স, বিশ্বায়ন, মিডিয়া ওয়ার, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, কনজুমারিজমের আগ্রাসী ও আধিপত্যমূলক মনোভাব প্রভৃতি অভিব্যক্তি এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এটির এখন একটিই উদ্দেশ্য তা হলো বিশ্ব জুড়ে মার্কিন আধিপত্যকে রক্ষা করা। ঘরে ঘরে টিভি চ্যানেলের দৌরাত্ম আজ আমাদের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভয়ানক উপস্থিতিকে টের পাইয়ে দিচ্ছে। ভিডিও গেমসের বোতাম চাপ দিয়ে স্টারওয়ার কিংবা শত্রু বিমান ও ক্ষেপনাস্ত্র ঘায়েল করার উদ্ভট নেশা আজ আমাদের চিন্তা ও বৃত্তির আমেরিকায়নের ঘোষণা দিচ্ছে। বোমা বর্ষণ, হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও মৃত্যু আমাদের যুগের হাইটেক প্রযুক্তির প্যাকেজ প্রোগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগের দিনের ঘোষণা দিয়ে দেশ দখলের কায়দা আজ বদলেছে। তার মানে পুরনো কায়দার ইম্পেরিয়ালিজম এখন অচল। সাম্রাজ্যবাদ তার কৌশল পাল্টেছে। এখন সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে একটি সংস্কৃতির ভিতর ঢুকে পড়ছে, তারপরে একটু একটু আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের মতো করে সেই সংস্কৃতিকে বদলিয়ে ফেলছে। যাতে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই টুটে যায়। সংস্কৃতির এই দেয়া-নেয়ার মধ্যে আছে একটা বড় রকমের ফাঁক, বিশ্বায়নের যুগে এটা আমাদের ভাল করে বোঝা চাই।

www.pathagar.com

৩

বিশ্বায়ন আমাদের জীবনে ও সমাজে এক নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার জন্ম দিচ্ছে। বিশ্বায়নের যে অর্থনৈতিক দর্শন তা আমাদের সংস্কৃতিতে ফেলছে এক নেতিবাচক প্রভাব। অর্থনৈতিকভাবে চিন্তা করলে বিশ্বায়ন মানে হচ্ছে পাশ্চাত্যের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও অপশ্চিমী বিশ্বের বাজার সংকোচন। এই সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় মানুষের ব্যক্তিসত্তা হয়ে উঠছে ক্ষমতাধর এবং সামাজিক সত্তার ঘটছে অকাল মৃত্যু। মানুষ হয়ে উঠছে স্বার্থপর ও একই সাথে স্বাতন্ত্র্যপরায়ন। নিজের ভোগ, সুখ, সুবিধা ব্যতীত অন্য কিছুতেই যেন তার খেয়াল নেই। এই যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে তা অবশ্যই আমাদের ঐতিহ্য বিরোধী একইসাথে জীবন বিরোধী। এটি যেমন আমাদের সমষ্টিগত বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তেমনি আমাদের পরার্থ ভাবনাকেও দুর্বল করে দেয়।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আসলে সবকিছুকেই দেখে পণ্য হিসেবে। এই যে বাণিজ্য, মুনাফা, পুঁজি, টাকা-পয়সা হিসাব-নিকেষের চিন্তা-ভাবনা আমাদের স্বার্থবুদ্ধিকে কি বড় বেশি উসকে দিচ্ছে না? বিশ্বায়নের লক্ষ্য হচ্ছে এই দুনিয়া, ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়। স্বভাবত বিশ্বায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আমাদের কালচার যা মূল্যবোধেরই নামান্তর, তা এখন ভাঙনের চোরাগলিতে প্রবেশ করেছে।

গণমাধ্যমের বদৌলতে আজ যেসব বিনোদনের বিষয় আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ছে তা কি কোন সুস্থ সংস্কৃতির পরিচয়, না সেগুলো এখন আমাদের অসুস্থ ও অশুভ মানসিকতার ইংগিত দেয়? হরেক রকমের টিভি চ্যানেলের বিজ্ঞাপনগুলো দেখলেই অনুমিত হয় বাণিজ্যের নামে এসব যা প্রচার করা হচ্ছে তা রীতিমত ব্লু ফিল্মের নামান্তর। সিনেমা বা নাটকে কি কোন আদর্শের ইংগিত আজ খুঁজে পাওয়া যাবে? সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য ও আবেগযুক্ত চলচ্চিত্রের আদৌ কি আজ কোন অস্তিত্ব আছে? আমাদের দেশে চলচ্চিত্র এখন তৈরি হয় বাণিজ্য ও মুনাফার কথা মনে রেখে। স্বভাবতই চলচ্চিত্র, নাটক বা একই ধরনের নান্দনিক মাধ্যমগুলো আজ বাণিজ্যায়ন বা বিশ্বায়নের যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে যাচ্ছে।

এই আবহাওয়াকে ভিত করে যে শিশুটি আজ বড় হয়ে উঠছে অথবা আমাদের মানসিকতার যে সংগঠন গড়ে উঠছে তা কোনক্রমেই দেশজ বা ধর্মবোধ সম্পন্ন হয়ে উঠছে না। একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা যাক। একটা সময় ছিল যখন মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে থাকতো। একজন ছাত্রের সামনে চার খলিফার আদর্শ কিংবা নিযামুদ্দীনের মাতৃভক্তির কাহিনী রীতিমত অনুকরণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। এখন সে ছাত্রের সামনে থেকে সব রকমের আদর্শই টেনে ফেলে দেয়া হয়েছে। তার পড়ার ঘরের দেয়ালে সাঁটানো হয়েছে রূপালী পর্দার অথবা ক্রীড়া জগতের যত সব

www.pathagar.com

সুপার মেগাস্টার ও সেলিব্রেটিদের ছবি। মনে পড়ে বহুদিন আমাদের দেশের তরুণদের মনে আগুন ছড়িয়েছেন সুদূর আমেরিকার পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসন। তার চুলের ফ্যাশন, বাচনভঙ্গি এমনকি পোশাক-আশাকের ঢংটি পর্যন্ত এ দেশের তরুণরা হুবহু রপ্ত করার চেষ্টা করেছে। এই অনুকারিতা, অনুগামিতা আমাদের বিশেষ করে তরুণদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আর একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদের দেশে কুরআন তেলাওয়াতকারীর সংখ্যা ভয়ানক রকম হ্রাস পেয়েছে। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হচ্ছে মুসলমান। বলার অপেক্ষা রাখে না তাত্বিকভাবে হলেও কুরআনই হচ্ছে তাদের জীবনবিধান। কিন্তু এই বিধান তাদের বাস্তব জীবনে কতখানি ক্রিয়াশীল বা প্রভাবশীল তা এই সমীক্ষাই বড় প্রমাণ। এমন সময় ছিল এ দেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ফজরের নামাজের পর অন্তত গৃহকর্তা সুললিত স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এখন এই ট্রাডিশন ভেঙে পড়ছে। শুনতে অবাক লাগলেও এটিই এখন বাস্তব ঘটনা। কুরআনের সুললিত ধ্বনির বদলে আমাদের ঘুম ভাঙছে এখন মার্কিন রক এন রোল আর ডিস্কোর আওয়াজে।

হাইটেক প্রতিপালিত এই বিশ্বায়ন কালচার আমাদের মায়ামমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসায় গড়ে ওঠা পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বাতাবরণকে চুরমার করে দিচ্ছে। এর পরিবর্তে জন্ম দিচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক এক সংস্কৃতি। তারই উগ্র প্রকাশ ঘটছে আমাদের তরুণ-তরুণীদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। এক ধরনের বিশৃঙ্খলতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে এ সম্পর্ক প্রসারিত, কখনো কখনো তা নিছক যৌনতার মধ্যেও ধাবিত। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকলুহানের কথা আমরা মনে করতে পারি– A person to be touched and handled, not just to be looked at– সেজেগুজে আজ মেয়েরা যেন বলতে চান না আমাকে দেখ, তারা যেন বলতে চান আমাকে স্পর্শ কর, নেড়ে-চেড়ে দেখ।

ইদানিং আমাদের দেশেও চালু হয়েছে ভ্যালেন্টাইন ডে পালনের রেওয়াজ। পাশ্চাত্যের মিডিয়া আমাদের যা গিলিয়ে দিচ্ছে আমরা তাই অবলীলায় হজম করে ফেলছি। বিশ্বায়নের যুগে ভালবাসার যে পণ্যায়ন শুরু হয়েছে তাতে প্রকৃত ভালবাসার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ভালবাসার নামে মুনাফাখোর ও পুঁজিপতিরা ব্যবসা করে নিচ্ছে। ভ্যালেন্টাইন কার্ড, গিফট ও শাড়ীর যে রকমারী খবর আমরা পাই তা পুঁজিপতিদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির ইংগিত দেয় অন্যদিকে ভালবাসার নামে অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা ও অশ্লীলতার যে ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে তা ভয়াবহভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিপণ্ন করে তুলছে।

প্রকাশ্যে না হলেও আমাদের দেশে এখন গোপনে গোপনে সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সুন্দরীরা শরীর দেখাচ্ছেন, বেচছেন। এইভাবে বাজারের অনেক পণ্যের মতো নারীও হয়ে উঠেছে পণ্য সর্বস্ব, যা কিনা

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের বোধ বর্জিত ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাব ছাড়া আর কি? আজকাল পাড়ায় পাড়ায় এ্যাড ফার্ম গড়ে উঠেছে। নানা রকম চটকদার কথাবার্তার আড়ালে নারীর শরীর নিয়ে রীতিমত ব্যবসা গড়ে উঠছে। বিশ্বায়ন আমাদের নারীদেরকে এক নান্দনিক পতিতাবৃত্তির দিকে যেন ধেয়ে নিয়ে চলেছে।

সঙ্গীতের জগতে আসা যাক। মাঠে ঘাটে প্রান্তরে আজ পাশ্চাত্যের পপ মিউজিক ছড়িয়ে পড়ছে। মার্কিন রক এন রোলের সাথে দেশী আধুনিককে কি খুব বেশি তফাৎ করা যায় আজকাল? সবকিছুই যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে, আর এ ভাবেই সংস্কৃতির আমেরিকায়ন সম্পূর্ণ হচ্ছে।

আমরা অনেকেই এখন পশ্চিমমুখী হওয়াকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করি। অনেকেই পশ্চিমকে আদর্শ বলে মানি। পশ্চিমের আনুগত্য মানে আর্থিক সমৃদ্ধি ও ভোগবাদের স্রোতে নিরালম্বভাবে ভেসে যাওয়া। চরম ব্যক্তিতন্ত্র ও স্বার্থবাদ যার চূড়ান্ত লক্ষ্য। আজকাল আড়াই বছরের শিশুকেও ইংরেজি স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। বাংলার আগে শিশুরা এখন ইংরেজি শিখছে। একটি ভাষা কি শুধুই ভাষা। ভাষার টান দিলে সংস্কৃতি কথা বলে? ভাষার সাথে সাথে পশ্চিমের সংস্কৃতিও গেথে যাচ্ছে এই শিশুদের মনে। ফলে এরা না হচ্ছে পুরোপুরি এ দেশের, না হতে পারছে পুরোপুরি পশ্চিমের। এই জগাখিচুড়ী আজ আমাদের পুরো সমাজটাকে গ্রাস করে ফেলছে।

শহরের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি ইংরেজীনবীশ নিম্নবিত্তের মানুষেরা আজ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী এবং ক্ষণিক সুখবাদী দর্শন গ্রহণ করেছে। পশ্চিমের অনেক সৎগুণাবলী আছে যা এরা বর্জন করে এই স্বার্থপর ও নীতিহীন পথ বেছে নিয়েছে। ফলে এ সমাজে এখন দেখা দিয়েছে নানা অরাজকতা, হতাশা, নানা রকমের দুর্নীতি ও অপচার। জীবনের সবক্ষেত্রে চালাকি, সুবিধাবাদ, প্রতারণা, যথেচ্ছাচার ও নীতি ভ্রষ্টতা আমাদের খুবলে খাচ্ছে।

আমাদের সমাজে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে ভ্রষ্ট যৌনাচার ও যৌনবিকৃতি। মানুষও আজ আপন মনোরঞ্জনের জন্য চটুল পথ বেছে নিচ্ছে। সে যৌনতাগন্ধী সিনেমা ও সাহিত্য পড়ছে, কখনো কখনো মদ ও জুয়ার নেশায় ডুবে যাচ্ছে।

এসবই হচ্ছে মানুষের অন্তর্গত হতাশা ও বিপর্যয়ের ফল। অস্থিরতা আজ তার ভিতর ও বাহির সর্বত্রই। মানুষ আজ মূল্যবোধহীন, আধ্যাত্মবর্জিত ও দিকবিদিকহীন। বিশ্বজুড়ে এই অবক্ষয়ের মূলে আছে নৈতিকতার সংকট যার উদ্ভব স্বয়ং পাশ্চাত্যে। এই সংকটও আজ বিশ্বায়িত হতে পেরেছে পাশ্চাত্যের কারণে। বিশ্বায়নের যুগে নৈতিকতার এই যে ভয়ানক বিপর্যয় শুরু হয়েছে তা আমাদের ভাল করে মনে রাখা চাই।

www.pathagar.com

৪

এক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন মূলত পুঁজিবাদেরই এক প্রান্তিক রূপ যা উনিশ শতকে উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে সেই উপনিবেশবাদ এখন বিশ্বায়নের মুখোশ পরে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক পর্যায়ে এসে স্বভাবতই মনে এ প্রশ্ন উঁকি দেয় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কি স্বতন্ত্রভাবে আজ কিছু বলার আছে অথবা ইসলামের পক্ষে কি কার্যকরী কিছু করা আদৌ এ কালে সম্ভব? এটা সত্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ইসলামের রয়েছে দুস্তর পার্থক্য। দুটির সংস্কৃতি ভাবনা, জীবনবোধ ও বিশ্বচেতনা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, বিশ্বায়নের যুগে এসে যা আরো প্রখরতা অর্জন করেছে এবং দুটি সভ্যতাই আজ বলা চলে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই মুখোমুখি বৈরী অবস্থানকে সামনে রেখেই বোধ করি যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন তার Clash of Civilization তত্ত্ব হাজির করেছেন। এটা অস্বীকার করা চলে না বিশ্বায়নের এ যুগে পশ্চিমের এই ইসলাম বৈরিতা পূর্বের চেয়ে অধিকতর তীব্রতা অর্জন করেছে অনেকখানি মুসলিম সমাজের অন্তর্গত দুর্বলতা ও পশ্চাদপদ অবস্থানের প্রেক্ষাপটে। পাশ্চাত্য মিডিয়া অহর্নিশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি ও এখানকার নারীদের পশ্চাদবর্তী অবস্থানকে নিয়ে কটাক্ষ করে থাকে। এর মধ্যে অতিরঞ্জন অবশ্যই আছে, কিন্তু ঘটনার সত্যতাও পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না যার সুযোগ বৈরী মিডিয়া গ্রহণ করেছে মাত্র।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনার কথা ধরা যাক। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বহাল তবিয়তে চলছে। কখনো কখনো এসব ব্যবস্থাকে জনভিত্তি দেয়ার জন্য রীতিমত ধর্মীয় রংও চড়ানো হয়। মুসলিম দেশগুলোতে আজ দুর্নীতি মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেছে। মুসলিম শিক্ষার অবস্থা কোনক্রমেই আশাপ্রদ বলা চলে না। বুদ্ধিবৃত্তির জগতেও কোন সৃষ্টিশীলতার সুলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সৃষ্টিশীল কর্মে অনুৎসাহ, আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থাপনা, স্বল্প বেতন, রাজনৈতিক চাপ ও বিভাগীয় প্রতিহিংসা সকল রকমের বিকাশশীলতাকে আজ রুদ্ধ করে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের একজন ব্যক্তির গড় আয়ু মুসলিম দেশের জনসাধারণের চেয়ে অনেক বেশি, তাদের জীবন অধিকতর স্বাস্থ্যপূর্ণ, অত্যাচারী শাসক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা থেকেও তারা মুক্ত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নোবেল পুরষ্কার বিজয় যা কিছু অধিকাংশই আজ পাশ্চাত্যের করায়ত্ত। কোন মুসলমান বিজ্ঞান ও কারিগরিতে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করলেও পাশ্চাত্যের পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধায় প্রলুব্ধ হয়ে সেখানেই বাস করার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেয়। পরিণামে নিজ সমাজের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না।

মুসলিম সমাজের এই বিপর্যস্ত ছবি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশার প্রেক্ষাপটে এটাই ধারণা করা স্বাভাবিক এদের পক্ষে আদৌ কোন কিছু করা বোধহয় আজ সম্ভব নয়। ঊনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ওরিয়েন্টালিস্টরা যেমন করে বলতেন এ কালে ইসলামের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, সভ্যতার বিকাশে নতুন করে অবদান রাখার ক্ষমতা এখন এর নেই।

এসব দেখেই মিসরের প্রখ্যাত সংস্কারক মুফতী আবদুহু ইউরোপে গিয়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন এখানে কোন ইসলামের ছবি আমার নজরে আসেনি কিন্তু অনেক মুসলিম দেখেছি। ঠিক তেমনি দেশে এসে তিনি ঘোষণা দেন এখানে ইসলাম আছে কিন্তু কোন মুসলমান নেই। মুফতী আবদুহুর এই ক্ষেদোক্তি তার যেমন মনোপীড়া ও মনোবেদনার নমুনা তেমনি এটি মুসলিম সমাজের অগতি, দুর্গতি ও অব্যবস্থাপনার চিত্রও বটে। বলার অপেক্ষা রাখে না এ অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মুসলমানরা নিজেই, এটি ইসলামের অন্তর্গত দুর্বলতার ফসল নয়। পাশ্চাত্য মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা এ দুটি জিনিসকে প্রায়শ মিলিয়ে ফেলেন এবং তারস্বরে যেন বলতে চান ইসলামই হচ্ছে মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের কারণ। কিন্তু মুসলমানরা নিজেরাই যদি ইসলামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামের জীবনীশক্তি আত্মস্থ করতে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে সে ক্ষেত্রে কি ইসলামের খুব দোষ দেয়া চলে?

একুশ শতকের ঊষালগ্নে দাঁড়িয়ে তাই হয়তো আমাদের পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে ইসলামী সভ্যতা প্রকৃত অর্থেই পৃথিবীকে কিছু দিতে পারে কি না? উপনিবেশবাদের পথ ধরে একালে যে বিশ্বায়নের দৈত্য আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, যে নৈতিক, মানবিক ও বিশ্বাসের সংকট আজ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তার থেকে পরিত্রানের উপায় হিসেবে আমরা কি ইসলামকে নতুন করে বিবেচনা করতে পারি না। ইসলাম যেমন দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ের কথা বলেছে তেমনি পুঁজিবাদ এক ভয়ংকর মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। বস্তুবাদের আগ্রাসী প্রভাবে আমাদের ভিতর থেকে যে অবক্ষয় ও রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে তার নিদানে যে নৈতিক শক্তির অভ্যুত্থানের প্রয়োজন তা ইসলামের আশ্রয়েই সম্ভব। আজকাল পাশ্চাত্য সমাজে লোভ, রিরংসা, বিশ্বাসহীনতা ও পারস্পরিক অসম্পর্ক পর্বত প্রমাণ উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বিকল্প হিসেবে ইসলামের জীবনবোধ ও বিশ্ব চেতনা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা, এর অন্তর্গত বাণী 'সুলহি কুল' (সকলের সাথে শান্তি) হতে পারে এ বিবদমান বিশ্বের জন্য শুভ ও কল্যাণের নতুন বাতিঘর।

www.pathagar.com

ইসলামের এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচীর পাশাপাশি রয়েছে এর জীবনবাদী পরিকল্পনাসমূহ। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি ইসলামী নীতি শাস্ত্রের রয়েছে সম্পূর্ণ অনুমোদন। কিন্তু শর্ত হলো এই বিজ্ঞান চর্চাকে সম্পূর্ণভাবে মানবকল্যাণমুখী হতে হবে। পরিবর্তিত বিশ্বে এর নীতিসমূহ যাতে কার্যকারিতা হারিয়ে না ফেলে তার জন্য এসব নীতিমালাকে করা হয়েছে নমনীয় ও ঘাতসহ। এ কারণে ইজতিহাদের কথা এসেছে, শূরা ও ইজমার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে যে অবিশ্বাস ও নীতি ভ্রষ্টতার দানব আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে তার প্রতিরোধে ইসলামের এই জীবনবোধ ও কল্যাণ কামিতার কথা আমরা কি ভাবতে পারি না?

www.pathagar.com

ক্রুসেডের মুখ

১

আমাদের কালের সবচেয়ে দুঃখবহ মানবিক বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানে অন্যায় মার্কিন হামলা, হত্যা ও ধ্বংসলীলার যে ছবি আমরা দেখেছি তা সভ্যতার মুখোশ পরা পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান দেশগুলোর ভয়ানক রকম সাম্প্রদায়িক ও অসহিষ্ণু মানসিকতার প্রমাণ দেবার জন্য যথেষ্ট। একটি অপ্রমাণিত ঘটনাকে চূড়ান্ত ধরে আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষের উপর দিনের পর দিন যে হাজার হাজার টন বারুদ ঢালা হয়েছে এবং তাতে যে পরিমাণ লোকক্ষয় বিশেষ করে শিশু হত্যার ঘটনা ঘটেছে তাকে আর যাই হোক প্রশংসা করা চলে না। অথচ পাশ্চাত্যের মিডিয়া ও নেতৃবৃন্দ এহেন পৈশাচিক কর্মটিকেও যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত হিসেবে চালিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। পাশ্চাত্যের নৈতিকতায় শিশু হত্যাও এখন যথার্থ এবং তা ক্রুসেড ও ইনফিনিটি জাস্টিসের অংশ। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের পটভূমি বিশ্লেষণ করতে যেয়ে অনেকে এই নব্য সাম্রাজ্যবাদীর ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরভিসন্ধির কথা বলেছেন। এ সব কথার হয়তো কিছু যুক্তি আছে যা সময়েই যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অসম যুদ্ধে একটা জিনিস আভাসিত হয়ে উঠেছে। তা হচ্ছে সেকুলার বলে পরিচিত পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান দুনিয়া এ যুদ্ধটাকে এবার পুরোপুরি ধর্মযুদ্ধে রূপ দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশের ক্রুসেড ও ইনফিনিটি জাস্টিসের ঘোষণা তার ইংগিতবহ। এ শব্দ দুটো খ্রিস্টীয় পুরানের সাথে জড়িত বিশেষ করে ক্রুসেড যার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগ স্পষ্ট। লক্ষ্য করবার বিষয় হলো মধ্যযুগে ইউরোপের রাজা ও ভূস্বামীরা রীতিমত এ্যালায়েন্স করে মুসলিম ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করে দিত। এ কালেও তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান দেশগুলো জোটবদ্ধ হয়েছে মুসলমান দেশগুলোকে শায়েস্তা করতে। সাম্প্রতিক কালের আফগানিস্তান ও এক দশক আগের ইরাকের উপর আপতিত সাম্রাজ্যবাদী হামলা এর বড় প্রমাণ। তাহলে কি পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান দেশগুলো মধ্যযুগের কায়দায় মুসলিম দুনিয়ার সাথে দীর্ঘস্থায়ী কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন তার Clash of Civilization তত্ত্বে এ রকম এক সংঘাতেরই তো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

এ যুদ্ধে আর একটা জিনিস বিবেচ্য হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্যের মিডিয়া ও নেতৃবৃন্দ সমস্বরে বলেছেন নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনের উপর আঘাত হচ্ছে এক অর্থে সভ্যতা ও গণতন্ত্রের উপর আঘাত। এ ধরণের কথা

www.pathagar.com

ও আলোচনা পাশ্চাত্যের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমাদের কাছে একটা চিত্র তুলে ধরে। সভ্যতা কোন মানব গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ নয় কিংবা দু'এক শতাব্দীর পরিশ্রম লব্ধ অর্জন নয়। এ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা ও রূপায়নের ফসল। তাই পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দ ও মিডিয়ার সভ্যতা ও পাশ্চাত্যকে অভিন্ন করে দেখার চেষ্টা একটা বর্ণবাদী ও একচোখা নীতির ফল বলেই ধরে নেয়া যায়।

পাশ্চাত্যের এই একচোখা নীতির জন্ম ঐতিহাসিকভাবে ক্রুসেডের সাথে জড়িত। ক্রুসেডের ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতি এক সময় সমগ্র ইউরোপের মন মানসিকতাকে বেঁধে ফেলেছিল এবং ইউরোপ বহির্ভূত যে কোন সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা বিশেষ করে মুসলমানদের অসভ্য, বর্বর, অসংস্কৃত ভাববার উন্মাদনায় ইউরোপ ভেসে গিয়েছিল। এই ঘৃণা ও হিংসার নদী পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যখন সাম্রাজ্যবাদের যুগে এসে পড়ল তখন কিন্তু পাশ্চাত্যের মন মানসিকতা থেকে ক্রুসেডীয় নীতির অপসারণ ঘটেনি বরং উপনিবেশগুলোতে ইউরোপের দেশগুলো যে জুলুম, অবিচার ও ঘৃণার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছে তাকে ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। এ যুগে সাম্রাজ্যবাদকে সহযোগিতা করবার জন্য ইউরোপের চিন্তার জগতে তৈরি হয়েছিল প্রাচ্যবাদ বা Orientalism-এর ধারণা। প্রাচ্যবাদ হলো জ্ঞানের সেই শাখা যাতে কিনা পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে মূলত পাশ্চাত্যের গবেষকরা প্রাচ্যকে বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণ যে কতদুর অমানবিক, অসত্য ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার মুখোশ উন্মোচন করেছেন ফিলিস্তিনের বুদ্ধিজীবী ও উত্তর আধুনিক যুগের গতিমান লেখক এডওয়ার্ড-ডব্লিউ সাঈদ।

উত্তর সাম্রাজ্যবাদ যুগে এসে আমরা এখন ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায় দেখছি। এ যুগে এসে পাশ্চাত্যের পরিচালিত ক্রুসেডের রূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন রয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের মিডিয়া ও লেখকদের লেখা পড়ে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এরা বুঝি নিরন্তরভাবে গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকার চর্চা করে চলেছে। সত্য বটে এরা নিজেদের সুখ-সুবিধা, ভোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাবার জন্য নিজেদের সমাজের মধ্যে এক ধরনের উদারনৈতিকতার মূল্যবোধ চালু করেছে, কিন্তু সেই মূল্যবোধের প্রয়োগ তারা নিজ সমাজের বাইরে প্রসারিত করতে রাজি নয়।

নিজের স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা ভিন্ন সমাজ ও মানব গোষ্ঠীর উপর জুলুম, নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিতেও কসুর করে না। এ কারণেই নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে সভ্য ও উন্নত ভাবা ও প্রকারান্তরে অন্য সমাজ ও মানব গোষ্ঠীকে অনুন্নত ও অসভ্য বিবেচনা করার ক্রুসেডীয় মানসিকতা আজও পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করে চলেছে। আজ তারা নিজেদের উপর

www.pathagar.com

আঘাতকে সভ্যতার উপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা করছে অথচ এ যাবৎকালে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান যেমন ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, উইগুর ও মরোদের উপর আরোপিত যাবতীয় সন্ত্রাস ও অবিচারকে সভ্যতার উপর আঘাত হিসেবে বিবেচনায় নেয়নি।

এ কালে পাশ্চাত্যের এই একচোখা ও বর্ণবাদী নীতির বাস্তবায়নের কয়েকটি উন্মুক্ত মঞ্চের অন্যতম হচ্ছে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ এবং এই আমানবিক নীতিসমূহকে বিশ্ববাসীর সামনে কৌশলগতভাবে পরিবেশন করার দায়িত্ব পেয়েছে পাশ্চাত্যের ছলনাময়ী মিডিয়া বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া। সন্দেহ নেই দুনিয়ার তাবৎ মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী আমার সাথে একমত হবেন জাতিসংঘ হলো এ যাবৎকালের ইতিহাসে দুঃখজনকভাবে একটি ব্যর্থ বিশ্বপ্রতিষ্ঠান এবং এর এই পরিণতির জন্য পাশ্চাত্যের বর্ণবাদী মানসিকতাই দায়ী। পাশ্চাত্যের ইচ্ছা ও মতামত অনুযায়ী জাতিসংঘকে ব্যবহার ও পরিচালনা করার অনুদার নীতির কারণে আজ বিশ্বসমাজে যে জুলুম, অবিচার ও অসমতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে– তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে। জাতিসংঘের এই পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা বোধ হয় ইকবাল তার দিব্য দৃষ্টিতে বহুকাল আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। ইকবাল জাতিসংঘকে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যের বৃদ্ধা রক্ষিতা হিসেবে, অন্য যায়গায় তার প্রফেটিক উচ্চারণ ঃ

The body of coffin thieves formed for the distribution of graves.

জাতিসংঘের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফকে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের জমিদার ও সামন্তপ্রভু সুলভ আচরণ একালে অবশ্যই গরীব দেশগুলো হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আজ পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও অর্থের অধিকাংশই পাশ্চাত্য কুক্ষীগত করেছে এবং এই সম্পদকে চিরস্থায়ীভাবে আগলে রাখার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আই এম, এফকে দুর্বীনিতভাবে ব্যবহারের পাশ্চাত্য নীতিকে কি বলা যেতে পারে! এটি এক ধরনের অর্থনৈতিক দস্যুতা (Economic Terrorism) ছাড়া আর কি! আজ পৃথিবীটাকে বলা হচ্ছে Global village- বিশ্বগ্রাম। বলা হচ্ছে Globalization-বিশ্বায়নের কথা। কিন্তু পাশ্চাত্য তার অনুদার ও বর্ণবাদী নীতি থেকে সরে না আসা পর্যন্ত এই বিশ্বগ্রামের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসমুক্তি আদৌ সম্ভব কি! দেখে শুনে মনে হচ্ছে পাশ্চাত্য তার অনুদার নীতি সমূহকেই বিশ্বায়ন করতে চায়; মানবতাকে বিশ্বায়ন করা তার লক্ষ্য নয়।

২

আগেই উল্লেখ করেছি পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দ নিজেদের উপর আঘাতকে সভ্যতার উপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সভ্যতার এই স্বঘোষিত বরকন্দাজদের

www.pathagar.com

চেহারা এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদের যুগে ভালভাবেই চিনেছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোতে যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে গেছে-তার দায় এখনও তাদেরকে বহন করতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী আদর্শের প্রবাহকে বিচ্যুৎ ও বিকৃত করেছে, মুসলিম সমাজের গতিমানতাকে অনেকটা স্তব্ধ করে দিয়েছে, মুসলিম চিন্তার জগতকে প্রবলভাবে দুষিত করেছে এবং সর্বোপরি মুসলমানদের আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দিয়েছে। এর মানে এই নয় মুসলমান নেতারা সেদিন এই আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে চোখ বুজে হজম করেছে। ইউরোপীয়দের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দুনিয়া এই অন্যায় আধিপত্যকে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং মুসলমান নেতারাও তাদের অনুসারীদেরকে সুনিপুণভাবে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ইউরোপীয় আধিপত্যকে রুখতে না পারলে তাদের জাতিসত্তার পরিচয় হারিয়ে যাবে। এটা সত্য শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের শক্তি-সামর্থ্য, প্রযুক্তি ও শিল্পগত সমৃদ্ধির মুখে মুসলিম প্রতিরোধসমূহ একে একে ভেঙে পড়ে এবং একটার পর একটা ভূখণ্ড ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যদিকে রাশিয়া মধ্য এশিয়ার মুসলিম জনপদগুলোকে দখল করে নেয়। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। ইউরোপীয় আধিপত্যের মুখে মুসলিম প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র ছিল তাদের আপোষহীন আদর্শ। যত বেশি তারা সাম্রাজ্যবাদের দুর্যোগের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, তত বেশি তাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কুরআন ও সুন্নায় পারদর্শী আলেম ও যোদ্ধারাই ইউরোপীয়দের প্রতিরোধ করেছে। আফ্রিকায় সানুসী ও মাহদীরা ইউরোপীয়দের সাথে লড়াই করেছে, ককেশাসে ইমাম শামিল রাশিয়ার আগ্রাসনের মুখে রুখে দাঁড়িয়েছেন, চীনে সবুজ পোশাক পরিহিত নকশবন্দী খোজারা যুদ্ধ করেছে, সুদানে উমর তাল আল হাজী ফ্রান্সের মুখোমুখি হয়েছেন। এমনিভাবে সোমালিয়ার মোহাম্মদ আবদুল হাসান, আলজেরিয়ার আব্দুল কাদের, সোয়াতের আখুন্দ, উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, মওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতভী, দক্ষিণ ভারতের টিপু সুলতান এবং আমাদের এই বাংলাদেশের হাজী শরীয়তুল্লাহ, মীর নিসার আলী তিতুমীর ও ফকীর মজনু শাহর লোকজন ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

এখানে আরো একটা জিনিস লক্ষণীয়। আঠার আর উনিশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে যেমন বুক পেতে দাঁড়িয়েছেন ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী আলেম ও তাদের অনুরাগী অমিততেজ মুসলমানেরা, একালেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থী দল ও নেতৃবৃন্দ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। সেকালেও মুসলিম সমাজের কেউ কেউ

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হয়ে কাজ করেছেন শুধুমাত্র নিজের সুযোগ সুবিধা ও এসট্যাবলিশমেন্টের কথা ভেবে, একালেও অনেকেই চোখ বুজে সাম্রাজ্যবাদকে শুভেচ্ছা জানান সেই একই কারণে। সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উত্তর যুগে মুসলিম সমাজের এই দুইধারা ও তাদের বিপরীত অবস্থান নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকরা দীর্ঘ আলোচনা করতে পারেন।

এই মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও প্রতিরোধ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরা কখনোই ভাল চোখে দেখেনি, তাদের চরিত্র হনন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদের সংস্কৃতিকে কটাক্ষ করা হয়েছে, তাদের ইতিহাসকে সাম্রাজ্যিক স্বার্থে বিকৃত করা হয়েছে আর কখনোবা তাদের আন্দোলনকে পৈশাচিক নির্মমতায় থামিয়ে দেয়া হয়েছে। পুরো মুসলিম দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে সেদিন Mad Mullah, Damn Mullah ও Bloody Fanatic বলে কটাক্ষ করা হতো শুধু মাত্র আন্দোলনের গুরুত্বকে খাটো করবার জন্য। আমাদের দেশের সিরাজউদ্দৌলাহকে অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা অভিযোগে কলঙ্কিত করা হয়েছে। ইংরেজের সহযোগী হিন্দু জমিদাররা তিতুমীর সম্পর্কে মন্তব্য করেছে ঃ তিতু একান্তই ধর্মোন্মাদ ও বোকা। শাহ সুজা উল মুলককে ব্যঙ্গ করে সাম্রাজ্যবাদীরা নাম দিয়েছে Cha, Sugar and Milk-চা, চিনি ও দুধ বলে। সোয়াতের সম্মানিত আখুন্দকে নিয়ে এডওয়ার্ড লিয়ার অবমাননাকর কবিতা লিখেছেন ঃ 'Who or why, or which or what, is the Akond of swat?'

শুধু কি তাই সাম্রাজ্যবাদের তলপীবাহক ঐতিহাসিকরা দরবেশ বাদশাহ আওরঙ্গজের সম্পর্কে মিথ্যা ছড়িয়েছে। মোঘল ও অটোম্যান হারেমের শুদ্ধতম নারীদেরকে নিয়ে কুৎসিত কথা-কাহিনী তারা প্রচার করেছে।

ইসলামের খেতাবগুলোকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা রীতিমত অবমাননাকর আচরণ করেছে। খলিফা, যা কিনা ইসলামের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও খানসামা-যা মোঘল ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মচারী-তাকে ব্রিটিশ প্রশাসনের অধঃস্থন কর্মচারী বা ব্যক্তির খেতাব হিসেবে নামিয়ে আনা হয়েছে। খলিফা বলতে আমরা এখন বুঝি ক্ষৌরকার (Barber), নেশাকারদের গ্রেফতার করবার জন্য নিয়োজিত প্রহরী কিংবা অধঃস্থন কেরানী এবং আমাদের দেশে খলিফা বলতে বুঝায় একটি বিশেষ পেশার ব্যক্তি-সেটি হলো দর্জী। খানসামাকে বানানো হয়েছে পাচক (cook)।

মুসলমানরা তাদের অজান্তেই এ সব শব্দ ব্যবহার করছে এবং এইভাবে তাদের অবচেতন মনে সাম্রাজ্যবাদের সিলসিলা বয়ে চলেছে। এই মিথ্যা ও রুচিহীনতার বেসাতি করতে যেয়ে সাম্রাজ্যবাদ সামান্যতম অনুতাপ অনুভব করেনি, সামান্যতম অপরাধবোধ করেনি অন্যের ভূখণ্ড দখল করে, অন্যের গ্রাস

www.pathagar.com

ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর গণহত্যা চাপিয়ে দিয়ে। ভারতে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে অমানুষিক জুলুম ও নিপীড়ন নেমে এসেছিল আমি সেই বর্বরতার দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। তখনকার পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলার এক বিলাতী জেলা প্রশাসক F. Cooper সাহেব লিখেছেন ঃ

The 1st of August was the anniversary of the great Mohammedan sacrificial festival of the Bukra Eed. A capital excuse was thus afforded to permit the Hindoostanee (sic) Mussulman horsemen to return to celebrate it at Umritsir (sic) while the single Christian, unembarassed by their, and aided by the faithful Seiks (sic), might perform a ceremonial sacrifice of a different nature .... As fortune would have it, again favouring audacity, a deep dry well was discovered within one hundred yards of the police station, and its presence furnished a convenient solution as to the one remaining difficulty which was of sanitary consideration— the disposal of the corpses of the dishonoured soldiers.

১লা আগস্ট ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের কোরবানীর ঈদ। হিন্দুস্তানী মুসলমান অশ্বারোহীদের জন্য একটা সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয় যাতে তারা অমৃতসরে প্রত্যাবর্তন করে ঈদ উৎসব পালন করতে পারে এবং তখন তাদের উপস্থিতিতে বিশ্বস্ত শিখ সৈন্যদের সহযোগিতায় একজনমাত্র বিব্রতহীন খ্রিস্টান ভিন্ন প্রকৃতির কোরবানী উৎসবের আয়োজন শুরু করে।............সৌভাগ্যক্রমে এবং অতিরিক্ত সাহসের সাথেই বলতে হয় পুলিশ স্টেশনের একশ গজের মধ্যে একটা গভীর কূপ খুঁজে পাওয়া যায় যা উদ্ভূত অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির একটা যথাযথ সমাধান দেয়, তা হলো হতভাগ্য সেনাদের লাশ চাপা দেয়া।

এর পরে আরো হিমধরা বর্ণনা...... About 150 having been thus executed, one of the executioners swooned away (he was the oldest of the firing party), and a little respite was allowed. Then proceeding, the number had arrived at 237; when the district officer was informed that the remainder refused to come out of the bastion, where they had been imprisoned temporarily, a few hours before.... The doors were opened, and, behold! Unconsciously the tragedy of Holwell's Black Hole had been re-enacted......... Forty five bodies, dead from fright, exhaustion, fatigue, heat, and partial suffocation, were dragged into light.

www.pathagar.com

এইভাবে ১৫০ জনকে হত্যা করার পর একজন জল্লাদ অচেতন হয়ে পড়ে (যে ছিল জল্লাদদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ), এবং ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম দেয়া হয়। তারপর মৃতের সংখ্যা যখন ২৩৭ এ পৌঁছায় তখন জেলা কর্মকর্তাকে জানানো হয় বাকীরা দুর্গের বাইরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যাদেরকে সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল.........দরজা খুলে দেখা যায় ভয়ানক দৃশ্য, অবচেতনভাবে হলওয়েল অন্ধকূপের নাটক পুনরায় ঘটে যায়। পয়তাল্লিশটি মৃতদেহ, যারা সকলেই মারা যায় শুধু ভয়, উৎকণ্ঠা, অবসন্নতা, উত্তাপ ও শ্বাসরোধের কারণে– দিনের আলোয় টেনে নিয়ে আসা হয়।

পাঞ্জাবের গভর্নর লরেন্স সাহেব এর পরে তার অধঃস্থন কুপারের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে লিখছেন–

My dear Cooper, I congratulate you on your success against the 26th N. I. You and your police acted with much energy and spirit, and deserve well of the State. I trust the fate of these sepoys will operate as a warning to others. Every effort should be exerted to glean up all who are yet at large.

প্রিয় কুপার, ২৬ তারিখের বিদ্রোহ দমনে তোমার সাফল্যে ধন্যবাদ। তুমি ও তোমার পুলিশ বাহিনী ভয়ানক উদ্যম ও শক্তি নিয়ে কাজ করেছো এবং রাষ্ট্রের প্রশংসার দাবিদার হয়েছো। আমার বিশ্বাস এই সব সিপাইদের ভাগ্য অন্যদের জন্য হুশিয়ারী হিসেবে কাজ করবে। প্রত্যেকটা চেষ্টার উদ্দেশ্য হবে অন্য যারা এখনও বাকি আছে তাদেরকে এক এক করে ধরে ফেলা।

সাম্রাজ্যবাদের দুষ্কৃতির আরেকটি হিমধরা বর্ণনা দিচ্ছি। পাঞ্জাবের গভর্ণর মন্টগোমারী সাহেব মেজর হডসনকে তার কাজে খুশি হয়ে একই ধারা ধন্যবাদ জানিয়ে লিখছেনঃ

My dear Hodson, All honour to you (and to your 'Horse') for catching the king and slaying his sons. I hope you will bag many more.

প্রিয় হডসন, বাদশাহকে ধরা ও তার পুত্রদের হত্যা করার সকল সম্মান তোমার (ও তোমার ঘোড়ার)। আমি আশা করি তোমার থলিতে আরও শিকার পুরতে পারবে।

এই নরাধম হডসন শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের পুত্রদেরকে হত্যা করে তাদের খণ্ডিত মস্তক থালায় করে বাদশাহর সামনে উপহার হিসেবে দিয়েছিল।

আমাদের ঢাকা শহরে ১৮৫৭ সালে বিপ্লবের পর বহুদিন ধরে আজকের বাহাদুর শাহ পার্কে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। একই কাণ্ড করেছিল মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট বাহিনী লিবিয়াতে। লিবিয়ার স্বাধীনতা

www.pathagar.com

সংগ্রামী উমর আল মুখতারকে হত্যা করে দীর্ঘদিন ধরে বেনগাজী শহরে তারা ঝুলিয়ে রেখেছিল। সাইরেনিকার সানুসী বিপ্লবীদের ধরে নিয়ে বিমানে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করেছে ইতালির ফ্যাসিস্টরা। আজকের সভ্যতার বরকন্দাজদের পূর্বপুরুষদের এই দুষ্কৃতি লিখে শেষ করা যাবে না।

এই দুষ্কৃতি ও অপকর্মের পাহাড়কে সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। আলজেরিয়ায় ফরাসী আধিপত্যের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য এক সময় বলা হয়েছে, ফরাসীরা হলো এক উন্নত ল্যাটিন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যারা আলজেরিয়ায় এসেছে এখানকার শতবর্ষের আন্তগোত্র বিরোধ মিটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আলজেরিয়ায় ফরাসী আক্রমণকে তারা বলতো "The Civilizing French Mission"

এই ফরাসী হঠকারিতার সাথে বিলাতি হঠকারিতার কি অদ্ভুত মিল দেখুন। বিলাতী উপনিবেশের পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়েছে এই ভাবে ঃ The White Man's Burden। এই বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন বিলাতের রাজকবি রুডইয়ার্ড কিপলিং। কিপলিং এশিয়া-আফ্রিকার মানুষকে দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের চোখে। এখানকার মানুষ তাই তার কাছে-

১. big black boundin, beggar (Fuzzy-Wuzzy)
২. Funny an' yellow (The ladies)
৩. black faced crew (Gunga Din)
৪. Half devil and half child (The White Man's Burden)

কিপলিং-এর মানসিকতার সাথে বিলাতী মানসিকতার কোন তফাৎ নেই। কিপলিং তার সময়ের সাম্রাজ্যিক মানসিকতাকেই নিজের কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন মাত্র।

সুতরাং প্রভু ও দাস সম্পর্কই বাহ্যত গড়ে উঠেছিল উপনিবেশবাদী ও উপনিবেশের লোকজনের ভেতরে। শাসিতদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও ক্রুসেডীয় মানসিকতায় এই সব সভ্য প্রভুরা আচরণ করতো। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

হায়দারাবাদের নিযামের পুত্র বেরারের যুবরাজ সমারসেট মমের কাছে একবার অভিযোগ করেছিলেন এই বলে যে তাকে বোম্বে ও কলকাতার অভিজাত ইয়াকট ক্লাবে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। গান্ধীর পুত্রকে একবার শিলং-এর ইউরোপীয় রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। নেহরুকেও একবার প্রায় ট্রেনে বিলাতীদের জন্য সংরক্ষিত কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করে দেয়ার মত অবস্থা হয়। সমাজের এই শ্রেণীর মানুষের সাথে যদি এই ব্যবহার করা হতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে কি ব্যবহার করা হতো তা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন বিলাতী ক্লাবগুলোর সদর দরজায় লেখা থাকতো- Dogs and Natives are not allowed। এই প্রভু ও দাস মানসিকতার মহামারী থেকে সভ্যতার

www.pathagar.com

বরকন্দাজ পশ্চিমী দেশগুলো কি আজও মুক্ত হতে পেরেছে? সাম্রাজ্যবাদীরা সেদিন যাদেরকে বলেছে Mad Mullah ও Fanatic আজ তাদেরকেই বলছে Fundamentalist, Terrorist, Extremist, কখনো Evil কখনো বা Hardliner । যারা ইসলামে বিশ্বাসী একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তাদের সম্পর্কে একালে পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিশেষণের অন্ত নেই, যেমন ঃ Fanatic Islam, Radical Islam, Extremist Islam, Militant Islam. পাশ্চাত্য মিডিয়া আরও কয়েকটি ইসলামের খবর আমাদের দিয়েছে। যেমন Liberal Islam, Moderate Islam। দুর্ভাগ্য আমরা ইসলাম বিশ্বাসীরাও এতগুলো ইসলামের খবর রাখিনা। এ হচ্ছে সেই পুরনো ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি। প্রচারণার এই ধরন ও মর্মে সেদিন ও এদিনের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

আমি ইতোপূর্বে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতার দিকটি তুলে ধরতে কয়েকজন ব্রিটিশ প্রশাসকের চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েছি। এবার আমি নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনের উপর আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের দুএকটি বিখ্যাত পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই। আজকের মার্কিন মানসিকতার সাথে সেদিনের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা অভিন্ন, যেন একই মুদ্রার এ পিঠ ওপিঠ। জনৈক Rich Lowry লিখেছেন ঃ

If we flatten part of Damascus or Tehran or whatever it takes, that is part of the solution. (Washington Post, Sept 13. 2001)

যদি আমরা দামেস্ক অথবা তেহরান কিংবা অন্য কিছুকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারি তবে সেটাই হবে সমস্যার সমাধান।

অন্যত্র Ann Comlter-এর বর্ণনা আরো ভয়ানক ঃ

This is no time to be precarious about locating the exact individuals directly involved in this particular terrorist attack. We should invade these countries, kill their leaders. We were not punctilious about locating and punishing only Hitler and his top officers, We carpet bombed German cities, we killed civilians, That is war, And this is war. (New York Daily News, Sept. 12, 2001)

সন্ত্রাসী কাজের জন্য সন্দেহজনক ব্যক্তিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার সময় এখন নয়। আমাদের উচিত এসব দেশ আক্রমণ করা, তাদের নেতাদের হত্যা করা। আমরা হিটলার ও তার উচ্চপদস্থ সহযোগীদের চিহ্নিত ও শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোন নীতি-নিয়মের ধার ধারিনি। আমরা জার্মান শহরগুলোতে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করেছি, আমরা সাধারণ জনগণকে হত্যা করেছি। সেটাই যুদ্ধ। এবং এটাও যুদ্ধ।

www.pathagar.com

৩

আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের নীতি এক সর্বব্যাপী বর্ণবাদী ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপনিবেশসমূহে শাসিতদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে খাটো করে দেখা, নিজেদেরকে শাসিতদের তুলনায় উন্নত, প্রকর্ষিত হিসেবে তুলে ধরা, কোন কোন ক্ষেত্রে শাসিতদের মধ্যে ভাগ কর ও শোষণ কর নীতি ব্যবহার করে পুরো সমাজ কাঠামো ভেঙে কতকগুলো বিবদমান পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে এবং পরিশেষে সেই বিবদমান পক্ষের মধ্যে সালিশী করবার ছুতোয় সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা নিজেদের ইচ্ছামত শাসিতদের ব্যবহার করেছে আবার কখনোবা শাসিতদের ভিতর থেকেই নিজেদের মনমানসিকতার একদল লোক তৈরি করে তাদেরকে শাসিতদের বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দিয়েছে। এখন দেখা যাক সাম্রাজ্যবাদের সংগঠক, প্রশাসক ও প্রতিভূ যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ আদর্শ হিসেবে শাসিতদের সামনে তুলে ধরেছে তারা কি করেছে বা বলেছে। ভারত জয়ের প্রথম সূত্রধর লর্ড ক্লাইভের (যার লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে বাংলায় স্মরণকালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ হয় ও তখনকার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ মারা পড়ে) ভারতীয়দের সম্পর্কে নিকৃষ্ট ও বিকৃত মনোভাবের পরিচয় আমরা পাচ্ছি এ ভাবে ঃ

'typical' Indians are 'servile, mean, submissive and humble. In superior stations, they are luxurious, effeminate, tyrannical, treacherous, venal, cruel.'

প্রকৃত ভারতীয়রা হচ্ছে দাস মনোবৃত্তি সম্পন্ন, নীচ, বশ্যতাপরায়ন ও হীন। উঁচু শ্রেণীতে যাদের অবস্থান তারা হলো বিলাসী, পৌরুষহীন, জুলুমবাজ, ষড়যন্ত্রকারী, দুর্নীতিপরায়ণ ও নিষ্ঠুর।

ভারতের এককালীন ভাইসরয় ও ইরান সম্পর্কে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী বিশেষজ্ঞ লর্ড কার্জনের ইরানীদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য ছিল ঃ A Persian is a coward at the best of times। ভারতীয় ল'কমিশনের প্রধান লর্ড মেকলে, যার শিক্ষানীতি আজও মুসলমানদের হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করে চলেছে, ভারতীয় শিক্ষার মান নিয়ে রীতিমত ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন ঃ চিকিৎসাশাস্ত্র, যা একজন বিলাতী কামারকেও লজ্জা দেয়ার মত, জ্যোতির্বিদ্যা যা বিলাতী আবাসিক স্কুলের একজন ছাত্রীর হাস্যরসের খোরাক মাত্র, ইতিহাস যা ত্রিশফুট দীর্ঘ রাজা ও তার ত্রিশ হাজার বছরের রাজত্বের ইতিহাস কথা নিয়ে পূর্ণ এবং ভূগোল যা গুড় ও মাখনের সমুদ্র দিয়ে তৈরি হয়েছে। মিসরে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ লর্ড ক্রোমার মিসরীয় মানসিকতার সাথে ইউরোপীয় মানসিকতার তুলনা করে যা লিখেছেন তার মর্ম হচ্ছে ইউরোপীয়দের মেধা, বুদ্ধিমানতা ও যুক্তিবাদী মন আরবদের থেকে অনেক প্রাগ্রসর। তার ভাষায় ঃ

www.pathagar.com

স্যার আলফ্রেড লিয়াল আমাকে একবার বলেছেন যথার্থতা (Accuracy) কোনভাবেই প্রাচ্য মানসিকতার সাথে খাপ খায় না। প্রত্যেক ইঙ্গ ভারতীয়ের এই প্রবাদটি মনে রাখা দরকার সূক্ষ্মতার অভাবই অসত্যের দিকে নিয়ে যায় যা কিনা প্রাচ্য মানসিকতার একটা বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয়রা গভীরভাবে যুক্তিবাদী, তার কৃত ঘটনার বর্ণনা সবরকম দোদুল্যমানতা থেকে মুক্ত। সে প্রকৃতিগতভাবে যুক্তিনিষ্ঠ, যদিও যুক্তিবিদ্যা নিয়ে সে কোন পড়াশুনা করেনি। প্রকৃতিগতভাবে সে সন্দেহবাদী এবং কোন প্রস্তাবনাকে সত্য বলে গ্রহণ করার আগে তার প্রমাণের প্রয়োজন হয়। তার প্রশিক্ষিত মেধা যেন একটি কৌশলের মধ্যে কাজ করে। অন্যদিকে প্রাচ্য মানসিকতা তার চিত্রবৎ রাস্তার মতো একান্তই সাদৃশ্যবিহীন। তার যুক্তির উপস্থাপনা সর্বতোভাবেই এক অসতর্ক বর্ণনা ছাড়া কিছু নয়। যদিও প্রাচীন আরবরা ন্যায় শাস্ত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারীরা এ দিকে মেধাচর্চায় একান্তই অপটু। খুব সাধারণ কোন কিছু থেকে একটা সমাধানে পৌঁছানো তাদের পক্ষে অসম্ভব যাকে তারা সত্য বলে স্বীকার করতে পারে। একজন সাধারণ মিশরীয়র কাছ থেকে কোন একটি সাধারণ তথ্য বের করার চেষ্টা মানে তার ব্যাখ্যা হবে দীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। তার কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগে সে অন্তত নিজের সাথে অর্ধ ডজনবার বিসংবাদে লিপ্ত হবে। সে সর্বদাই সাধারণ কোন জেরার মুখে ভেঙে পড়বে।

সাম্রাজ্যবাদকে সহযোগিতা করবার জন্য এ সময় ইউরোপে একদল লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী তৈরি হয়েছিল। এরাই ছিলেন Orientalism এর চালক শক্তি যাদের উদ্দীপনা ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা নিবেদিত হয়েছিল কিভাবে তাদের সাম্রাজ্যিক প্রভুর সামনে 'decadent orient'-অবক্ষয়ী প্রাচ্যের চিত্র তুলে ধরা যায়। এ চিত্র ছিল একান্তই লেখক শিল্পীদের কল্পনার জগতে সৃষ্ট ও মারাত্মকভাবে অসত্য ও অতথ্যনির্ভর। বাস্তবের চেয়ে এ কাহিনী একান্তই কল্পনাজাত এবং ইউরোপীয় সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতাকে কল্পনার জগতে শিল্পীরা প্রাচ্যের উপরে অনৈতিকভাবে আরোপ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম দেশগুলোর সবচেয়ে ক্ষতি করেছে তার বিষাক্ত শিক্ষা নীতি প্রয়োগ করে এবং যে নীতির দায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আজ অবধি বহন করে বেড়াতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের মূলকথা ছিল যদি তাদের সকল প্রজাকে তাদের রুচি ও সংস্কৃতির সমতুল্য হিসেবে উন্নীত না করা যায় তাহলে অন্তত তাদের অধস্তন প্রজাদের নির্বাচিত অংশকে এই পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। তারাই হবে সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় খুটি এবং আমজনতার সাথে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের যেমন যোগাযোগের বিশ্বস্ত মাধ্যম, তেমনি তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সর্বোপরি তাদের জুলুম ও অবিচারের অন্ধ ও অকুণ্ঠ সমর্থক।

www.pathagar.com

১৮৩৫ সালে ভারতে লর্ড মেকলের 'Minute on Education' প্রকাশিত হয়। এ মিনিটের মাধ্যমে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়, একই সাথে সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছাও এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

আমাদের লক্ষ্য হবে এমন একটা শ্রেণী তৈরি করা যারা হবে আমাদের এবং আমরা যাদের শাসন করি তাদের মধ্যে যোগসূত্র। এই শ্রেণী হবে রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে ইংরেজ।

সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য ছিল 'মগজ ধোলাই' করে 'দেশী সাহেব' তৈরি করা, যারা বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে ইংরেজ। আর তারাই হবে Loyal servant of the Crown।

এই মগজ ধোলাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ পুরো সমাজ কাঠামোকে ভেঙে চুরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এই Loyal servant রাই সমাজের উপরিকাঠামোতে চলে আসে, তারাই অর্থ, প্রশাসন ও যাবতীয় আইন-শৃংখলার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিভূ হয়ে ওঠে। আর মুসলিম আমলের ধর্মীয় নেতারা যারা মসজিদে ইমামতি করতেন পাশাপাশি মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব দিতেন তারা চলে আসেন সমাজের নীচের কোঠায়। বলা বাহুল্য এই ধর্মীয় নেতারাই যারা কিনা সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য মেনে নেননি, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত করেছিলেন তাদেরকে পরিস্থিতির গুনে সাম্রাজ্যবাদ এই অবমাননাকর অবস্থানে নিয়ে আসে। আর এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদ পুরো সমাজ দেহকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যার একদিকে Loyal servant-দের দল অন্যদিকে তাদের ভাষায় Mad Mullah ও তাদের অনুগত সমর্থকরা। এবং সাম্রাজ্যবাদ এখন থেকে এক ভাই-এর কাঁধে বন্দুক রেখে অন্য ভাইকে শিকারের কৌশল হাতে নেয়।

আজকে মুসলিম দেশগুলো থেকে সাম্রাজ্যবাদ দৃশ্যমান ভাবে অপসারিত হয়েছে ঠিক কিন্তু এসব দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের অদৃশ্য প্রভাবকে কি অস্বীকার করা যায়! এ সব দেশে আজও সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষানীতি বহাল আছে এবং সেই 'Loyal servant' তৈরি করার কারখানাও চালু আছে। এই 'Loyal servant'-রা আজকে কাদের স্বার্থরক্ষা করছেন! এরা হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোর সেই অংশ যারা পাশ্চাত্যপন্থী, পাশ্চাত্যমুখী কিংবা পাশ্চাত্য অনুগত যারা পাশ্চাত্য মন মানসিকতা ও চিন্তা ভাবনা গড়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্য মিডিয়ার ভাষায় এরাই হচ্ছেন 'Liberal, Moderate কিংবা Secular Muslim, যারা কার্যত ইসলাম ছেড়ে দিয়েছেন এবং ইসলামের বদলে পাশ্চাত্যকে সকল চিন্তাভাবনা ও অনুপ্রেরণার উৎস মনে করেন। অন্যদিকে আছে ইসলামকে যারা ভালবাসেন এবং কুরআন ও সুন্নাহকে জীবনের অলংঘনীয় বিধান বিবেচনা করেন সেই অংশ, একালের পাশ্চাত্য মিডিয়ার ভাষায় Fanatic কিংবা Fundamentalist। সেই

www.pathagar.com

আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম সমাজকে দুভাগ করে রেখেছে এবং প্রয়োজনে একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তার স্বার্থ হাসিল করে চলেছে। আফসোস! মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা এর কোনটাই ধরতে পারেন না।

মুসলিম দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি উপজাত যা সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা নীতির মতই ভয়ানক প্রমাণিত হয়েছে তা হলো জাতীয়তাবাদ। সন্দেহ নেই জাতীয়তাবাদী মন-মানসিকতা এ কালের মুসলিম বিশ্বকে অমিত বিক্রমে শাসন করছে এবং ইসলামের বৈশ্বিক, সার্বজনীন ও উদার নৈতিকতার জীবন দর্শনকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। জাতীয়তাবাদের গুণে এ কালে মুসলমানের বৈশ্বিক ও গ্লোবাল অবস্থানকে ভৌগলিক অবস্থানে নামিয়ে আনা হয়েছে। মুসলমানের পরিচয় আজকে স্রেফ বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ইরানী, সুদানী প্রভৃতি ভৌগলিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে এবং একই কারণে মুসলিম উম্মাহর Supra-territorial অবস্থান অনেকটা অবাস্তব, অসংগত ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। আজকে এই জাতীয়তাবাদী অবস্থানের কারণে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো কখনো রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষুদ্র-স্বার্থ আর কখনো পাশ্চাত্যের প্ররোচণায় একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না, অন্যদিকে উম্মার চরম সংকটের দিনে সংকটকে সংকট হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারা অথবা অন্য দেশের সংকট মনে করে এড়িয়ে যাওয়া আবার কখনোবা পাশ্চাত্য প্রভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার মত দুর্ভাগ্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ঘটছে।

জাতীয়তাবাদ যে কত ভয়ানক হতে পারে তা বোধ হয় আজকের আরব জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আরব জগতে জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদেরই স্বার্থে আরবদেরকে তারা তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা আরবদের কোন কোন নেতাকে বুঝিয়েছিল তোমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা, তোমাদের ভিতরেই এসেছে ইসলামের নবী, সুতরাং তোমরা কেন তুর্কী আধিপত্য বরণ করে নিচ্ছ। তোমরা বরং তুর্কীদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। ব্রিটিশের এই টোপ যারা গিলেছিল তাদের মধ্যে মক্কার শরীফ আল হোসাইন অন্যতম। এই ব্যক্তিটিকে আমাদের দেশের মীরজাফরের সাথে তুলনা করা যায়, যে তুর্কীদের পরাজয়ের পর নিজেকে মুসলমানদের খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে। অনেকেই বলেন তুর্কীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের কাছে হেরে যায় কিন্তু এ পরাজয়ের পিছনে আরব নেতৃবৃন্দের গাদ্দারী ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে সেদিনের আরবদের জাতীয়তাবাদী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধই মূলত দায়ী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো লুজান শান্তি সম্মেলনে তুর্কীদের ছেড়ে দেয়া আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলকে টুকরো টুকরো করে আরব রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। এ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রগুলোর অভ্যুদয় ঘটেছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রকামী ইচ্ছা ও সেদিনের আরব নেতাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও লালসার চাপে। এর মধ্যে ইসলামী নীতি-নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না। তাই আজ আশ্চর্য হই না যখন এ রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যেই বিরোধে জড়িয়ে পড়ে কিংবা ইসলামী ঐক্যের ন্যূনতম প্রয়োজনেও সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়।

আরবরা ব্রিটিশের এজেন্ট T.E. Lawrence প্রমুখের কথায় বিশ্বাস করেছিল কিন্তু ব্রিটিশ তার চরিত্রগত কারণেই আরবদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বালফুরের ঘোষণা অনুযায়ী সম্পূর্ণ আরব অধ্যুষিত ফিলিস্তিনে গায়ের জোরে অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু করে। সেই থেকে আজ অবধি আরবরা তাদের নেতৃবৃন্দের ভুল আর গাদ্দারীর দায় রক্ত দিয়ে শুধে চলেছে।

মুসলিম দুনিয়ায় ফিলিস্তিনের পর এ যাবৎকাল সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ও হঠকারিতার পাশব শিকার হচ্ছে কাশ্মীর। আজ যদি কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও জিজ্ঞাসা করা হয় কাশ্মীর সমস্যার জন্য কে দায়ী সে চোখ বুজে উত্তর দেবে বৃটেন। আসলেও তাই। ভারত বিভাগের নীতি অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে কাশ্মীরের পাকিস্তানভূক্তিই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রিটিশ সরকার, তার ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন এবং মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমিক কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুর ষড়যন্ত্রে কাশ্মীরকে তুলে দেয়া হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের হাতে। তার পরের ইতিহাস ঃ কাশ্মীর এখন হয়ে গেছে আর এক ফিলিস্তিন। শুধু কাশ্মীরকে নিয়ে নয়, ভারত বিভাগের নীতি অনুযায়ী ন্যায্য প্রাপ্যটুকু থেকেও পাকিস্তানকে সেদিন বঞ্চিত করেছে সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী ইঙ্গ-হিন্দু চক্র। পাকিস্তানের মুসলিম অঞ্চলগুলোকে বিশেষ করে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানকে এমনভাবে ভাগ করা হয় যাতে ষড়যন্ত্রকারীরা নিশ্চিত ছিল কোনভাবেই ২৫ বছরের বেশি পাকিস্তান না টেকে। মাউন্টব্যাটেন-নেহরু চক্রের শঠতা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়নি কোনভাবেই। পাকিস্তানের দু অঞ্চলের মুসলমানরা এক দুঃখজনক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ভিতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যা পরিণামে জন্ম দেয় পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের, হয়তো ষড়যন্ত্রকারীরা এটাই একান্তভাবে চেয়েছিল। আরব নেতৃবৃন্দের মতো সেদিনের পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লালসার চাপে এই ষড়যন্ত্রের কোনটাই টের পাননি।

৪

আমরা এ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আগেই বলেছি আমরা এখন ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায় দেখছি। সত্য বটে এ কালে ক্রুসেডের রূপ ও প্রকৃতি

www.pathagar.com

পাল্টেছে। নৌশক্তি নির্ভর একদল ইউরোপীয় হার্মাদ এক সময় মুসলিম দুনিয়াকে পদানত করে ও তাদের সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। সেকালের সামরিক আধিপত্যের সাথে একালে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং এগুলো ক্রুসেডেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। পাশ্চাত্য বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এ যাবৎকাল রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ জাতিসংঘকে ঘিরে, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাংক ও আই, এম. এফকে কেন্দ্র করে এবং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ একশ্রেণীর তৃতীয় বিশ্বের মুখপত্র সৃষ্টি করে পাশাপাশি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে চালিয়ে আসছে। পাশ্চাত্য ক্রুসেডের এই ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রগুলো খুব সার্থকতার সাথে তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এ ক্রুসেড বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান দেশগুলো অদৃশ্যমান ভাবে চালিয়ে এসেছে, কখনো ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে স্বরূপে আবির্ভূত হয়নি। ফলে এ ক্রুসেডের প্রকৃতি ও চরিত্র নিয়ে মুসলিম দুনিয়ায় এ যাবৎকাল কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর পাশ্চাত্য পরিচালিত ক্রুসেডের চেহারা অবমুক্ত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের মুসলিম বিরোধী চরিত্রও নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে।

আজকে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সভ্যতার ইতিহাসে একটা ক্রান্তিকাল হিসাবে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এ ঘটনাতো অনিবার্য ছিল। সহিংসতার গর্ভেই সহিংসতার জন্ম হয়। বিন লাদেন যে জিহাদ ও ইসলামের কথা বলেছে তাকি আমেরিকার এতকালের পরিচালিত ক্রুসেডের প্রত্যুত্তর ও প্রতিক্রিয়া নয়। ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের মতো সমস্যাগুলো কি পাশ্চাত্যই তৈরি করেনি? এমনকি এ যাবৎকাল এদের জিইয়ে রাখার দায়ও কি এদের নয়? বিন লাদেনরা আইন হাতে তুলে নিয়েছে যখন তারা বুঝেছে আমেরিকাই প্রকৃত ধর্ম বা আইনের তোয়াক্কা করে না। আমেরিকা ফ্রিডম শব্দটাকে ব্যবহার করে, কিন্তু সেকি অন্যের ফ্রিডমে বিশ্বাস করে? অন্যের জন্য আইন বানাবার দায়িত্ব নিয়েছে সে, কিন্তু সে আইন মানার পরোয়া করে না।

১১ সেপটেম্বরের ঘটনা প্রমাণ করেছে এ আইনবিহীন বিশ্বে আমেরিকাও অবধ্য নয়। যে সহিংসতার সে জন্ম দিয়েছে, সকল প্রহরীর চোখ এড়িয়ে একটা সময়ের শেষে সেই সহিংসতাই তাকে আঘাত করেছে। সহিংসতা দিয়ে পৃথিবী জোড়া শাসন হয়তো কিছুদিন কায়েম রাখা যেতে পারে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, আমেরিকার এটা বুঝবার সময় এসেছে।

www.pathagar.com

তিতুমীর ও উমর আল মুখতার

বাংলাদেশের মীর নিসার আলী তিতুমীর ও লিবিয়ার উমর আল মুখতার এ দুজনের শ্রেণী ও চরিত্র প্রায় একই ধরনের এবং মতাদর্শিকভাবে তাদের অভিন্নতাও লক্ষ্য করবার মতো। একজন এশিয়ার, অন্যজন আফ্রিকার এই ভৌগলিক অবস্থানগত তফাৎ সত্ত্বেও তাদের লড়াইয়ের ধরন ও সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়ার এক অন্তর্গত সাদৃশ্য দৃশ্যমান। দুজনেরই উত্থান ঘটেছিল কৃষি পটভূমি থেকে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে সমাজের নীচু তলায় পড়ে থাকা অবহেলিত, অজ্ঞাত ও নিপীড়িত শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে তারা জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। তারা সেদিন যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় পোষ্য দালালদের জুলুম, অবিচার ও হয়রানির হাত থেকে বাঁচবার জন্য জিহাদ ছাড়া বিকল্প নেই। জিহাদ বলতে তারা যেমন এতকালের সংস্কারাবদ্ধ মুসলিম সমাজের সংশোধন ও রুপান্তর চেয়েছিলেন, তেমনি সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তারা সত্যিকার অর্থেই এক জনযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। তিতুমীর যখন বারাসাতের পল্লী অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এ লড়াইয়ের সূচনা করেন এবং এ লড়াইয়ের মর্ম যখন খুব দ্রুততার সাথে নিপীড়িত-কৃষিজীবী মানুষের অন্তর স্পর্শ করতে থাকে, যাকে সত্যিকার অর্থেই একটা জনআন্দোলন বলা যায় তখন কিন্তু মার্ক্স বা লেনিনের জন্ম হয়নি অথবা ফরাসী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ভল্টেয়ার বা রবসপিয়েরের লেখালেখি যেমন করে সেখানকার নিপীড়িত মানুষকে ফরাসী বিপ্লবের মতো ঘটনা ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তেমন কোন ধীমান বুদ্ধিজীবী তখন এ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমন কথা জানা যায়নি। তাহলে তিতুমীর ও তার সঙ্গী সাথীরা কোন মতাদর্শিক শক্তির জোরে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার বিচার জরুরি।

ইতিহাসকাররা লিখেছেন তিতুমীরের গুরু ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সেকালের অকুতোভয় সৈনিক বালাকোটের সৈয়দ আহমদ শহীদ। এই গুরু ও শিষ্য উভয়ই সেকালে বিখ্যাত ওহাবী আন্দোলনের চিন্তা ভাবনার সাথে পরিচিত ছিলেন। ওহাবী আন্দোলন ছিল সেকালে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। লক্ষ্য করবার বিষয় হলো ওহাবী শব্দটা এ কালের 'মৌলবাদ' কথাটার মতো ইংরেজ ও তার পোষ্য দালালরা গাল হিসেবেই ব্যবহার

www.pathagar.com

করতো। মুসলমানের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে এ ভাবেই পিষে মারবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এ আন্দোলন প্রধানত ধর্ম সংস্কারমূলক হলেও চরিত্রের দিক দিয়ে এটি ছিল পিউরিটান ধাচের। কিন্তু এদের যে দিকটি সবচেয়ে নজর কাড়ার মতো তাহলো এরা অন্যায়-অবিচার-পরাধীনতার বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিবাদী চরিত্র পুরোপুরি আত্মস্থ করেছিল এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র জনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

স্বভাবতই ইংরেজ ও তার পোষ্য দালালরা তিতুমীরকে মোটেই ছাড় দেয়নি। উন্নত সামরিক শক্তির জোরে তারা তাকে দমন করেই ক্ষান্ত হয়নি, ঘৃণা ও বিদ্বেষে ইংরেজ ও তার পোষ্য লেখক ও ঐতিহাসিকরা তার যথার্থ মূল্যায়ন দূরে থাক, তার চরিত্র হনন করে ছেড়েছে। তারা তার চরিত্র অঙ্কনের বেলায় তাকে 'দস্যু', 'অত্যাচারী' হিসেবে দেখিয়েছে। ইংরেজের অবস্থানটা এখন আমরা বুঝি, কিন্তু যারা এদেশে স্বাধীনভাবে ইতিহাস লিখেছেন, যারা প্রগতিশীল ও আধুনিক বলে পরিচিত তারাও তিতুমীর কিংবা ওহাবীদের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। এ কি আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার ফল?

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ইতিহাসে তিতুমীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা ঠিকই পেয়েছেন, বড় কথা হচ্ছে তিতু কিংবা 'ওহাবী'দের পরিচালিত আন্দোলন ছিল পুরোপুরি একটি ইসলামী আন্দোলন। ইসলামই এদেরকে ধনীর বিরুদ্ধে, দরিদ্রের, জমিদারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত প্রজার এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জেহাদে শক্তি, প্রেরণা ও ভাষা যুগিয়েছিল। এই সব বিপ্লবীরা ইংরেজ রাজত্বের উৎখাত করে দার-উল-হর্ব এর বদলে দার-উল-ইসলাম বা দার-উল-আমান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই দার-উল-আমানই হচ্ছে আজকের সিভিল সোসাইটি বা সভ্যতার শাসন। ইংরেজ এদেশের উপর যে অপশাসন চাপিয়ে দিয়েছিল বিপ্লবীরা তার বিরুদ্ধে সভ্যতার শাসন কায়েম করবার জন্য লড়েছিলেন মাত্র। কিন্তু গোলমালটা এখানেই। ইংরেজ তার শক্তির জোরে বিপ্লবীদের গায়ে কাদা ছড়িয়ে দেয়, আর বর্বর ইংরেজ বনে যায় সভ্যতার বরপুত্র।

বারাসাতের তিতুমীরের গায়ে যেমন ইংরেজ দস্যুতার লেবেল এটে দেয় তেমনি লিবিয়ার উমর আল মুখতারকেও ফ্যাসিস্ট ইটালী সন্ত্রাসী বলে গাল দেয়। ওহাবী আন্দোলনের মতো আফ্রিকায় সে সময় দানা বেধেছিল সানুসী আন্দোলন। এ আন্দোলনও ছিল সমাজের নীচু তলা থেকে উঠে আসা জনপ্রিয় আন্দোলন। চরিত্রগত দিক দিয়ে ওহাবীদের মতোই তারা ছিল পিউরিটান এবং মতাদর্শিকভাবে ইসলামের অনুবর্তী। এখানেও খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে সানুসীরা আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বিশেষ করে লিবিয়ার সাইরেনিকা অঞ্চলে সানুসীরা ফ্যাসিস্ট ইটালীর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে, তা এক অবিস্মরণীয় মাত্রা অর্জন করে। এ প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন শহীদ উমর আল মুখতার।

এরকম ভাবে তিতু বা উমরের মতো যে কেউ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেয়েছে তাদের উপর দিয়েই গাল মন্দ আর নিন্দার ঝড় বয়ে গেছে। দুনিয়ার এমন কোন খিস্তি খেউড় নেই যা এদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রয়োগ করেনি। এদের সম্পর্কে ইতিহাসে যত কুৎসা, যত রটনা এর পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। সাম্রাজ্যবাদীরা এই সব বিপ্লবীর বিরুদ্ধে যত রকমের অভিযোগ বা অপপ্রচার চালাক না কেন, এতে এটাই প্রমাণ হয় এরা আর যাই হোক সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও পেটোয়া ছিলেন না। আর পেটোয়া ছিলেন না বলেই সাম্রাজ্যবাদের যাবতীয় ক্ষোভ যেয়ে পড়েছে এদের উপর। গত প্রায় কয়েকশ বছর ধরেই সাম্রাজ্যবাদের এই একতরফা খিস্তি চলছে। এখন যেমন মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রচার বিভাগ জোরে শোরে আফগানিস্তানের তালেবান ও ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খিস্তি, খেউড় ও চরিত্র হননতো সাম্রাজ্যবাদীদের ঐতিহাসিক পেশা, আজও তার ধারাবাহিকতা চলছে।

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান বরাবরই স্পষ্ট। এই অবস্থান নিয়ে বরং সাম্রাজ্যবাদপন্থী বা সহযোগী ঐতিহাসিকরাই কুয়াশা সৃষ্টি করেছেন। এই আন্দোলন ও সংগ্রামকে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতো করেছেনই, তারা একে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও নারাজ। আজ যেমন ইরাক, আফগানিস্তান কিংবা ফিলিস্তিনে অনেকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের পক্ষ নিয়েছেন, এমনকি এই অন্যায় পাশব যুদ্ধগুলোতে আমাদের অনেক মার্কিন বন্ধুরাও মজেছেন, মার্কিন প্রচারে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সাদ্দাম হোসেন, তালেবান ও ফিলিস্তিনের হামাস ও ইসলামী জিহাদের বিরুদ্ধে আজকের মার্কিন প্রচারণার এই ধরনের সাথে সেই ঔপনিবেশিক কালে ওহাবী বা সানুসীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারণা কৌশলের মধ্যে কোনই ভিন্নতা নেই। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সেকালেও ইসলাম বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছে, আজও করছে। ইসলামের এ গৌরবজনক ভূমিকায় কোন অস্বচ্ছতা নেই। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বুঝতে এ বিষয়টি আগে আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

সভ্যতার লুণ্ঠন

সভ্যতা নিয়ে এখন কাড়াকাড়ি চলছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার শক এ্যান্ড অ (Shock and awe) মার্কা তুমুল সন্ত্রাসে সারা পৃথিবীকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছে। মার্কিনীরা কখন কাকে সভ্য বলবে, কখন কাকে পশ্চাদগামী বানাবে সেই ত্রাসে

www.pathagar.com

আজ পৃথিবীর মানুষ তটস্থ হয়ে উঠেছে। এই মার্কিন যুদ্ধ যে আসলেই ঔপনিবেশিক যুদ্ধ তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকবার কথা নয়। যেহেতু ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে থাকে অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রাযুক্তিক শ্রেষ্ঠত্ব তাই স্বভাবত সভ্যতার সংজ্ঞা ও জ্ঞানকাঠামো তারাই নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের মত করেই সভ্যতার অবয়ব তৈরি হয়। শক্তির বিচারে তারাই যখন সভ্য, আধুনিক আর সুশীল তাই দুনিয়ার শাসন ক্ষমতাও তাদের প্রাপ্য, অন্তত এই তাদের নৈতিক বিবেচনা। পরদেশ লুণ্ঠন, অন্য জাতিকে পদানত করা আর পৃথিবী ব্যাপী পরিবেশ ও প্রাণের সংকট সৃষ্টি করাও এই সভ্যতার এথিকসের মধ্যে পড়ে। এতে কোন নীতি লংঘনের প্রশ্ন আসে না। অন্যদিকে উপনিবেশিত জাতিসমূহ যেহেতু অসভ্য তাই তাদের লুণ্ঠিত হওয়াই নিয়তি। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে লাঞ্ছিতা ইরাকের কথা একবার ভাবুন। এখন দুনিয়ায় যে যত বড় লুণ্ঠনকারী, সেই তত বেশি সভ্য। মার্কিনীদের গুরু ইংরেজদের ক্ষেত্রেও এরকম কথা খাটে। পাকিস্তানের এককালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম জুলফিকার আলী ভুট্টো গত শতকের আশির দশকে বৃটেনের কাছে 'কোহিনূর' মনি, যা এখন সেখানকার রানীর মুকুটের শোভা বর্ধন করছে, ফেরত দেবার দাবি করেছিলেন। এই 'কোহিনূর' বৃটিশরা ভারত থেকে লুট করেছিল। ভুট্টোর দাবির উত্তরে বৃটেন যা বলেছিল তা প্রনিধানযোগ্য ঃ কোহিনূরকে নাকি ভারতবর্ষের প্রজারা তাদের সেদিনকার রানীকে পরম প্রীতির নিদর্শন স্বরুপ উপহার দিয়েছিল, সুতরাং তা অফেরতযোগ্য। আজকের সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার সাথে এর কি আশ্চর্য মিল। নিপীড়িত, লুণ্ঠিত, উপনিবেশিত জাতি কি কোন দিন ত্রাস সৃষ্টিকারী, আগ্রাসী ও ঔপনিবেশিক শক্তিকে উপহার দেয়, পুরস্কৃত করে কিংবা অভিনন্দন জানায়? মিথ্যাচারের নমুনা দেখুন। সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ থেকে শুধু কোহিনূর লুট করেনি, তাদের লুটের পিপাসা মেটাতে যেয়ে ভারতবাসীকে কাঙ্গাল হতে হয়েছিল। এই লুটের দীর্ঘ ফিরিস্তি ইতিহাসকাররাও দিয়েছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর একমাত্র লর্ড ক্লাইভই তখনকার নামকাওয়াস্তে নওয়াব মীর কাশেমের কাছ থেকে বাগিয়ে নেয় দুলক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড আর রাতারতি ক্লাইভ গণ্য হয় বৃটেনের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন হিসেবে। মজার ব্যাপার হলো লুণ্ঠক ক্লাইভের পাপ মোচন করার জন্য এর কিছুদিন পর ইংরেজরা পরিকল্পিত ভাবে তাদের খয়ের খাঁ গোলাম হোসেন নামে এক জাল ঐতিহাসিককে দিয়ে 'সিয়ারুল মুতাখখেরীন' নামের এক ইতিহাস গ্রন্থ লেখায় যেখানে বলা হয় সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদে ক্লাইভ হাজির থেকেও লুটে অংশ নেয়নি-সব কিছু লুটে নেয় দুজন হিন্দুর সাথে দুজন মুসলমানও।

অথচ ইতিহাস বলছে অন্য কথা। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তার সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন এবং লিখেছেন ঃ কর্ণাটকে লুটতরাজের হোতা কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ ও এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সাহেব

www.pathagar.com

একযোগে বাংলায় প্রবেশের পথেই পলতা নৌঘাটির উপকণ্ঠে জাহাজে বসেই পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, বাংলায় তারা একযোগে লুটপাট চালাবেন এবং লুণ্ঠিত বিত্ত-সম্পদ সমান সমান ভাগ করে নেবেন। (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজউদ্দৌলা, পৃঃ ২৫০) ইংরেজ দস্যুরা এ দেশের উপর যে বীভৎস শোষণ-লুণ্ঠন-উৎপীড়ন চালিয়েছিল তার পরিণতিতে নেমে আসে ছিয়াত্তরের মন্বান্তর, ইংরেজ আমলা উইলিয়াম উইলসন হান্টারও এ মর্মবিদারী ঘটনা চাপা দিতে পারেন নি। তার ভাষায় ঃ ১৭৭০ সালের সারা গ্রীষ্মকাল ব্যাপী লোক মারা গেছে। তাদের গরু বাছুর লাঙ্গল জোয়াল বেচে ফেলেছে এবং বীজধান খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে তারা ছেলে-মেয়ে বেচতে শুরু করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সময় আর ক্রেতাও পাওয়া গেল না। তারপর তারা গাছের পাতা ও ঘাস খেতে শুরু করে এবং ১৭৭০ সালের জুন মাসে দরবারের রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোস্ত খেতে শুরু করে। অনশনে শীর্ণ, রোগে ক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষ দিনরাত সারি বেধে বড় বড় শহরে এসে জমা হতো। বছরের গোড়াতেই সংক্রামক রোগ শুরু হয়েছিল। মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদে পানি বসন্ত দেখা দেয় এবং বহু লোক এই রোগে মারা যায়। শাহজাদা সাইফুতও এই রোগে মারা যান। মৃত ও মরণাপন্ন রোগী স্তূপাকারে পড়ে থাকায় রাস্তাঘাটে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাশের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তা পুঁতে ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের মেথর, কুকুর, শেয়াল ও শকুনের পক্ষেও এত বেশি লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত গলিত লাশ মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল। (পল্লী বাংলার ইতিহাস ঃ হান্টার, পৃঃ ২২-২৩)

ইংরেজের লুণ্ঠনে এদেশের মানুষ যখন দুঃখ দুর্দশায় আকুল হয়ে উঠেছে, তখন এদেশের লুণ্ঠিত সম্পদে বৃটেনে শুরু হয়ে গেছে শিল্প বিপ্লব, আয়োজন চলছে নতুন সভ্যতার বিস্তারের।

সাম্রাজ্যবাদের এই নাটক কিন্তু আজও শেষ হয়নি। দুনিয়ার তাবৎ সম্পদ কুক্ষিগত করার সেই চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদের আজও একমাত্র লক্ষ্য। এর জন্য সবরকমের হামলা, আগ্রাসন, নরহত্যা ন্যায়সিদ্ধ এবং সেটাই তাদের ভাষায় মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও গণমুক্তির রক্ষাকবচ। একটা উদাহরণ দেয়া যাক।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা বলছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সরকার ব্যবস্থা। আমরাও চোখ বুজে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু এটাওতো আমরা দেখছি গণতন্ত্র গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য অবরোধ আরোপ, জনগণকে অনাহারে রাখা, চিকিৎসার সুবিধা থেকে শিশুদের পর্যন্তও বঞ্চিত করা এবং তাদের ভাষায় প্রয়োজনে এটাই নাকি কাম্য। গণতন্ত্রের এই ধর্মে রুপান্তরিত না হওয়ার কারণে বহু মানুষকে জীবন দিতে হচ্ছে। গণতন্ত্র এখন জনগনের শাসন

www.pathagar.com

নয়, সাম্রাজ্যবাদের শাসন। সাম্রাজ্যবাদের এই মর্ম বুঝতে এখন আমরা একটু ইরাকের দিকে চোখ ফেরাই। ইরাকে কেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হামলা করলো? 'স্বৈরাচারী' 'অপশাসক' সাদ্দাম হোসেনের হাত থেকে নিরীহ নিপীড়িত ইরাকীদের রক্ষা করার জন্য, অন্তত মার্কিন প্রচার বিভাগের বদান্যতায় সেটাই আমরা জানতে পেরেছি। মার্কিনীরা প্রচার করেছে ইরাকীরা সাদ্দাম হোসেনকে চায় না। যুদ্ধের আগে এটাও আমরা শুনেছি মার্কিন বাহিনী ইরাকে প্রবেশ করা মাত্রই সেখানকার জনগণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স অবরোধমুক্ত হওয়ার পর ফরাসী জনগণ যেরকম মিত্রবাহিনীকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল, সেরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। ভাবটা এমন মার্কিন বাহিনী অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইরাকে যাচ্ছে, শুধুমাত্র সেখানকার জনগণের স্বার্থে। ইংরেজদের প্রচারণার সাথে আজকের মার্কিন প্রচারণার কি অদ্ভুত মিল। ইংরেজরাও বলতো 'বাংলার মানুষ সিরাজকে চায় না। তারা বিপ্লব করবে সিরাজের বিরুদ্ধে, ইংরেজরা বাধ্য হয়ে সেই বিপ্লবে শামিল হবে, কারণ সিরাজ শুধু বাংলার বিরুদ্ধে নয়, ইংরেজেরও বিরুদ্ধে। বাংলার মানুষ কেন সিরাজের বিরুদ্ধে যাবে, যিনি নাকি স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন? লক্ষ্য করুন সিরাজের ভাগ্যই আজ বরণ করতে হচ্ছে লাদেনকে, সাদ্দামকে, ফিলিস্তিনের হামাসকে। সিরাজ যেহেতু স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাই ইংরেজের চোখে তিনি ছিলেন চরিত্রহীন, মদ্যপ, অপদার্থ, হৃদয়হীন মানুষ, ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অন্তত সে কথা লিখে গেছেন। আজকের মার্কিন প্রচার যন্ত্র সেই কৌশল ভালভাবে আয়ত্ত করেছে বোঝা যাচ্ছে, আর তাছাড়া বৃটিশরাতো এখনও মার্কিনীদের ফ্রেন্ড, ফিলসফার ও গাইড। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কেন ইরাকে এই হামলা, ধ্বংস ও নরমেধযজ্ঞের সূচনা করলো তার উত্তর এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঠিক যে কারণে ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল, একই কারণে মার্কিনীরা ইরাকে গিয়েছে।

ভারত ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র। ভাসকো ডা গামা থেকে শুরু করে সকল ইউরোপীয়দের তখনকার একটাই স্বপ্ন ছিল ভারতের অপরিসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া। সেই সমৃদ্ধি লুটতেই একদিন ইউরোপীয়রা ভারতে পৌঁছে গিয়েছিল, সেই আনন্দের কথা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকও চেপে রাখতে পারেননি ঃ

In the history of the world there is no more wonderful story than that of the making of the British Empire in India. (Colonel G. B. Malloson: The Indian Mutiny of 1857, p-1)

আজ মার্কিনীরাও ইরাকে পৌঁছেছে অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। ইরাকের তরল সোনা হয়েছে কাল। সেই সোনার অধিকার চায় আমেরিকা।

www.pathagar.com

সভ্যতার স্কুল

সভ্যতার ব্যাপারটা নিয়ে এখন অনেকেই ভাবছেন। সভ্যতার ধারণার মধ্যেই যে একটা মুশকিল আছে তা এখন অনেকেই টের পাচ্ছেন। সভ্যতা মানে আমি পশ্চিমী সভ্যতাকেই বুঝাচ্ছি। এ সভ্যতার স্কুলে আমাদের হাতে খড়ি হয়েছে বহুদিন। সেই ঔপনিবেশিক কাল থেকে পাঠ নিতে নিতে আমরা বোধ হয় যথেষ্ট পরিমাণ আধুনিকতা, প্রগতি ও যুগোপযোগিতার ধারণাও আয়ত্ত করতে পেরেছি। সভ্যতা আমাদের মনে ও মগজে এমন জবরদস্ত ছাপ মেরে দিয়েছে যে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে নিজের ধর্ম, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকেও আমাদের বড় ভয়। লক্ষ্য করুন এদেশের সাধারণ মানুষ বসনিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাকের বিপর্যয়ে যে রকম দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং ওখানকার নিপীড়িত মানুষের সাথে সংহতি উচ্চারণ করেছে আমাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ঠিক সেরকম করে এগিয়ে আসতে পারেনি। এর কারণ কি? আধুনিকতা আমাদের শুধু আলোকিত হবার শিক্ষাই দেয়নি, হীনমন্যতার পাঠও দিয়ে দিয়েছে। ঐ হীনমন্যতার দীনতার কারণেই আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী পশ্চিমের ন্যায় ও জ্ঞান কাঠামোর বাইরে মাথা উঁচু করতে বড় বেশি ভয় পান। যে সভ্যতাকে আমরা সভ্যতা বলে অহর্নিশ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি সেটা আসলে কতটুকু সভ্য সেটা নির্ণয় করার মানসিকতাটুকুও আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর অবশিষ্ট নেই। একদিকে পশ্চিমের গলগ্রহ ও উচ্ছিষ্ট ভোজন অন্যদিকে নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জনগণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার শিক্ষাই কি এতকাল এই আধুনিকতার স্কুল থেকে আমরা পেয়ে আসিনি? এর পুনর্বিবেচনা আজ জরুরি।

যুদ্ধ, রক্তপাত, ধ্বংস ও নরমেধযজ্ঞ ছাড়া যে সভ্যতা টিকতে পারে না, মারণাস্ত্রের ভারছাড়া যে সভ্যতার কলকাঠি চলে না, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর সন্ত্রাসের বীজ বুনে দেয়া যে সভ্যতার অপরিহার্য ধর্ম তাকে মেনে নেয়া বা অনুসরণের মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। পশ্চিমী গণমাধ্যমের বরাতে আমরা এখন অনেকেই মজেছি। 'ইসলাম' ও 'মুসলমান' নাম শুনলেই আমাদের অন্তর কোণে ঘৃণার উদ্রেক হয়, ভাবটা এমন অন্তত এ দুটি জিনিস থেকে যতদূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। এই প্রক্রিয়া সাম্প্রতিককালে ভয়ানক আকার ধারণ করেছে আফগানিস্তানের তালেবানদের কেন্দ্র করে। তালেবানদের নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে পশ্চিমের কৌশলী প্রচারণার বরাতে। তালেবান মানেই মধ্যযুগীয়, বর্বর, ঘৃণার যোগ্য এই ভাবমূর্তি পশ্চিমের প্রচার কৌশলের ফসল, আর তালেবানরা যেহেতু ইসলামী পন্থার অনুবর্তী, সুতরাং ইসলাম হচ্ছে এই বর্বরতা ও অসভ্যতার অনুঘটক, এই জিনিসটাও পশ্চিম এখন আমাদের প্রকাশ্যে নয়, আকারে ইংগিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী ইসলাম কি

www.pathagar.com

আর তালেবানদের মতাদর্শ কি সেটা কখনো স্বউদ্যোগে বুঝবার চেষ্টা করেননি। তারা অজ্ঞ থাকাটাই পছন্দ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এটাই হচ্ছে প্রগতিশীলতা।

এই তালেবানরা যখন বৌদ্ধ মূর্তি ভেঙে ফেললো তখন চারদিকে রি রি শোনা গেলো। পশ্চিমী সভ্যতার চোখ দিয়ে দর দর বেগে অশ্রু প্রবাহিত হলো। যেন এরকম অপরাধ অতীত ইতিহাসে আর কেউ করেনি। তালেবানদের অপরাধ 'সভ্যতা' কোনভাবেই ক্ষমা করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে বাগদাদ পতনের পর হানাদারদের প্ররোচণা ও উদ্যোগে সেখানকার জাদুঘর ও গ্রন্থাগার লুট করিয়ে দেয়া হলো। এ লুটেরাদের সাথে আজ ইরাকের স্বঘোষিত মুক্তিদাতা ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীর সম্পৃক্ততাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। এমনি করে বিশ্বসভ্যতার নানা গৌরবের নিদর্শন ও মূল্যবান পূরাতাত্ত্বিক সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যাখ্যা কি? সভ্যতার চোখে এবার কিন্তু অশ্রু দেখা যায়নি। হাজার হাজার বছরের প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন লুট কিংবা ধ্বংস করিয়ে দিয়ে 'সভ্যতা' এখন তার রাজসিংহাসনে বরং জেঁকে বসেছে। মাত্র দুটি বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করে তালেবানরা ক্ষমা পায়নি। বর্বরতার খেতাব থেকেও অব্যাহতি পায়নি। আর এমনি করে পুরো একটি দেশ গুড়িয়ে দেয়া হলো, তার অতুলনীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ধ্বংস করে দেবার পরও কেউ প্রশ্ন তোলেনি। না পশ্চিমা গণমাধ্যম, না পশ্চিমের কোন বিবেকবান বুদ্ধিজীবী? ইরাকের কাছে সভ্যতার ঋণ অনেক। অ্যান্টনি ব্রাউন সেই ঋণের একটা তালিকাও আমাদের দিয়েছেন ঃ কৃষিকর্ম তথা চাষ-বাস, চাকা আবিষ্কার, চাকা নির্ভর রথ, লেখালেখি, সাহিত্য, নগর পত্তন, আইনের শাসন, হিসাবপত্র সংরক্ষণ (ডাবল এন্ট্রি বুক কিপিং), জ্যোতিষ ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা সত্য আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীদের সমূহ লক্ষ্য ইরাকের খনিজ তেল। কিন্তু এটাওতো সত্য ইরাক মানে সাদ্দাম হোসেন নয়, খনিজ তেল নয়, ইরাক মানে মানব সভ্যতার সূতিকাগারও। ইতিহাসের পাতায় ছড়ানো কত নাম। ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া, নিনেভ, উর, টাওয়ার সব ব্যাবেল, নেবুচাদনেজার, হামুরবি, এপিক অব গিলগামেশ, হারুন অল রশীদ, অ্যারাবিয়ান নাইটস, বায়তুল হিকমা। এমনি করে আধুনিক সভ্যতা শুধু ইরাকের তেল নয়, ইরাকের অতীতও লুটে নিতে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদের এ চেহারা নতুন নয়। একটি দেশের বস্তুগত সমৃদ্ধি যেমন তারা লুটে নেয় তেমনি তার অতীতকেও হরণ করা এদের কাজ। আমাদের এই উপমহাদেশই তার উজ্জ্বলতম নজীর। আজও এখানকার নানা মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ রক্ষিত লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্কের সংগ্রহশালাগুলোতে। ইরাকের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ লুণ্ঠন এ তালিকারই সম্প্রসারিত সংযোজন মাত্র।

www.pathagar.com

ভাবতে অবাক লাগে আধুনিকতা, আধুনিক শিক্ষা, কিংবা আধুনিক সভ্যতা কি আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয়? যুগোপযোগিতা কথাটার মানে কি এই তালেবানরা যে কাজ করলে অপরাধ, মার্কিনীরা সেটা করলে প্রয়োজন। 'যুগের প্রয়োজন' কথাটার মর্মই আজ বদলে ফেলার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রয়োজন দ্রুত সম্পন্ন না করতে পারলে মানবজাতির অস্তিত্বই সংশয়াপন্ন হয়ে উঠবে। আজ যুগের প্রয়োজনেই আমাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি অর্জন করা চাই এবং সেই বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রজ্ঞা অর্জন জরুরি হয়ে পড়েছে যাতে এই আগ্রাসী সভ্যতার রূপান্তর করে আমরা এক মানবিক সভ্যতার ভিত প্রস্তুত করতে পারি।

নয়া উপনিবেশবাদ ঃ সাম্রাজ্যবাদ

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে কাঞ্চীরাজ বলেছিলেন ঃ আমার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে চুরিকেও লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার গুরু ইংল্যান্ড গত কয়েকশ বছর ধরে এ 'লোকহিতের' কাজটা খুব সুচারু দক্ষতার সাথে করেছে সন্দেহ নেই। যুদ্ধ, লুণ্ঠন, আর হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে হলেও সাম্রাজ্যবাদ তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল আর তা করবার জন্য যত রকম সাফাই গাওয়া দরকার সাম্রাজ্যবাদ তা করবেই। তাতে সত্যের মুখে যত কঠিন চপোটাঘাত পড়ুক কিছু আসে যায় না।

আঠার আর উনিশ শতকে ইংল্যান্ড এবং বিশ ও একুশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত যুদ্ধ করেছে তার সবটাই কোন না কোন 'মহান' কারণে। মনে পড়বে উনিশ শতকে স্পেনের কাছ থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ফিলিপিনসকে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ ও দখল করে নেয়। একটা কেজো যুক্তি যুক্তরাষ্ট্র তখন দাঁড় করায় ফিলিপিনসের সৈন্যরা নাকি আমেরিকানদের উপর গুলী চালিয়েছে। ফিলিপিনস দখলের সময় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাগড়াম্বরটুকু একটু খেয়াল করুনঃ সেটা আমরা ওদের উপর ছেড়ে দিতে পারি না। ওরা সরকার চালাবার উপযুক্ত নয়, তাতে শুধু অরাজকতা বাড়বে......ওদের দখল করে শিক্ষিত করা, উন্নত করা, সুসভ্য করা ও খ্রীশ্চান করা ছাড়া কোন উপায় নেই। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা যতটা পারি করব, কারণ ওরাওতো মানুষ, যীশু তো ওদের জন্যও প্রাণ দিয়েছিলেন।

এই সব লোক ঠকানো কথা, মিথ্যাচার, বাগড়াম্বর কি আজকের জুনিয়র বুশের বক্তৃতা গুলোকে মনে করিয়ে দেয় না?

অশ্বেতাঙ্গ, অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া জাতিগুলো কিসে ভাল হবে এইটে ভাল করে জানে না, নিজের ব্যাপারে কোন্ সিদ্ধান্তটি সঠিক হবে তাও ভাল করে বলতে পারে না সুতরাং ওদের সিদ্ধান্ত নিতে, ওদের মঙ্গলের জন্য আগ বাড়িয়ে সাহায্য

www.pathagar.com

করা চাই। কিপলিং এর সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত কবিতা White Man's Burden এর মর্মার্থ এখানে খুবই প্রাসংগিক। কিপলিং এ কবিতাটি লিখেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপিনস জয় নিয়ে। তার কাছে মনে হয়েছিল ব্রিটিশরা এই বিরাট সাম্রাজ্যের ভার বহন করতে পারছে না। সুতরাং অতলান্তিকের ওপার থেকে তাদের সাদা মুখো ভাই বেরাদরদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত। কিপলিং এর কথা কি অদ্ভুত ভাবে ফলে গেছে। কিপলিং মরেননি, তিনি আজো বেঁচে আছেন। সেই ফিলিপিনসের কায়দায় আজ আবার ইরাক দখল করে নেয়া হয়েছে। এই দখলের তালিকা অনেক দীর্ঘ যা সহজে লিখে শেষ করা যাবে না। মেক্সিকো, কোরিয়া, গুয়াতেমালা, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, চিলি, নিকারাগুয়া, গ্রানাডা, পানামা, সুদান, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার স্বৈরতন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার নামে এবং যথারীতি গণতন্ত্র নামীয় সোনার হরিণের জয়ধ্বনি তুলে মার্কিন বাহিনী ইরাকে এসে হাজির হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এবারও যুদ্ধে যাওয়ার পক্ষে ছলচাতুরীর কোন অভাব হয়নি। প্রথমে শোনা গেল ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে-কিন্তু সে অস্ত্র কেউ চোখে দেখেনি। না জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরা, না বিজয়ী মার্কিনীরা, আর যুদ্ধের সময়ও ইরাকীরা সেগুলো ব্যবহার করা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। আবার অন্যদিকে সাদ্দামের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলা হলো। সুতরাং যুদ্ধই হলো সমাধান। সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই রয়েছে এই আগ্রাসনের অবশ্যম্ভাবিতা। এক নাগাড়ে ২২ দিন ধরে প্রতিদিন প্রায় বাংলাদেশী টাকায় ১০,০০০ কোটি টাকার বোমা আর মিসাইল উগরে দেয়া হলো ইরাকের মাটিতে। তারপরেও মার্কিন প্রশাসনের ছাপাই এটা নাকি বিশ্ব শান্তির জন্য অপরিহার্য ছিল, এই হত্যা, ধ্বংসলীলা ও বিপর্যয়ের ভেতর থেকেই নাকি প্রকৃত শান্তির পুনরুত্থান ঘটবে।

১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে প্রায় ২০ লাখ ইরাকী প্রাণ হারায়। তারপর অবরোধের কারণে শুধুমাত্র ওষুধ ও খাদ্যের অভাবেই ৫ লাখ শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ক্লিনটন প্রশাসনের সেক্রেটারী অব স্টেট ম্যাডলিন অলব্রাইটকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল ইরাকে অবরোধের কারণে যে ৫ লাখ শিশু মারা গিয়েছে এ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন কি? তিনি বললেন সবদিক বিবেচনা করে We think the price is worth it, আমরা সবদিক বিবেচনা করে যা করেছি তাতে পাঁচ লাখ শিশুর প্রাণ এমন কিছু নয়। সব ঠিক আছে। এর চেয়ে ভয়ানক, বিপজ্জনক, সভ্যতা বিনাশী ক্রিমিনাল কথা আর কি হতে পারে? অথচ এই সাম্রাজ্যবাদী ক্রিমিনালরাই আজকে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মুক্তবুদ্ধি আর মানবাধিকারের বুলি কপচিয়ে বেড়ায়। এদের মুখেই আজ শান্তির ললিত বাণী।

www.pathagar.com

এই যদি হয় আজকের পৃথিবীর বাস্তব পরিস্থিতি সেক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষে সাদ্দাম হোসেন কিংবা উসামা বিন লাদেন অথবা মোল্লা ওমরের কর্মকাণ্ডের নৈতিক মূল্যায়ন করতে যাওয়া একটা বড় রকমের নাটক ও তামাশা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে। মোল্লা ওমরের ইসলামী রাষ্ট্র, সেখানকার বিচার ব্যবস্থা অথবা পশ্চিমী গণমাধ্যমে তালেবান রাষ্ট্রের মহিলাদের অবস্থা যেমন করে দেখানো হতো-বোরকাবৃত, নির্যাতিত ও নিগৃহীত কিংবা স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক কুর্দীদের উপর গ্যাস বোমা নিক্ষেপ এসবতো এখন মার্কিনীদের কর্মকাণ্ডের কাছে ডাল-ভাত। যে সভ্যতা নরহত্যা, শিশু হত্যা, বর্বরতা, হিংস্রতা সবকিছু জায়েজ করে নিয়েছে, যারা বিপুল সমরাস্ত্র, মারণাস্ত্র, ক্লাস্টার বোমা, নিউক্লিয়ার বোমা মওজুদ করে মানুষ হত্যার অবিশ্বাস্য আয়োজন শুরু করেছে, যাদের কাছে পাঁচ লাখ বেগুনাহ শিশু হত্যা খুবই একটা প্রয়োজনীয় যুদ্ধের অংশ সে সভ্যতাকে এখন আমরা সভ্যতা বলব কিনা, সেটাকে কোনো মানদণ্ড, নীতিকথা ও তত্ত্বের আলোকে সভ্যতা হিসেবে প্রত্যয়ন করা যায় কিনা তা অবশ্য গভীরভাবে ভাববার বিষয়। আফগানিস্তান ও ইরাকে হানাদার মার্কিনীদের আক্রমণ, আগ্রাসন, নরহত্যা আর বর্বরতা আধুনিক সভ্যতার খোলস খুলে তার ভেতরের কুশ্রী কদাকার চেহারাটা ভালো মতো পৃথিবীর মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের ভিতর-বাহির

জর্জ বুশ খাঁটি কথা বলেছেন, আমরা ও তোমরা। হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে অথবা তোমরা ওদের পক্ষে। সহজ হিসাব। আমাদের দুশমন হবার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। হয় তোমরা আমাদের আধিপত্য মেনে নাও নতুবা ধ্বংস হয়ে যাও। সাম্রাজ্যবাদের ভাষা সবকালে, সবদেশে একই রকম। এর প্রকৃতি বদলাবার নয়। হিটলার, মুসোলিনীও একই কথা বলেছিলেন। জর্জ বুশের গলায়ও একই সুর। আমাদের পৃথিবী এখন ভয়ংকর সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ইরাক আক্রমণ তাদের স্থূল লোভের চেহারা এমন নগ্ন করে দিয়েছে যে এদের 'সুসভ্য', 'মানবিক', 'গণতান্ত্রিক' ও তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' চেহারা একেবারে খুলে পড়ে গেছে। ইরাকে আছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলের মজুত। এই বিশাল তেল ক্ষেত্র লুণ্ঠন, দখল ও করায়ত্ত করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকে হানা দিয়েছে এবং যুদ্ধের পর কার্যত এখন আমেরিকা এগুলোর মালিক-মোক্তারও হয়ে বসেছে। এখন এই তেল স্বাধীন ভাবে তুলে নিজেদের কোম্পানীর মাধ্যমে সারা বিশ্বে বাজারজাত করতে পারলে মার্কিন তেল কোম্পানী ও এর সাথে যুক্ত মার্কিন প্রশাসনের লোকজনের স্বার্থ রক্ষা হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সাদ্দাম হোসেনের শত্রুতার এটাই হচ্ছে প্রধান কারণ, কেননা তিনি মার্কিনীদের

www.pathagar.com

কথামতো তেলের বাজারজাতকরণের সুপারিশ মানতে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। যা ছিল তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন তেল স্বার্থের এবং সাধারণভাবে মার্কিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বড় হুমকিস্বরূপ। ইরানের এককালীন প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের কথা স্মরণ করুন। জনগণের সমর্থন নিয়ে মোসাদ্দেক ক্ষমতায় এসেই অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীকে জাতীয়করণ করেছিলেন। মোসাদ্দেকের এই অপরাধ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহজে ক্ষমা করেনি। পরে নানা চক্রান্তের মাধ্যমে তারা মোসাদ্দেককে উৎখাত করে শাহকে ফিরিয়ে আনে এবং ইরানে তাদের তেল স্বার্থ নিশ্চিত করে। তারপর যখন শাহকে দ্বিতীয় দফা বিতাড়িত করে আয়াতুল্লাহ খোমেনী সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান অনেকটা সুবিদিত, তখন তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উঠে পড়ে লাগে। মনে রাখা দরকার সাম্রাজ্যবাদের চোখে তারাই Rogue state, Axis of Evil যাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট, সাম্রাজ্যবাদের দস্যুবৃত্তি ও যাবতীয় অপকর্মের যারা কঠোর সমালোচক। সাম্রাজ্যবাদের অবাধ্য রাষ্ট্রের এই তালিকা এখন দীর্ঘ হচ্ছে ঃ সুদান, লিবিয়া, সিরিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রভৃতি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চূড়ান্ত সত্য হয় এবং সেই কারণেই যদি সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করা হয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে কি স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রের কোন অভাব রয়েছে? সেখানে কেন মার্কিন বাহিনী হানা দিচ্ছে না? মধ্যপ্রাচ্যের শেখতন্ত্রগুলোকে রক্ষা করছে কে? যেহেতু এদের আজ্ঞাবাহী চরিত্র সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সন্দেহ নেই, তাই এদের গণতান্ত্রিক অব্যবস্থাপনার সমালোচনা দূরে থাক, এদের যাবতীয় নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পররাষ্ট্র আক্রমণকারী ইসরায়েলের কেশাগ্র স্পর্শ না করলেও ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কুয়েতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইরাককে এই আক্রমণে প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোপন ভূমিকা এখন আর কারও অজানা নেই। অন্যদিকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর-পরই কুয়েতকে ইরাকের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতেও তাদের ভূমিকা কম ছিল না। আবার আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই ইরানের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনকে যুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার কৃতিত্বও মার্কিনীদের। এসব তথ্যও এখন ধীরে ধীরে আলোর মুখ দেখছে। আজ যে এখন ইরাকের হাতে নানা রকম মারণাস্ত্রের কথা উঠেছে এর অনেক কিছুই কি ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় গোপনে সাদ্দামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সরবরাহ করেনি? এটাতো আজ স্পষ্ট সাদ্দাম হোসেন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একসাথে কাজ করেছেন

www.pathagar.com

তখন কিন্তু তার বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্রের ছাপ মারা হয়নি। যে মুহূর্তে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নতজানু নীতি-গ্রহণ করা থেকে সরে আসলেন, তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে দুনিয়ার হেন খিস্তি খেউড় নেই যা বর্ষিত হলো না। এক্ষেত্রে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতি বিশেষ করে ইরাক নীতি অনুসরণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ইরাক যুদ্ধ একটা পরিকল্পিত ব্যাপার, তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়। শুধু ধাপে ধাপে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাত্র।

এক্ষণে ইরাক আক্রমণ করে সেখানে মার্কিন দখলদারী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক নয়া উপনিবেশবাদী যুগের সূচনা হলো। আঠার আর উনিশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য ও পুঁজির নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার জন্য দেশে দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল, এর সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কার্যকারণও ছিল। সাম্রাজ্যবাদ তখন বিভিন্ন দেশ দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করে। নিজেদের সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের মাধ্যমে এই শাসন কার্য পরিচালিত হতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে এসব উপনিবেশ ধরে রাখার মতো অনুকূল পরিস্থিতি না থাকায় সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল রাষ্ট্রগুলো তাদের অধীনস্থ উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও পুঁজি বিনিয়োগ, পুজি নিয়ন্ত্রণ, টেকনোলজী নিয়ন্ত্রণ, তথ্য প্রবাহের উপর সুনির্দিষ্ট চাপ, সামরিক ও বেসামরিক আমলা ও কর্মকর্তাদের মগজ ধোলাই প্রভৃতির মাধ্যমে দেশগুলোকে অধীনতামূলক ব্যবস্থায় আটকে রেখে নিয়ন্ত্রণ রাখার নীতি কার্যকর শুরু হয়। কিন্তু এ নীতি সবক্ষেত্রে সুফল আনেনি কেননা এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই অবাধ্য রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মক্কেল ও আজ্ঞাবাহী রাষ্ট্রগুলোও ক্ষেত্রবিশেষে অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত দেখাতে শুরু করে। এর পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব ও লুটের মালের ভাগাভাগি নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টিও লক্ষ্য করবার মতো। এমনকি এবার সাম্রাজ্যবাদের খেদমতগার জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরাককে নিরস্ত্র ও দুর্বল করে সেখানকার তেল ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আপোষে ভাগাভাগি করে খাওয়াই ছিল ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়ার মতো তথাকথিত যুদ্ধবিরোধী রাষ্ট্রগুলোর গোপন ইচ্ছা। কিন্তু সে ইচ্ছায় বাধ সাধে আমেরিকা এবং ভাগাভাগি না করে ইরাকে একক দখলদারিত্ব ও ভোগ সুখের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আজকে বিশ্বব্যাপী আমেরিকা এই একক অধিকার প্রতিষ্ঠার ভয়ানক ও বিপজ্জনক খেলায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট, পুঁজি বিকাশের ঐতিহাসিক ধারা ও পরম্পরায় স্থবিরতা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাষ্ট্র ও জনতার উত্থানের পথ ধরে

www.pathagar.com

এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড প্রতিরোধেরও সম্মুখীন। এটি সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্ত। আঘাতপ্রাপ্ত বাঘ যেমন করে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাম্রাজ্যবাদী সাঙ্গপাঙ্গরাও তাদের মরনকালীন সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শেষ কথা

অতি দক্ষ খেলোয়াড়ের যেমন করে ভুল হয়, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও এবার হিসাবে ভুল হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ প্রশাসকরা বুঝে উঠতে পারেননি শক্তির মদমত্তে যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় তার ক্ষণজীবী হওয়াটাই পরিণাম। আশার কথা ইতোমধ্যেই ইরাকে, আফগানিস্তানে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মার্কিন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা বিরোধী মানসিকতা ও ঘৃণা এখন তীব্র-থেকে তীব্রতর হচ্ছে। দেড়শ-দুশো বছর আগের মুসলিম বিশ্বের সাথে এখনকার মুসলিম বিশ্বের এটা একটা গুণগত তফাৎ। মুসলিম বিশ্বের শাসক নয়, জনগণ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও চরিত্র সম্বন্ধে এখন মোটামুটি ওয়াকিফহাল। সাম্রাজ্যবাদী হুমকি ও হামলার মুখে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদে বিকশিত ও শক্তিশালী হওয়া শুরু করেছে মুসলমানরা। এটি আজ দুনিয়া জুড়ে এক বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এক নব অভ্যুত্থানেরও শর্ত সৃষ্টি করছে। তাই আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ উচ্ছেদে বেশি সময় লাগবে না। মুসলিম বিশ্বের আমজনতার তীব্র প্রতিরোধের মুখে মার্কিন হানাদারী দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

এখনকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুসলিম দুনিয়ার ইসলামপন্থী ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গত শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক শক্তির একটা ভূমিকা আমরা দেখেছি। কিন্তু মতাদর্শিক ব্যর্থতা ও শূন্যতার প্রেক্ষাপটে তাদের ভূমিকা এখন নির্জীব হয়ে গেছে এবং তার জায়গা নিয়েছে ইসলাম। ইসলাম এখন বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত, অনুন্নত, পশ্চাদপদ মানুষের জন্য বৃহত্তর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক নবচেতনাবাহী ইসলামের অভ্যুত্থানের আভাষ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

www.pathagar.com

তথ্য সন্ত্রাসের যুগে ইসলাম

কথা শুরুর আগে

আমাদের পৃথিবীতে ইসলাম এখন একটি চ্যালেঞ্জ, কখনো কখনো রহস্য ও দুর্বোধ্যতার জালে আটকানো বিস্ময়কর বস্তু। এডওয়ার্ড সাঈদের মতে ইসলাম এখন একটি খবর এবং অবশ্যই পাশ্চাত্যের কাছে তা রীতিমত উৎকণ্ঠা ও আতংকের ইংগিতবহ। সমাজতন্ত্রের পতনের পর, আরো বিশেষ করে বললে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমাদের পৃথিবীর সামনে নতুন এক সময় উপস্থিত হয়েছে। এই রূপান্তরের পেছনের কার্যকারণসমূহ, যা আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদেরকে হানা দিচ্ছে, আমাদের জীবন ও অভিব্যক্তিকে তছনছ করে দিতে চাইছে। এর মধ্যে আমাদের কালের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কৌশল, যা মিডিয়ার দানব রূপে আবির্ভূত হয়েছে তা আমাদের দেখা পুরনো পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে বাধ্য করছে। বৈশ্বিক ভাবে চিন্তা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মিত্র ইউরোপের খ্রিস্টান দেশগুলো বর্তমান সময়ের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এই নিয়ন্ত্রণ তারা করছে অনেকটা মিডিয়ার ব্যবহার-অপব্যবহারের কৌশল পুঁজি করে।

লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে ইসলাম নিয়ে পাশ্চাত্য মিডিয়া যে স্টেরিওটাইপ তৈরি করে ফেলেছে, যা অবশ্যই পাশ্চাত্যের দীর্ঘ ঐতিহাসিক বর্ণবাদী অভিজ্ঞতার পরিণতি, তার ফল এখন নেতিবাচকভাবে ফলতে শুরু করেছে। পশ্চিমেতো বটেই, আমাদের মুসলিম ভাইয়েরাও অনেকে এই স্টেরিওটাইপে মজেছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ছড়ি ঘোরানোয় অশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। ইসলাম শান্তির ধর্ম-এই সভ্য-সুশীল চেহারাটা মিডিয়া পুরোদস্তুর বদলে ফেলেছে। ইসলাম বলতে এখন শুধু আকর্ষণীয় সুফী কবিতা কিংবা দৃষ্টি নন্দন স্থাপত্যই বোঝায় না, ইসলাম মানে রাস্তায় উত্তেজিত জনতা অথবা কোন তরুণ উদ্ধতভঙ্গিতে বিদেশী দূতাবাস আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে কিংবা নারী নিগ্রহের প্রতীক হিসেবেও উপস্থাপিত হচ্ছে। ইসলাম এখন নানা জনের কাছে নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হয়। এটা শুধু এখন ধর্মতত্ত্ব নয়, এটা একইসাথে বিতর্ক, মিডিয়া ইমেজ, দ্বন্দ্ব ও বিশিষ্ট চিন্তার নির্দেশকও বটে। এ আলোচনায় আমরা ইসলাম নিয়ে গড়ে ওঠা এই স্টেরিওটাইপটি অপসারণ করার চেষ্টা করবো, পারতপক্ষে ইসলামকে নিয়ে প্রচলিত ধারণাসমূহকে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ করবো। একই সাথে নতুন শতাব্দীতে ইসলামের ভূমিকা কেমন হবে তা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করবো।

www.pathagar.com

ইসলাম ও পাশ্চাত্য ঃ ফের মুখোমুখি

বিশ শতকের উত্থান পর্বে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ছিল উপনিবেশিত। মুসলিম রাজধানীসমূহ যেমন কায়রো, ত্রিপোলি, জাকার্তা কিংবা ঢাকা সবগুলোই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে। যেগুলো সরাসরি উপনিবেশিত ছিল না, কাবুল কিংবা তেহরান তাদের পক্ষেও ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আজকে এক শতাব্দী পর একুশ শতকের প্রদোষকালে পৃথিবী নামক গ্রহে প্রায় পঞ্চাশটি মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছে। এদের জনসংখ্যা আজ একশোকোটি অতিক্রম করেছে। এদের মধ্যে আবার এককোটির উপর মুসলমান এখন খোদ পশ্চিমেই বসবাস করছে। এসব দেশের কোথাও কোথাও এখন ইসলামী নীতি ও আদর্শ চেতনা অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন মুসলিম দেশের শাসনতন্ত্র পুরোপুরি ইসলামী নীতির আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। কোন কোনটির পতাকায় ইসলামের প্রতীক চাঁদ তারা সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন কোন এয়ারলাইন্স যেমন পি.আই.এ ও গালফ এয়ার-যাত্রা শুরুর পূর্বে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। এসব দেশের বড় বড় হোটেলগুলোতে এখন মুসলমানের কেবলা মক্কা শরীফের দিক চিহ্নিত থাকে যাতে ঈমানদার মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান পাশ্চাত্যের তুলনায় বড় কিছু না হলেও এখন একেবারে অনুপেক্ষণীয় নয়। পেট্রোডলার এখন বিশ্ব অর্থনীতিকে ঝাঁকি দিতে সক্ষম। পাকিস্তানের মত দেশ আনবিক অস্ত্রে শক্তিশালী।

বৈশ্বিক ভাবে চিন্তা করলে ইসলামের এই বিকাশশীল শক্তিশালী অবস্থান অমুসলিমদের মনে এই ধারণা দিতে শুরু করেছে ইসলাম এখন একটা হুমকি। দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই মুসলমানের সাথে অন্যধর্মের মানুষের সংঘাত এখন তীব্র হয়ে উঠছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানের সাথে হিন্দুর (পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান), মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানের সাথে ইহুদীর (আরব রাষ্ট্রসমূহ ও ইসরাইল), আফ্রিকায় মুসলমানের সাথে খ্রিস্টানদের (নাইজেরিয়া ও সুদান) সংঘাত এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কয়েকটি নমুনা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিপর্যয়ের পরেই কেবল স্পষ্ট হয়েছে এই সংঘাতের তীব্রতা কত ব্যাপক। বসনিয়ায় মুসলমানরা খ্রিস্টানদের মুখোমুখি হয়েছে। আজারবাইজানে আজেরী মুসলমানরা খ্রিস্টান আর্মেনীয়দের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। মোটকথা মুসলমানদের এখন একটা দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরছে। অন্যদিকে যেহেতু বৈশ্বিকভাবে চিন্তা করলে এই মুহূর্তে পশ্চিমের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব খুবই প্রবল, স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের মেনে নিতে হচ্ছে একটি দুর্বলতর ও নতজানু অবস্থান। ইসলামী পুনরুজ্জীবন এখন একটি বাস্তব সত্য, কিন্তু এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া এমন একটা অবস্থায় পৌঁছুতে পারেনি যা মুসলমানদের পাশ্চাত্যকে

www.pathagar.com

অস্বীকার করবার মতো সাহস যোগাতে পারে। সুতরাং একটি দুর্বল অবস্থানে থেকেই আজ মুসলমানদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ পাশ্চাত্যকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ফলে যা ফলাফল হবার তাই ঘটছে।

সমাজতান্ত্রিক অক্ষের বিপর্যয়ের পর পাশ্চাত্যের সামনে এখন তার প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে ইসলাম। ইসলামকে এখন কাবু করতে পারলেই পাশ্চাত্য মনে করছে দুনিয়া জুড়ে তার ক্ষমতা নিরংকুশ হবে। পাশ্চাত্য আজ সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধে এক সর্বমুখী যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। অনেকেই এই সংঘাতকে তাই ভিন্ন রকম দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করতে চাইছেন এবং বলছেন এটি হচ্ছে শেষ ক্রুসেড।

পাশ্চাত্য ও ইসলামের এই পারস্পরিক অসূয়ার অন্য একটি কারণ হচ্ছে আজকের পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক শক্তি যেহেতু পাশ্চাত্যই, সেহেতু এর অন্তর্গত রাজনৈতিক-দার্শনিক-নৈতিক বিবেচনা ও মূল্যবোধও ইসলাম বিশ্বাসীদের উপর আঘাত হানছে। পশ্চিমী সভ্যতার মর্মকেন্দ্র জুড়ে বিরাজ করছে গতি, নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস। অন্যদিকে ইসলাম বলছে প্রশান্তি, ধ্যান ও সরলতার কথা। দুটি সভ্যতার এই মৌলিক তফাৎটা খুব গভীরভাবে বোঝা চাই। ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থাটা খুবই মূল্যবান, অন্যদিকে আজকের পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে সেটি ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। শেষ কথা হচ্ছে ইসলাম অনুবর্তীরা অবশ্যই তৌহিদবাদী, এক আল্লাহতে বিশ্বাসী এমন একটা সময়ে যে যুগ কিনা ভোগবাদী, বস্তু পূজারী, কখনো কখনো দুর্জ্ঞেয়তা ও নাস্তির লালনকারী। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক বিরোধিতার এগুলো বাহ্য কারণ অবশ্যই। কিন্তু একালে ইসলামের মধ্যে বিরাজমান দুর্বলতাগুলোও পাশ্চাত্যকে ইসলাম বিশ্বাসীদের উপর হানা দিতে প্রলুব্ধ করছে। মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতা একটা বড় সমস্যা। এর নেতৃত্বের মধ্যে আছে দুরদৃষ্টির অভাব। এর চিন্তাবিদদের স্বচ্ছতা বলতে কিছু নেই। এর সুযোগ নেয় পশ্চিমের তাত্বিক বিশেষ করে সেখানকার মিডিয়া এবং ত্বরিতগতিতে মুসলিম দেশ কিংবা সংগঠনগুলোকে কোন একটি নেতিবাচক ঘটনার সাথে জড়িয়ে ছাপ মেরে দেয়। তারা মুসলিম দেশগুলোকে বলে 'arc of crisis' অথবা 'an Islamic crescent of crisis'। একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকেই তারা generalize করে ফেলে এবং পুরো একটি সভ্যতাকে তারা দায়ী করে। পশ্চিমী মিডিয়ার বৈরিতা ও মুসলিম চরিত্র হনন আজ একটি বদ খাসলতে পরিণত হয়েছে।

ইসলাম ঃ আজকের প্রেক্ষাপট

কেউ যদি হাফিজ, সাদী, রুমী, ইকবালের কবিতার গভীরে প্রবেশ করেন অথবা আল বেরুণী, ইবনে খালদুন ও ইবনে সিনার মতো সমাজতাত্বিক ও দার্শনিকের

www.pathagar.com

লেখালেখি ও দর্শনতত্ত্ব নিয়ে নাড়া চাড়া করেন কিংবা মোঘল ও মুরীয় স্পেনের নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী ও মেজাজের কথা ভাবেন তাহলে তারা ইসলামী সংস্কৃতির বৈদগ্ধ্য ও বিচিত্রতার দিকটি কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারবেন।

অন্যদিকে এ কালে পশ্চিমের মিডিয়া ইমেজের কারণে ইসলামের যে ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তা একান্তই হতাশাব্যাঞ্জক। মুসলিম রাষ্ট্র মানেই এখন দুর্নীতিবাজ, নীতিহীন স্বৈরশাসকের আস্তানা, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, আইন ও সুশাসনের ব্যাপক অবনতি, সিভিল সোসাইটির বেহাল অবস্থা, ভগ্নপ্রায় সামাজিক স্থিরতা ও বন্ধন, এর সাথে নারী নিগ্রহতো থাকছেই। এই বিতর্ক ও কুয়াশার তলা থেকে ইসলামের প্রকৃত অবস্থানটা আজ আবিষ্কার করা চাই। ইসলাম যখন পৃথিবীতে আসে তখন তার সাথে ছিল এক বৈশ্বিক আদর্শবাদ ও বিপ্লবী চেতনা। এই চেতনা ছিল তৌহীদে বিশ্বাস, একই সাথে পৃথিবীতে এই চেতনাকে সমুন্নত করা। এই ভাবে আদল ও ইহসান-ন্যায় ও মমত্বের ভিত্তিতে একটা মৌলনীতি মানবজীবনকে নিরন্তর ঘিরে রাখবে এই আশ্বাস ইসলাম আমাদের দিয়েছে। আজকে গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয় মুসলমানরা এর ঠিক উল্টোটাই চর্চা করছে। তারা বৃহতের বদলে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ চিন্তায় আবদ্ধ। কেউ কেউ ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের আনুগত্যে জড়িয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতে প্রবৃত্ত, আর কেউ কেউ গোত্রীয় পরিচয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত। যাদের ছিল একটা বৈশ্বিক পরিচয় তারা আজ ভাষিক ও গোত্রীয় পরিচয়ের ক্ষুদ্র সীমানায় আটকে পড়েছে। এটি হচ্ছে আজকের মুসলমানদের প্যারাডক্স। ইনসাফ ও শৃংখলা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। অথচ মুসলিম সমাজের ভেতরে আজও চলছে রক্তক্ষরণ, অন্তঃযুদ্ধ ও পারস্পরিক লড়াই। এটি অবশ্যই গোত্রীয় ও উপজাতীয় চরিত্র। এর পক্ষে ইসলামের কোন অনুমোদন নেই। মুসলিম সমাজের অনেকাংশেই আজ আইন-শৃংখলা বলতে কিছু নেই। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা একরকম লুপ্ত হয়েছে। এই ভাবে মুসলিম সমাজ কুরআন ও রসুলের নীতি ও শিক্ষা ভিত্তিক ইসলামী আদর্শের ধ্যান ধারণা থেকে দুরে সরে এসেছে। এটি তাদেরকে মোটেই সাহায্য করেনি, উল্টো তাদের সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। এটা সত্য মুসলিম সমাজ ও ইসলাম হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক, কিন্তু বাস্তবে অনেক মুসলিমই ইসলামী নীতি থেকে আজ সরে এসেছেন। ফলে মুসলিম সমাজের অন্তর্গত ডায়নামিক্স-চলমানতা হোচট খেয়ে পড়েছে। আর এ কারণেই একজন বিচ্যুত বা হারিয়ে যাওয়া মুসলিমকে দেখেই আজ ইসলামের চরিত্র বিবেচনা করা হচ্ছে। ধরা যাক একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করে অথবা একজন রাজনীতিবিদ দুর্নীতিবাজ কিংবা একজন আলেম চরিত্রের দিক দিয়ে মোনাফেক। কিন্তু তাদের এই কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে এই বিবেচনা নিরেট মূর্খতা। মুসলিম

www.pathagar.com

হওয়াই শুদ্ধচারিতার গ্যারান্টি নয়। এ জন্যই কুরআন বলছে-প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কর্মফলের জন্য দায়ী। মুসলমান যদি ইসলামী নীতির সাথে ঐকমত্য পোষণ না করে তাহলে তাদের মুসলমান বলা যাবে কি?

মুসলমানের এই দুর্বলতা ও পশ্চাদপসরণকে পুঁজি করে পাশ্চাত্য আজ মুসলিম দুনিয়ার দিকে হাত বাড়িয়েছে। সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সবদিক দিয়েই ইসলাম আজ পশ্চিমের এক নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার মুখোমুখি হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না মুসলিম দুনিয়া আজ এক স্থবিরতা ও জড়তার পাকে আটকে গেছে। গত শতকে ইকবাল বা জামালুদ্দীন আফগানীর মত মনীষা ও চিন্তানায়করা মুসলিম দুনিয়ার যে সব সমস্যার কথা বলেছিলেন তার অনেক কিছুই আজও বাস্তবে রয়ে গেছে। যে সব প্রশ্ন তারা তুলেছিলেন, যে সব দ্বন্দ্ব ও সমস্যাকে তারা চিহ্নিত করেছিলেন, মুসলিম সমাজকে ঘিরে যে সীমারেখা তারা আঁকতে চেয়েছিলেন তার প্রতিধ্বনি বলা চলে আজও আমরা শুনছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও রূপান্তর হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী পুনর্জাগরণ, পাশ্চাত্যের হুমকি, বস্তুতান্ত্রিকতার বিপদ প্রভৃতি আজও বিতর্কের মধ্যমণি হয়ে আছে। তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া সর্বত্রই এই বিতর্ক নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই বিতর্কের নানা দিক নিয়ে এখন কিছু কিছু আলোচনা করবো।

গণতন্ত্র

পশ্চিমী মিডিয়া মুসলিম সমাজের যে দুর্বলতার দিকটি নিয়ে বেশি হৈ চৈ করে তা হচ্ছে এখানকার গণতন্ত্রহীনতা। পশ্চিমী মিডিয়ার কাছে এখানকার শাসকরা স্বৈরাচারী, ক্ষমতালিপ্সু, ভোগবাদী। এদেরকে নিয়ে পশ্চিমের ব্যাঙ্গোক্তির শেষ নেই। এর মধ্যে আবার কোন কোন মুসলিম রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মবিশারদরা যখন বলেন ইসলামে আসলে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই তখন তারা কিন্তু তাদের এই বক্তব্য দিয়ে পৃথিবীকে এই ধারণা দেন ইসলাম আসলে স্বৈরাচারী ও সামরিক শাসকদের ধর্ম।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই? ইসলামের ভেতর যে রকম সাম্যবাদের কথা বলা হয়েছে, যে রকমভাবে বাস্তব অর্থেই গণতান্ত্রিকতা চর্চার কথা এসেছে তাকি অন্য কোন ধর্মে আজতক সম্ভব হয়েছে? ইসলাম ধর্ম হিসাবে সরল ও নিরাপোষ। কোন বর্ণপ্রথা নেই, কোন পুরোহিততন্ত্র নেই, ধনী ও দরিদ্রে তফাৎ নেই। সালাতের সময় এই সাম্যের ছবি বাস্তব অর্থেই সম্ভব হয়ে ওঠে যখন মুসলমানরা তাদের সামাজিক অবস্থান যাই থাকুক না কেন পাশাপাশি দাঁড়ায়। ইসলামের নবীতো বহুরকমভাবে এ কথাটার উপরই জোর দিয়েছেন– নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, আরব-অনারব সবাই আল্লাহর সামনে সমান। যে ধর্মের মূলনীতি এমনি

www.pathagar.com

কঠোর সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার অনুসারীরা গণতন্ত্র চর্চার অনুপযোগী এ নিছক সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণা ছাড়া আর কি?

তবে এটা সত্য মুসলিম দেশগুলোতে যে প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের চর্চা চলছে তাতে অবশ্যই ইসলামের আপত্তি থাকবার কথা।

মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা খুব বেশি সফল হয়নি। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও বংশপ্রীতি এখানকার রাজনৈতিক নেতাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরে গণতন্ত্রের লেবেল ঠিকই আছে ভিতরে এক ধরনের গোত্রতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের আগ্রাসী চেহারা মুখিয়ে থাকে। পাকিস্তানের মতো দেশে গণতন্ত্র মানে কোন কবিলার সর্দার অথবা সামন্তপ্রভু নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসা। বাংলাদেশে গণতন্ত্র মানে কোন দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, ব্যাংকডাকাত কিংবা ঋণখেলাফীর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া। মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র মানে কোন নিষ্ঠুর স্বৈরাচারীর আমৃত্যু বারবার নির্বাচিত হওয়া। সিরিয়া কিংবা ইজিপ্টের কথা ভাবুন। এমনকি গণতন্ত্র পশ্চিমেও কোন শুদ্ধাচারী তাপস নয়। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র একটি ব্যক্তিকেই সব ক্ষমতা দেয়। তিনি ভালো মন্দ যাই হন মানবজাতিকে একাই ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বুশের চেয়ে উত্তম উদাহরণ কে হতে পারে? গণতন্ত্রের ইউরোপীয় সংস্করণ হচ্ছে কোন সংখ্যালঘু দলও দীর্ঘদিন সংখ্যাগুরুকে শাসনের অধিকার পেয়ে বসতে পারে। বৃটেনের টোরী পার্টির কথা বলা যেতে পারে। এরকম অব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র মাথা তুলতে পারে কিনা তা অবশ্য বিচার্য বিষয়। গণতন্ত্রের এই বিবর্ণ ও জরাগ্রস্থ চেহারার মধ্যে আবার পশ্চিমের গণতন্ত্র নিয়ে লুকোচুরি খেলাও সমানে চলছে। পশ্চিমের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, মোনাফেকী ও শঠ চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে আল জেরিয়ার ক্ষেত্রে। তৃতীয় বিশ্বে এক সময় আলজেরিয়ার একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল। ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আলজেরীয়দের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও ত্যাগের কথা অনেকেই জানেন। সে সময় আলজেরীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। স্বাধীনতা লাভের পর আলজেরিয়া গণতন্ত্র ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতো আলজেরিয়া পরবর্তীকালে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার মধ্যে ডুবে যায়। পৃথিবীও আলজেরিয়াকে ভুলে যায়।

গত শতকের নব্বইয়ের দশকে সেই আলজেরিয়া আবার খবরের কাগজে উঠে আসে। আলজেরিয়ায় ইসলামী পুনর্জাগরণের একটা সম্ভাবনা আভাসিত হয়ে ওঠে। পশ্চিমী মিডিয়া সতর্ক হয় ঃ আলজেরিয়া বোধ হয় আর একটি ইরান হতে চলেছে, আর একজন ইমাম খোমেনীর কণ্ঠস্বর তারা শুনতে পায়। সুতরাং পশ্চিমের শঠ গণতন্ত্রীরা আলজেরিয়ার গণতন্ত্রায়নের এক মুহূর্ত সুযোগ দেয়নি। পাশ্চাত্যের সরাসরি হস্তক্ষেপে সেখানকার সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত

www.pathagar.com

ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। তারপরের ঘটনা সবার জানা। সামরিক বাহিনীর ট্যাংক রাস্তায় নেমে আসে। পশ্চিমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। অত্যাচার, নিবর্তন, গ্রেফতার এমনকি মসজিদের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড পশ্চিমের আনন্দকে ম্লান করতে পারেনি। এখানে প্রধান বিষয় ছিল আরেকটি ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের মৃত্যুতে পশ্চিমের চোখে তাই অশ্রু দেখা যায়নি।

পশ্চিমের এই মোনাফেকীকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? ঠিক এরকম সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের ঘটনা যদি পাকিস্তানে ঘটতো যা সেখানে প্রায়ই হয় তাহলে পশ্চিমী মিডিয়ার প্রচারণার ধরনই কিন্তু পাল্টে যেতো। তারা সামরিক শাসনের অত্যাচারের দিকটি বিরাট করে তুলে ধরতো। আর সাথে থাকতো সেই পুরনো যুক্তিঃ মুসলিম সমাজে গণতন্ত্রের মৃত্যু ও মুসলমানদের স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার প্রতি এক অন্তর্গত দুর্বলতা।

আলজেরিয়ায় যখন ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট নির্বাচনে জিতে যায় তখন পশ্চিমী মিডিয়ার প্রচারণা লক্ষ্য করুন; খুবই উদ্দেশ্যভেদী, ষড়যন্ত্রমূলক। মিডিয়া আলজেরিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে আতংকিত হয়ে ওঠে। তারা বলতে থাকে তাহলে বারগুলোর কি হবে? মদ কি নিষিদ্ধ হবে? ডিসকোগুলোর ভবিষ্যৎইবা কি? ফরাসীরা সেই ইমিগ্রেশন কার্ড নিয়েই আবার খেলতে শুরু করে এবং মৌলবাদীদের নিয়ে এক কৃত্রিম ভীতি সৃষ্টি করে সীমান্ত বন্ধ করার পায়তারা শুরু করে।

তাহলে এ প্রশ্ন ওঠা এখন স্বাভাবিক মুসলিম দুনিয়ায় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পাক পশ্চিমীরা প্রকৃতই কি সেটা পছন্দ করে? আসল কথা হচ্ছে পশ্চিমীরা গণতন্ত্র কার্ড নিয়ে খেলছে। মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা জিইয়ে রাখা এবং গণতন্ত্র কার্ড ব্যবহার করে মুসলিম বিশ্বকে নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করাই সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য। মুসলিম নেতৃত্ব সে সম্বন্ধে কতটুকু সজাগ?

দারিদ্র্য, দুর্নীতি এবং কমিউনিজম

গরীব আর অসহায় মানুষের দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। মজলুম আর নিপীড়িতের পাশে দাঁড়ানো ইসলামী নৈতিকতার সুস্পষ্ট অংগীকার। এর পরেও মুসলিম দেশগুলোতে ধনী দরিদ্রের ভেদ-বৈষম্য বাড়ছে। কায়রো, করাচী কিংবা ঢাকা প্রত্যেক জায়গায় একই চিত্র। যদি কোন পশ্চিমী পর্যটক কায়রোর রেমেসিস হিল্টনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নীল নদের চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেরায়, তাতে মিসরীয় সমাজের এক রকমের ছবি ফুটে উঠবে। একই রকম দৃশ্য করাচী কিংবা ঢাকায়ও বিরল নয়। প্রমোদতরী, পর্যটক, ডিস্কো ক্লাব, বার ও রেসকোর্সের সমাহারে গড়ে ওঠা গাজিরা দ্বীপ, আকাশ চুম্বী দালান কোঠা এসবই

www.pathagar.com

মিসরীয় আধুনিকতার প্রতীক, করাচীর ক্লিফটন বীচ এলাকা কিংবা ঢাকার গুলশান-বনানী একই রকম আভিজাত্যের ভার বহন করে চলেছে। যে কোন পশ্চিমী পর্যটক এখানে বসে ধারণা করতে পারে, এখানে যারা বাস করে তারা বুঝি পশ্চিমের সব সুযোগ সুবিধাই ভোগ করছে। এই পর্যটকই যদি বাজারে আসে, সাধারণ জনগণের কাছে এসে দাঁড়ায়, ধরা যাক ঢাকার গুলশান বনানী ছেড়ে নিম্নাঞ্চলগুলোতে পা দেয় তাহলে তার জন্য দারিদ্র্যের মর্মস্পর্শিতা দেখে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। এখানে সামাজিক সেবা কার্যক্রমগুলো প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছে। বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, টেলিফোন ব্যবস্থা অপ্রতুল। কেন এই বৈষম্য? সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আদৌ কোন পারস্পরিক সংযোগ-সহযোগিতা আছে? এই বৈষম্য কতকাল স্থায়ী হবে? এগুলো এ কালের জরুরি প্রশ্ন এবং মুসলিম শাসকশ্রেণীকে এর জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

এই অসাম্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, কেন না ইসলাম সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা বলে। ক্ষুধার্ত-পীড়িতকে অন্ন দেয়া ইসলামের বিধান। রসূল (স.) বলেছেন প্রতিবেশীকে অভূক্ত রেখে নিজে ভূরিভোজন করা ইসলামের নিয়ম নয়। সুতরাং যে অসাম্য আমরা দেখছি তা ইসলামের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটি হচ্ছে অস্থির, অসংলগ্ন, অব্যবস্থচিত্ত, উত্তর ঔপনিবেশিক-উত্তর আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী লোভ ও রিরংসা এর জন্য দায়ী। পুঁজিবাদীদের স্বার্থপরতা ও একচোখা নীতি এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

যদি পুঁজিবাদ ব্যর্থ হয়েই থাকে তাহলে কি কমিউনিজম আসার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে? আজকের মুসলিম সমাজের সমস্যা সমাধানে কমিউনিজম কি যুৎসই উত্তর হতে পারে? আগে বোঝা দরকার কমিউনিজম সম্বন্ধে ইসলামের প্রতিক্রিয়া কি?

এটা সরাসরি ইসলামের তৌহীদের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। ধর্মগত বিষয় ছাড়াও কমিউনিজমে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পুলিশী কাঠামো মুসলমানদের অপ্রীতির কারণ। ইসলামের মানবিকতা ও সম্প্রীতির ধারণার সাথে কমিউনিস্টরা যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, পারজেস, শক্তি প্রয়োগে পুনর্বাসন ও স্থানান্তর (স্ট্যালিন কর্তৃক চেচেনদের জোর করে সাইবেরিয়া প্রেরণ এ প্রসঙ্গে বড় নজীর হতে পারে), ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিলয়, তাদের গুপ্তপুলিশ, নির্যাতন কেন্দ্র (torture cell), এ সব বিবেচনায় কমিউনিস্টরা মুসলমানদের কাছে রীতিমত বিভীষিকা।

এর মানে এই নয় মুসলমানদের কেউ কেউ কমিউনিস্ট চিন্তা ভাবনায় প্রানিত হননি। গত শতাব্দীতে কোন কোন মুসলিম চিন্তাবিদ পুঁজিবাদী আমেরিকার বিকল্প হিসেবে সরাসরি কমিউনিজমের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এর মধ্যে

www.pathagar.com

পাকিস্তানের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও তুরস্কের নাজিম হিকমতের নাম করা যায়। মোটের উপর মুসলিম দুনিয়ায় কমিউনিজম হানা দিলেও সামাজিক জীবনের গভীরে খুব বেশি প্রবেশ করতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কমিউনিস্টদের অবস্থান আরও শিথিল হয়ে যায়। মুসলিম দুনিয়ায় যে সব কমিউনিস্ট নেতা আমরা দেখেছি তাদের রেকর্ড খুব প্রীতিকর নয়। এরা স্ট্যালিনবাদ প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে পুরো দেশটাকে একটা নৈরাজ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। ইরাকে, সিরিয়ায়, নাসেরের মিসরে কমিউনিজম বলতে বুঝাতো বীর পূজা এবং নেতার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য। বহুল আলোচিত সাদ্দাম হোসেন নিজেই ছিলেন স্ট্যালিনবাদী এবং তার চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। এখানে কমিউনিজম বলতে বুঝাতো গুপ্ত পুলিশ, নির্যাতন কেন্দ্র, ইসলামী ঐতিহ্য ও গৌরবের বিলয় সাধন। কমিউনিজমের নামে আমরা ইরাকের হালাবজা ও সিরিয়ার হামায় যে গণহত্যা ও মানব জবাই দেখেছি তা ভিয়েতনামে মার্কিনীদের মাইলাই হত্যাকাণ্ডের চেয়ে কম কিসে? ইজিপ্টের নাসের সমাজতন্ত্রের সেবা করার জন্য সাইয়েদ কুতুবের মতো আলেম ও বুদ্ধিজীবীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন।

মুসলিম দুনিয়ায় তাই কমিউনিজম কাজ করেনি, পুঁজিবাদ ব্যর্থ হওয়ার পথে। এই মতাদর্শিক শূন্যতার সুযোগে এসব দেশে এক ধরনের গোত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র পল্লবিত হয়েছে। যার অর্থ স্বজনপ্রীতি ও বিরামহীন দুর্নীতি। এটিও আজ পশ্চিমী মিডিয়ার সমালোচনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সব গোষ্ঠীতন্ত্র এখানকার রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। মুসলিম দেশগুলোর বাদশাহ কিংবা সমাজতন্ত্রী স্বৈরশাসক অথবা সামরিক শাসক যেই হন এদের অনেকেই উপজাতীয় নেতার মতো কাজকর্ম করেন। দেশের বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোতে মেধার বিচারে নয়, আত্মীয়তার জোরে নিয়োগ হয়। দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যবহৃত হয়। আধুনিকতা, গণতন্ত্র কোন কিছুই এখানে কাজ করছে না।

মুসলিম দুনিয়ার এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামের আবেদন তাই গ্রহণ যোগ্যতা পাচ্ছে। আজ যে মৌলবাদ জ্বরে পশ্চিমীরা কাঁপছে তার কারণ পুরো আলমে ইসলামী জুড়ে এই মুসলিম জাগরণ শুরু হয়েছে। এটা বিনা কারণে একদিনে সম্ভব হয়নি। মতাদর্শিক শূন্যতা, আধুনিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা, জনগণের বাস্তব সমস্যার সমাধানে অনীহা এসব কিছুই মিলে সাধারণ জণগনকে আজ ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মুসলিম শাসক ঃ সেকাল ও একাল

এ কালে আমরা যে সব মুসলিম শাসক ও নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত তাদের কেউই, দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারছেন না। এদের অনেকের বিরুদ্ধেই জনগণের ক্ষোভ চূড়ান্ত। গণআন্দোলনের মুখে এদের অনেকেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, অনেকে সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা অন্য কোন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছেন। কেন এরকম হচ্ছে? মুসলিম দেশগুলোতে কেন এই রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা দিনে দিনে গভীর হয়ে উঠছে। আগের দিনের মুসলিম শাসকদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মেধা ছিল প্রশ্নাতীত। তাহলে আজকে অসুবিধাটা হচ্ছে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে আজকের মুসলমানদের জীবন ভাবনা বিশেষত আধুনিক পৃথিবী নিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তা বুঝতে সাহায্য করবে।

আগের দিনের মুসলমান শাসকরা ছিলেন কার্যতই মুসলিম। জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা-সংঘটনায় মুসলিম হিসেবেই তারা প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। কুরআন, হাদীস, শরীয়াহ, রসূল ও তার সাহাবীদের আদর্শ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ছিল। অন্তত তারা এতটুকু বিশ্বাস করতেন কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহতায়ালা এবং তারা শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে জিম্মাদারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন। তাই সেকালের বাদশাহ কিংবা সুলতানকেও প্রায়শ কোন অন্যায় সংঘটনের জন্য সতর্ক থাকতে হতো। পাছে কোন আলেম এমনকি সাধারণ জনগণের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। আমাদের দেশে 'কাজীর বিচার' বলে একটা কথা আছে। এ কথাটার উদ্ভব এমনিতেই হয়নি। সেকালের শাসন কর্তৃপক্ষকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবার জন্য কতটুকু তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হতো এ তার নজীর। এর বিপরীতে আজকের মুসলিম শাসকরা ক্ষমতায় আসেন আধুনিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর ভিতর দিয়ে। অনেকেই ক্ষমতায় আসেন শুধু এই কারণে যে, কোন এক সময়ে তারা দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সুবাদে তারা সামরিক আইন জারী করেন এবং রাতারাতি দেশের প্রধান নির্বাহী বনে যান। অন্যরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে এলেও আদপে তারা স্বৈরাচারী, শুধু পদ্ধতিকে ব্যবহার করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই তাদের লক্ষ্য। তবে এর মানে এই নয় সেকালের শাসকরা একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন, তাদের বিরোধিতাকারীদের তারা একেবারেই দমন করতে চাননি। সেকালের কোন কোন শাসক বহু প্রসিদ্ধ আলেম ও ইমামকে কারাবন্দী করেছেন, তাদেরকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতও করিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব আলেমরা জনগণকে সাথে নিয়ে এই সব দুঃশাসকদের উপর যে প্রচণ্ড নৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছেন, তাদের শাসন করার অধিকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ক্ষমতার অবস্থানকে যে রকমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তার নজীর একালে একেবারেই অপ্রতুল। এ প্রসঙ্গে মোজাদ্দেদ আলফেসানীর দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি।

www.pathagar.com

এটা সত্য শাসন কর্তৃপক্ষের সমালোচনা কোন নতুন ঘটনা নয়। শুধু পার্থক্য এই সেকালে শাসকের শাসন করার নৈতিক অধিকার আছে কিনা সেটা বিবেচনা করা হতো। এ কালে বিরোধিতার ধরনে নৈতিক প্রশ্ন উঠছে না। এখন বিরোধিতার জন্য দেখা হচ্ছে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের অনুপস্থিতি কিংবা দুর্বল অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্র নীতির মতো বিষয়গুলো। তাই আজকাল ইসলামপন্থী দলগুলোর দু'একজন বিরোধী নেতা ছাড়া কেউই এই যুক্তিতে কোন মুসলিম শাসকের বিরোধিতা করতে আগ্রহী হবেন না এই বলে যে তার শাসন যথেষ্ট ইসলামিক নয়।

বিরোধিতার ভাষা ও তার অন্তর্গত তাৎপর্যের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। একই কারণে মুসলিম শাসকরাও আর দশজন শাসকের মতোই রাষ্ট্রের সব সম্পদ ও শক্তিকে ব্যবহার করে এসব বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া দেখান। একই ভাবে যারা রাষ্ট্রের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চান, রাষ্ট্রও তার নিবর্তনের আধুনিক সব যন্ত্র ও পদ্ধতি নিয়ে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। যেহেতু নৈতিক বিবেচনা থাকছে না সেহেতু রাষ্ট্রের নিবর্তনমূলক আচরণে আইনগত অবৈধতার প্রশ্নটা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

ইসলামী আইন

ইসলামী আইন ও তার প্রয়োগযোগ্যতা আধুনিককালে একটা বড় ধরনের বিতর্কের বিষয়। ইসলামের শাস্তির প্রক্রিয়াগুলো পশ্চিমের দৃষ্টিতে বড়ই নিষ্ঠুর। পশ্চিমী মিডিয়া চুরির কারণে হাতকাটার দৃশ্য প্রচার করে এটাই বলতে চায় এরকম শাস্তি যেমন বর্বরতার প্রতীক তেমনি একটি বর্বর সমাজেরও ছবি। ইসলামী আইনকে দেখা হয় সবরকমের গণতন্ত্র ও আধুনিকতার সাথে বেমানান বস্তু হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা জরুরি। ইসলামের শাস্তির পদ্ধতিগুলো দুটো নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত ইসলামী আইনে কোন অপরাধের জন্য শাস্তির চূড়ান্ত মাত্রা নির্ধারণ করা হয় যাতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ চুরি করলে শাস্তি হিসেবে হাত কাটার যে বিধান রয়েছে তা অপরাধ দমনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দেয়। এ কারণেই আজও সৌদী আরবে নামাজের সময় চুরির বিন্দুমাত্র আশংকা ছাড়াই নিশ্চিন্তে সবাই দোকান খুলে রেখে মসজিদে চলে যায় যা দুনিয়ার অন্যত্র বাস্তবিক অর্থেই অসম্ভব। সেখানে চুরি করতে যাওয়া একটা বড় রকমের বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। এই অবস্থার সাথে প্রাযুক্তিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়া সমাজগুলোর তুলনাও চলে না। সেখানে নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত চৌকশ ও কৌশলী পুলিশ বাহিনীও চুরি ডাকাতি আর ধর্ষণ বন্ধ করতে পারছে না কারণ সেখানকার আইন বা শাস্তির ব্যবস্থাকে কেউ তোয়াক্কা করে না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত একবার শাস্তির চূড়ান্ত মাত্রা নির্ধারিত হয়ে গেলে ইসলামের দয়া, ক্ষমা, সহমর্মিতার নীতিগুলো সততই সক্রিয় হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং কোন অসাধারণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কিংবা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন খুনীর অপরাধকে ক্ষমা করে দেয় তখন ইসলামী আইন সেটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। অন্যদিকে পশ্চিমে যে প্রক্রিয়ায় হোক আইনকে কার্যকরী করা চাই এবং প্রায়শই একটির বদলে দুটি মৃত্যুকেই স্বাগত জানানো হয়। আবার ইসলামী শাস্তির ব্যবস্থাগুলো যেমন পশ্চিমে বর্বরতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে তেমনি বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া মুসলমানদের কাছে বর্বর ও অনাধুনিক মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীর যেমন উঁচু নৈতিক মান থাকা চাই, তেমনি বিচারকেরও নৈতিক মানদণ্ড তর্কাতীত হওয়া সাপেক্ষ। ইসলামী বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বকে অপমান নয়, একটি নিরাপদ সমাজ সৃষ্টির পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা। এ কারণেই ইসলামের খলিফা ও সুলতানদের দেখা গেছে প্রয়োজনীয় দাফতরিক কাজের শেষে কিংবা গভীর রাতে ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে যাতে সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা পায়। পশ্চিমে আইনের টেক্সট ও তার বয়ান বিশ্লেষণ নিয়ে মাতামাতি হয় বেশি, কিন্তু অভিযুক্ত কিংবা পেছনের সামাজিক প্রক্রিয়া মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারে না। এমনও দেখা যায় কোন ধর্ষিতার অভিযোগ আদালতে দিনের পর দিন ঝুলছে, দুর্নীতিবাজ পুলিশ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের তদন্ত কাজে দীর্ঘসুত্রিতা ধর্ষিতার বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে এবং তার উপর যে মানসিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয় তাতে প্রায় তার অব্যবস্থচিত্ত হয়ে ওঠার উপক্রম হয়। এ জন্যই বোধ হয় পশ্চিমে এই প্রবচনটির জন্মঃ Justice delayed, Justice denied. পশ্চিমের আইন এখনও অনেক মুসলিম দেশে (বাংলাদেশ সহ) ক্রিয়াশীল। এর কার্যোপযোগিতা, আমরা যারা ভুক্তভোগী এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

অন্যদিকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিচার প্রক্রিয়া মূলতবী কিংবা বাতিল হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বিচার প্রার্থীরা দ্রুত বিচার পাবেন ইসলামের এই নীতি যে কোন সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূবশর্ত। একথা আজকাল পাশ্চাত্য বন্ধুরাও অস্বীকার করতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচিত হওয়া দরকার। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ফতওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফতওয়ার মানে হচ্ছে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় কোন একটি সুনির্দিষ্ট মতামত দেয়া। ইসলামী আইনে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল ফতওয়া দেয়ার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু এটা মনে করার কারণ নেই ফতওয়া মানেই আইন। ফতওয়াকে আইনসিদ্ধ করতে হলে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল, আদালতের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও মজলিস-ই-শুরার কার্যক্রমের ভিতর দিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

ফতওয়া শব্দটির রাজনৈতিক তাৎপর্য পাশ্চাত্যে-গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে। ইমাম খোমেনী যখন সালমান রুশদীর Satanic Verses কে কেন্দ্র করে তার বিখ্যাত ফতওয়া দেন তখন পাশ্চাত্য মিডিয়া ফতওয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা ও অশ্রাব্য খিস্তি খেউড় শুরু করে। এর দেখাদেখি আমাদের দেশের পাশ্চাত্যপন্থী সেকুলার মতাদর্শের লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা ফতওয়া নিয়ে হৈ চৈ শুরু করেন। সে ধারা আজও চলছে এবং বাধাহীনভাবেই এরা ইসলামের বিরুদ্ধে রটনা করে চলেছে।

মুসলিম পরিবার

পরিবার হচ্ছে মুসলিম সমাজের প্রধান শক্তি। অথচ এই মুসলিম পরিবারকে পাশ্চাত্যে দেখা হয় একান্ত সেকেলে, নিষ্ঠুরতা ও প্রগতির বিরোধী হিসেবে। মুসলিম পরিবার নিয়ে পাশ্চাত্যের এই নেতিবাচক ধারণা গড়ে উঠেছে পরস্পরবিরোধী জীবন ভাবনা ও বিশ্বাসের বোধ থেকে। আসলে মুসলিম পরিবারগুলো হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের একটি মডেল। ইসলাম মনে করে এই বিশ্ব যেমন করে একটি নিয়ম ও শৃংখলার মধ্যে চালিত হচ্ছে, তেমনি প্রত্যেকটি সমাজ ও পরিবারও একটি নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত। এইভাবে সমাজ ও পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে। বোঝা দরকার প্রত্যেক মানুষই একক, বিশিষ্ট ও ভিন্নতা সম্পন্ন। এই বিভিন্নতা আছে বলেই পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করা সম্ভব। ইসলাম এই সৌহার্দ্য সৃষ্টির উপরই গুরুত্বারোপ করে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ভাল ব্যবহারের উপর কুরআন ও হাদীসে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এটাতো সত্য ভাল ব্যবহার পরিবারের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। পিতা, মাতা, সন্তান, মুরব্বী প্রত্যেকেরই ইতিবাচক ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। এই ভাল ব্যবহারের ধারণা আমরা পেয়েছি ইসলামের নৈতিকতা থেকে। আমাদের রসূল (স.) যেমন আদর্শ পুত্র ছিলেন তেমনি পরবর্তীকালে তিনি আদর্শ স্বামী ও পিতা হন। তার পরিবারের নারীরা-যেমন খদিজা ও ফাতিমা হচ্ছেন মুসলিম নারীর আদর্শতুল্য।

মুসলমানের জন্য পরিবার হচ্ছে তাই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের গভীরে এর স্থান। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে কুরআনের আইনের এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে পরিবারকেন্দ্রিক। এর লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটা প্রবণতা ও আচরণ (attitudes and behaviour) গড়ে তোলা যা ইসলাম একান্তভাবেই সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং এই প্রবণতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রসারিত হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো এখনও মুসলিম পরিবারগুলো হচ্ছে একান্নবর্তী পরিবার। সাধারণত দুই, তিন বা ততোধিক প্রজন্ম একই পারিবারিক বৃত্তে অবস্থান করে।

www.pathagar.com

ইসলাম সাম্যের ও মানবাধিকারের ধর্ম একথা আমরা জানি। কুরআনে এই সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ভাল মুসলমান হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বার বার নারী ও পুরুষ উভয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে 'যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না' (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১২৪)। অন্যত্র একই ভাবে নারী-পুরুষ উভয়কে সমগুরুত্বের সাথে বারবার আহবান করা হয়েছে। যেমন 'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৫)।

এমনকি তালাকের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলোতে ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমভাবে তালাক দেবার অধিকার দিয়েছে। প্রথম একজন মুসলিম নারী রসুলের অনুমোদনে অযোগ্যতার কারণে স্বামীকে তালাক দিয়েছিলেন যা সেকালের আরবীয় সমাজে অকল্পনীয় ছিল। এটি সেকালের নারীর সামাজিক মর্যাদা বহুগুন বৃদ্ধি করেছিল। এভাবে পরিবারের নারীদের প্রতি পুরুষদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা কুরআনে এসেছে। স্ত্রীকে পালন করার দায়িত্ব স্বামীর, তা স্ত্রীর যত কিছুই থাকুক। এই নিয়ম ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে অসমতার যে অভিযোগ পশ্চিমের বুদ্ধিজীবী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত আমাদের এখানকার কেউ কেউ করে থাকেন, তার সমুচিত উত্তর বৈকি।

মুসলিম পরিবারে বড়দের শ্রদ্ধা, ছোটদের স্নেহ করা ইসলামী নৈতিকতার শিক্ষা। অন্যদিকে পিতা-মাতাকে যত্ন করাতো কুরআনের নির্দেশ– 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা।'

'তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৪)

এই, যে পরিবারগুলোর অবস্থা সেগুলো কি করে প্রগতির বিরোধী হয়, আধুনিকতার প্রতিবন্ধক হয় তা বোঝা মুশকিল বৈকি। পশ্চিমের প্রচারণায় আমরা যে কতদূর মজেছি এ তার প্রমাণ। ওখানে পরিবার ব্যবস্থা বলে আজ আর কিছু

www.pathagar.com

থাকছে না। পরিবার ভাঙছে, সংসার ভাঙছে। সন্তান পিতা-মাতার খবর রাখে না, পিতা-মাতাও শেষ পর্যন্ত সন্তানকে বিদায় করে দেয়। বুড়োদের স্থান হয় বৃদ্ধ নিবাসে। এই কৃত্রিম ব্যবস্থাকে আর যাই হোক প্রগতি ও সুস্থতার চিহ্ন বলা যায় না।

বহু বিবাহ

ইসলামের বহুবিবাহ বা চার বিবাহের ধারণা পাশ্চাত্যে একটা বহুল বিতর্কিত বিষয়। এ বিষয়টিকে রং লাগিয়ে পাশ্চাত্যের লেখক, বুদ্ধিজীবীরা, এমনকি আজকের মিডিয়া রীতিমত একটা মীথ তৈরি করে ফেলেছে, ইসলাম হচ্ছে কামুক, লম্পট ও নারী ভোগীদের ধর্ম। কলোনির যুগে ইসলাম পাশ্চাত্যের ওরিয়েন্টালিস্টদের দ্বারা ভয়ানকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। মধ্যযুগের ক্রুসেড পাশ্চাত্যে ইসলাম বিদ্বেষের বীজ বুনে দিয়েছিল, তখন থেকেই এই রটনার শুরু। কলোনির যুগে মুসলিম বাদশাহ বা সুলতানদের হারেমের ভিতরকার ঘটনাকে রং লাগিয়ে পশ্চিমের প্রচার বিশারদরা ইসলামের ইমেজ খাটো করার বহু চেষ্টা করেছেন। এখন দেখা যাক প্রকৃত অবস্থাটা কি? আসল কথা হচ্ছে ইসলামে পুরুষকে যে বহুবিবাহের অধিকার দেয়া হয়েছে তা শর্ত সাপেক্ষ। আর বাস্তবতা হচ্ছে মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ পুরুষই একবিবাহ করে। সংখ্যার তুলনায় একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যা আনুবিক্ষণিকই বলা যায়, বহু বিবাহ করে থাকে।

কুরআনের আইনের পিছনে আগে আমাদের খেয়াল করা উচিত কি মৌলিক উদ্দেশ্য কাজ করছে– তা সে বহুবিবাহ হোক, কিংবা অন্যকোন শাস্তির ধারা হোক। প্রকৃত অর্থে একজন পুরুষকে কেবলমাত্র কোন অসাধারণ পরিস্থিতির কারণেই চার বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটা পরিষ্কার এক বিবাহই হচ্ছে আদর্শ এবং কুরআনও সেটির উপর জোর দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ কিংবা কোন সামাজিক অরাজকতার মুখে এরকম সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যখন নাকি কোন বঞ্চিত নারী নিরাপদ আশ্রয় পেতে পারে কিংবা তার শরীর বিক্রয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং আক্ষরিক অর্থের বিবেচনা নয়, উদ্দেশ্যটাই খেয়াল রাখা উচিত।

তাই কুরআন যে পুরুষকে বহুবিবাহের অধিকার দিয়েছে তা কখনো কখনো সামাজিক প্রয়োজনও বটে। কুরআন বলছে ঃ 'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা, চারটি পর্যন্ত।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩)

কিন্তু এই আয়াতেরই পরবর্তী অংশে কুরআন শর্ত দিচ্ছে- 'আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই।'

www.pathagar.com

এটা একটা শক্ত শর্ত যা বাস্তবিক অর্থে পালন করা কঠিন। এবং কুরআন যা বলছে তাতে বহুবিবাহ্ সম্ভব নয়। লক্ষ্য করুণ ঃ 'তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৯) কুরআনের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এক বিবাহ, কেননা একের অধিক স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ ও ব্যবহার করা কার্যত এক কঠিন ব্যাপার।

এতদসত্ত্বেও বহুবিবাহের ব্যাপারে আজকের মুসলমানদের অবস্থান Apologeticও নয়, Defensiveও নয়। আমি এখন একজন প্রগতিশীল আধুনিকা ভারতীয় মুসলিম নারীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা ইসলামের বহুবিবাহের সমার্থক ঃ

Islam accommodates human weaknesses and needs. It aims to create a society based on natural instincts. It sanctions re-marriage and divorce but discourages flagrant immorality and sex outside marriage. Polygamy is a provision and not a compulsion.

The Western pattern and definition of women's liberation is not the only one. If a woman is content with being a second wife why should anyone tell her she should feel otherwise? Polygamy provides a hedge for increased female population due to disasters like wars. The clause legitimizing multiple wives is in the interest of 'the other woman' as it gives her moral, social and legal rights. One man one woman relationship is merely an Anglo-Saxon concept of purity.

The oppression of Muslim women in the sub-continent is a result of feudal social attitudes and has nothing to do with Islam. Some of the laws in these countries are detrimental to women and need to be reviewed in the Muslim framework. Islamic jurisprudence provides the liberal and progressive basis for a moral and a just society in recorded history. (Sadia Dehlvi: In praise of the Shariat, Friday times, 26 March, Lahore.)

ইসলামে বিবাহ একটা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক নয়, এটি হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী বন্ধনের ধারণা। তাই তালাককে, অসাধারণ কোন পরিস্থিতি ব্যতিরেকে ইসলাম অনুমোদনতো করেই না, উল্টো নিরুৎসাহিত করে। এতদসত্ত্বেও তালাকের পূর্বে ইসলাম বারবার দ্বন্দ্বমান দম্পতির মধ্যে আপোষের উপর গুরুত্ব দেয়। এ সবকে আর যাই হোক সমালোচনার বিষয়ে পরিণত করা, কোন স্বচ্ছতার ইংগিত দেয় না।

www.pathagar.com

যারা ইসলামের বহুবিবাহকে তীর্যকতার সাথে আঘাত হানেন তারা কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের গুপ্ত বহুবিবাহ (concealed polygamy),একাধিক সঙ্গিনীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কের (Illegal multiple sex) ব্যাপারে তেমন কিছুই বলেন না। এতে যে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে তাও কেউ আলোচনায় আনছেন না। এটি ইসলামের বহুবিবাহের চেয়ে উত্তম কোন জিনিস কিনা সেটা অবশ্যই বিচার্য।

মুসলিম নারী

মুসলিম নারীদের নিয়ে পাশ্চাত্যের কৌতূহলের অন্ত নেই। পশ্চিমের মিডিয়াতো মুসলিম নারী নিয়ে রীতিমত একটা স্টেরিওটাইপ তৈরি করে ফেলেছে, আমরা অনেকেই তা হজম করেছি। পশ্চিমীদের ধারণা মুসলমান নারীরা একান্তই অসহায়, ঘরের কোণে তারা বন্দী জীবন যাপন করছে, তাদের স্বাধীনতা বলে কিছুই নেই। পশ্চিমীরা আরও প্রচার করে ইসলামপন্থীরা যদি ক্ষমতায় আসে তবে নারীরা হুমকির মধ্যে পড়বে, তাদের ঘর থেকে বের হতে দেবে না এবং তারা বাইরে কাজ করতে পারবে না। এ একান্তই মিথ্যা ভাষণ। ইরানে মেয়েরা কাজ করে প্রমাণ করেছে ইসলাম তাদের উপর কোন অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যদি কোন নিষেধাজ্ঞা থাকে তবে তার উত্থান ঘটেছে সামাজিক কারণে, ইসলামের তাতে অনুমোদন নেই। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্কে মেয়েরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রমাণ করেছে মুসলিম সমাজ তাদের নারীদের ইজ্জত দিতে জানে।

ইসলাম মেয়েদের সবরকমের অধিকার দিয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, তালাক দেয়ার অধিকার, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কথা বলার ও দায়িত্ব পালনের অধিকার, ব্যবসা পরিচালনার অধিকার এবং জ্ঞানার্জনের অধিকার। তাহলে ইসলাম মেয়েদের কোন দিক দিয়ে খাটো করেছে?

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। একমাত্র ইসলাম এসে এ অবস্থার পরিবর্তন করে এবং কুরআনে মেয়েদের এ অধিকার প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়। মেয়েদের অধিকারের এ স্বীকৃতি পশ্চিমে কেবল গত শতাব্দীতেই দেয়া হয় অথচ ইসলামে রসুলের যুগ থেকেই এ অধিকার প্রয়োগ করা হচ্ছে।

রসূল (স.) এর পরিবারের নারীরা আজও মুসলিম নারীর আদর্শতুল্য। একদিকে তারা যেমন ছিলেন মমতাময়ী ও স্নেহশীল, অন্যদিকে জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সক্রিয়। তদুপরি তারা ছিলেন বিপুল মর্যাদার অধিকারী। ওরিয়েন্টালিস্টরা মুসলিম মেয়েদের নিয়ে যে স্টেরিওটাইপ তৈরি করেছিলেন - shy, retiring, ineffectual creatures-তারা মোটেই তা ছিলেন না। তারা

www.pathagar.com

পরিবারের সব কাজে অংশ নিতেন, এর উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। মুসলিম জগতে আজও খাদিজা ও ফাতিমা জনপ্রিয় ও আবশ্যকীয় নাম। সে সময় বিশেষ করে ফাতিমার ছিল গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। রসুলের মেয়ে, হযরত আলীর স্ত্রী এবং হাসান-হোসেনের মা হিসেবে তার স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রসূল নিজেই তার মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন ঃ ফাতিমা আমার শরীরের অংশ, যে তাকে আঘাত দেয়, সে যেন আমাকেই আঘাত দেয়, অন্যদিকে যে আমাকে আঘাত দেয়, সে যেন আল্লাহকেই আঘাত দেয়। তার শহীদ পুত্রদের মতো তিনিও এক ত্যাগ ও সেবাব্রতীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম যখন এ দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল, মুসলমানরা যখন ছিল সবদিক দিয়ে অগ্রগামী, মুসলিম নারীদের অবস্থানও ছিল তখন সম্মানজনক। যখন মুসলমানদের অবস্থানই সার্বিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, সমাজে তখন মুসলিম নারীদের অবস্থানও দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুসলিম সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোতে নারীরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যখন সে সভ্যতা হুমকির মুখে পড়লো তখনই নারীর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেলো, অনেক ক্ষেত্রেই তার অধিকার কেড়ে নেয়া হলো।

মোঘল আমলের চূড়ান্ত বিকাশ কালে মুসলিম নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক প্রত্যেকটি কার্যক্রমে তাদের পুরুষদের পাশে সমানভাবে অবস্থান করেছে। কখনো কখনো তাদের সৃষ্টি প্রতিভায় পুরুষকেও ছাড়িয়ে গেছে তারা। রাজনীতিবিদ, লেখক, শিল্পী, কবি হিসেবে তারা সব সময়ই কেন্দ্রীয় অবস্থানে ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো তাদের উঁচু অবস্থান ও ব্যস্ত জীবনের মধ্যে তারা কখনোই অনৈসলামী আচরণের জন্য আলেম ওলামাদের সমালোচনার শিকার হননি। তার মানে তারা যেমন নিজের সুষ্ঠ দায়িত্ব পালন করেছেন তেমনি খেয়াল করেছেন কোন কিছুই যেন ইসলাম নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে। মোটের উপর মোঘল নারীরা দীন ও দুনিয়ার এক অপূর্ব সমন্বয় করেছিলেন। এরকম চিত্র আমরা মুসলিম স্পেনে দেখেছি, বাগদাদের আব্বাসীয় শাসনামলেও লক্ষ্য করেছি।

প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে ইসলামের অনুপস্থিতির কারণেই সমাজে নারীর স্থান গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। আজ মুসলিম নারীদের অবস্থা নিয়ে পশ্চিমী মিডিয়ার বিরামহীন অপপ্রচার চলছে। তাদের এই অবস্থানের জন্য নাকি ইসলামই দায়ী। ইসলামের ইমেজকে খাটো করে তুলে ধরাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। পশ্চিমী প্রচারণার দু'একটি ধরন দেখুন ঃ ইসলামে নারীরা হচ্ছে পুরুষের অধঃস্থন, এজন্য একইসাথে চলবার সময় পুরুষরা আগে চলে, মেয়েরা চলে পিছে পিছে। অথবা খাওয়ার সময় পুরুষ আগে খায়, মেয়েরা পরে। কারণ পুরুষের সাথে মেয়েদের খাওয়াকে সুলক্ষণযুক্ত মনে করা হয় না। তাছাড়া সবার খাবার পর অবশিষ্টটুকুই মেয়েদের খাওয়াই রীতি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এসব রীতি ও প্রথা কোনটিই ইসলাম

www.pathagar.com

সম্মত নয়। এসব নানা রকমের প্রাক ইসলামিক ও অনৈসলামিক রীতি মুসলমানদের মধ্যে নানা সময় ঢুকে পড়েছে। কুরআনে ও হাদীসে এর কোন নির্দেশ নেই, উল্টো এ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের মৌলনীতির পরিপন্থী। পশ্চিমীরা এগুলোকে জড়িয়ে ইসলামকে কাঠগড়ায় উঠিয়েছে।

পশ্চিমীরা অবিরত প্রচার করছে মুসলিম মেয়েরা তাদের পরিবারে, তাদের পুরুষদের দ্বারা প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার ও অন্যায় আচরণের শিকার হয়। পুরুষরাই জোর করে তাদেরকে বন্দীত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য করছে। আধুনিক পরিবারগুলোতে তাদের ভাষায় ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলোর তুলনায় মুসলিম মেয়েদের অবস্থান নাকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সত্য কথা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারগুলো এখনো সামাজিক স্থিরতা ও শৃংখলাকে টিকিয়ে রেখেছে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্যবোধকে জিইয়ে রেখেছে। আধুনিক পরিবারগুলোতে নগর জীবনের ভয়ংকর প্রতিযোগিতার চাপ, বিবাহ বহির্ভূত নীতিহীন সম্পর্ক, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অবিশ্বাস এগুলো এখনও ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলোতে স্থান পায়নি। আধুনিক পরিবারের এই সব মূল্যবোধ যদি হয় নারীর প্রগতিশীলতার প্রতীক, তবে তা আর যাই হোক ইসলাম অনুমোদন করতে পারে না। আসলে পশ্চিমে পরিবার ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ছে, নারী নির্যাতন হয়ে উঠেছে সেখানকার দৈনন্দিন চালচিত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হয়, এই খবর নিশ্চয় কোন সুস্থ সমাজের ছবি হতে পারে না। এই অসুস্থ সভ্যতার সারথীরা যখন ইসলামকে নারী নির্যাতনের অপবাদ দেয় তখন সেই পুরনো প্রবচন মনে পড়ে 'চালন বলে সুই তোর ফুটো।'

পর্দা ও হিজাব

মুসলিম নারীর মতো তার পর্দা বা হিজাবকেও পশ্চিমী মিডিয়া নিষ্ঠুর আক্রমণের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। পর্দার ইসলামী ধারণাকে মধ্যযুগীয় ও অনাধুনিক হিসেবে ছাপ মেরে এটিকে একটি বর্বর সভ্যতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা পশ্চিমী মিডিয়ার রোগে পরিণত হয়েছে। কালো কাপড়ে পুরো শরীর আবৃত, শুধু চোখ দুটো কোন রকমভাবে দেখা যায় এরকম নারীর ছবি পশ্চিমী মিডিয়া অহর্নিশ প্রচার করে কি বলতে চায়? ফ্রান্সের স্কুলে হিজাব পরিহিত মুসলিম মেয়েকে ঢুকতে দেয়া হবে কি হবে না কিংবা তুরস্কের পার্লামেন্ট সদস্যকে হিজাব পরিহিত অবস্থায় শপথ নিতে দেয়া হবে কি হবে না, এটি পশ্চিমী মিডিয়ায় যত দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা এটিকে একটি দ্রুত বিতর্কের বিষয়ে পরিণত করতে তারা যে পটুতা প্রদর্শন করে ঠিক সেরকমভাবে আফ্রিকার অপুষ্টিতে মরতে যাওয়া বনি আদমদের খবর কিংবা ইহুদীদের হাতে ফিলিস্তিনীদের গণহত্যার ছবি পশ্চিমী মিডিয়া প্রচার করতে আগ্রহ বোধ করে না। এর রহস্য বোঝা কঠিন নয়। পর্দা ইসলামে শুদ্ধতার

www.pathagar.com

প্রতীক, বন্দীত্বের নয়। পর্দা যেমন নারীর জন্য আবশ্যকীয়, তেমনি পুরুষের জন্যও। এ প্রসঙ্গে রসুলের সেই বিখ্যাত হাদীস স্মরণ করা যায়, সত্যিকার পর্দা হচ্ছে পুরুষের চোখে। শুদ্ধতা, পবিত্রতা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা, এটিকে রক্ষা করতে আগে চাই মানসিক পবিত্রতা। মানসিক পবিত্রতা ছাড়া পর্দা রক্ষা একেবারেই অসম্ভব। এমনকি হিজাব, বোরকা কিংবা চাদর পরিহিত অবস্থায়ও। এবং এই পবিত্রতা রাখা সম্ভব জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইসলামের আদেশ নিষেধের পুরোপুরি বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

পর্দাকে দেখতে হবে ইসলামের এই নীতির আলোকে। আমরা এখন মূল নীতি থেকে সরে এসে জোর দিয়েছি বোরকা কিংবা হিজাবের উপর এবং মনে করছি নারীর উপর এটি চড়িয়ে দিলেই পর্দা রক্ষার দায়িত্ব হাসিল হবে। মোহাম্মদ আসাদের মতো বুদ্ধিজীবী পর্দা সম্পর্কে এ সব কথা বলেছেন।

গত শতকের আশির দশক থেকে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে হিজাব বা পর্দা পালনের একটা লক্ষণ বেশি করে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বিশেষ করে যে সব মুসলমানরা আজ পাশ্চাত্যে বসবাস করছে তারা পর্দাকে যেমন শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে নিয়েছে তেমনি মুসলিম পরিচয়ের (Identity) প্রতীক হিসেবেও গ্রহণ করেছে। এই সব মেয়েরা হিজাবকে কোন চাপের মুখে নেয়নি। তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তাদের ভাষায় এটি হচ্ছে মুসলিম মেয়ের মর্যাদার প্রতীক ঃ This is where I stand and I am proud of it.

পর্দা যদি বন্দীত্বের প্রতীক হয় তবে ইরানে কি করে হিজাব পরে মেয়েরা দেশের বড় বড় নির্বাহী পদ থেকে শুরু করে নানা স্তরে কাজ করছে। মুসলিম দুনিয়ায় বিভিন্ন স্থানেই পর্দা পালন করে অনেক মেয়েরা ঘরে বাইরে আজকাল পুরুষের সাথে সমান প্রতিযোগিতায় এগিয়ে চলছে। পশ্চিমী মিডিয়া এগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

এ আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দিতে চাই। আধুনিকতার বিষয়ে মুসলিম প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে পশ্চিমী বিশ্লেষকরা বলেন মুসলমানরা গণতন্ত্র ও আধুনিকতার দিকে পা বাড়াতে চাইলে তাদেরকে 'আমাদের' মতো হতে হবে। এই 'আমাদের' অর্থ হচ্ছে পশ্চিমের ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের ধারণা। মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা একেবারে অসম্ভব। মুসলমান হয় 'মুসলিম' অথবা একেবারে কিছুই না। মুসলমানদের জন্য কোন মধ্যবর্তী ব্যবস্থা নেই। তারা সুবিধামতো ইসলামের কিছু কিছু গ্রহণ করবে, কিছু কিছু বর্জন করবে, তারপরেও মুসলমান দাবি করবে সেটা একেবারেই অসম্ভব। এবং সেটা যদি তারা করতে চায়, তবে মুসলমান নয় অন্য কিছু হয়ে থাকতে হবে। এর নমুনা আমরা যে আজকাল কিছু কিছু দেখছিনা এমন নয়।

www.pathagar.com

মিডিয়া ইমেজ

মিডিয়ার শক্তি ও প্রভাব অস্বীকার করা এখন বাহুল্য। এ কালে মিডিয়া ইসলামের ইমেজকে কতখানি বিধ্বস্ত করেছে উপরের আলোচনা তার নমুনা। মিডিয়ার শক্তি, আগ্রাসী ভূমিকা বিশেষ করে এর ইসলাম বিরোধী চরিত্রের সামনে মুসলমানরা তাদের নিজেদের অবস্থানকেও তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে, এমনকি যা তারা নিজেদের জীবনের সত্য হিসেবে মেনে আসছে তাও তারা প্রকাশ করতে পারছে না। মিডিয়া সেই সত্যকেই অবলীলায় অস্বীকার করে বসছে। এখনকার পৃথিবীতে মুসলিম বাস্তবতা গড়ে উঠেছে টিভি ইমেজ, সংবাদপত্রের অসংখ্য শত্রুতামূলক প্রতিবেদন এবং তাদের নিয়ে তৈরি নিষ্ঠুর সব জোককে (Jokes) নির্ভর করে। মিডিয়ার জগতে মুসলমানদের কোন ভাষা নেই, স্থান নেই। তাই তাদের কথা তারা যেমন ব্যাখ্যা করতে পারে না, তেমনি কোন অভিযোগও দিতে পারে না। তারা একান্তই অসহায়। মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে ধর্মান্ধতা হিসেবে বাতিল করা হচ্ছে, তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়াকে মৌলবাদ বলে উপেক্ষা করা হচ্ছে। মিডিয়ার জুয়া খেলায় মুসলমানরা হেরে গেছে বললে ভুল হবে না। এই পরাজয় রুপান্তরিত হয়েছে হতাশায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সহিংসতায়। এই সহিংসতার ন্যায্যতা শত্রুতাভাবাপন্ন মিডিয়া বিবেচনা করতে ইচ্ছুক নয়।

মুসলিম দুনিয়ার উপর পশ্চিমীদের অন্যায়-অবিচারের কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে মিডিয়া সেটির কিভাবে অপব্যবহার করে তার একটি নমুনা দিচ্ছি। পশ্চিমের বহু পত্র পত্রিকায় মিছিলরত কিংবা শ্লোগানরত হিজাব পরিহিত একদল নারী অথবা দাড়ী, টুপি এবং পাগড়ী পরিহিত একদল পুরুষের ছবি ছাপিয়ে নিচে ক্যাপশন লেখা হয় ঃ Islam in rage অথবা Islam confused by rage কিংবা Islam's rage হিসেবে। এই যে যুক্তরাষ্ট্র টনকে টন বারূদ, বোমা আর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে মুসলিম দুনিয়ার উপর ঝাপিয়ে পড়ছে তখন কিন্তু এরকম লেখা হচ্ছে না Christianity in rage কিংবা ফিলিস্তিনীদের উপর ইহুদীদের নির্মম কর্মকাণ্ডকে বলা হচ্ছে না Judaism in rage। এই মিডিয়া ইমেজ ও স্টেরিওটাইপ তৈরির অন্তর্গত উদ্দেশ্য কারো বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়।

মিডিয়া যেমন একদিকে ইসলামের চরিত্র হননে ব্যস্ত, তেমনি এর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলোকেও ধ্বসিয়ে দিতে গভীর উৎসাহী। গত শতকের আশি বা নব্বইয়ের দশকে মিডিয়ার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল নারীবাদ (Feminism), সমকামিতা (Homosexuality) এবং এইডস (AIDS)। নতুন শতকে এসে আমরা হয়তো এখন শুনবো Post-Feminism, Post-Homosexuality এবং Post-AIDS এর মতো বিষয়গুলোর কথা। এসব কিছুই ইসলামের জগতে

www.pathagar.com

অপরিচিত। আবার এমন কিছু বিষয় আছে যা ইসলাম কখনোই অনুমোদন করে না যেমন মাদক ও মুক্ত যৌনতা (Free sex), তা আবার এখন মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে ফিরে আসছে। সর্বোপরি মিডিয়া আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থাসমূহকে একালে রীতিমত হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, পিতামাতার প্রতি উপেক্ষা, বৃদ্ধদের অবহেলা, মাদকগ্রহণ পারিবারিক ব্যবস্থাগুলোকে দুর্বল করে ফেলছে। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থাগুলো এমনিতেই পশ্চিমের তুলনায় অনেক সংহত ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ভাবনায় উজ্জীবিত। কিন্তু গত কয়েক দশকে আমাদের সমাজে যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে, যে রকমভাবে হত্যা, ধর্ষণ ও নীতিহীনতার মচ্ছব শুরু হয়েছে সেখানে পশ্চিমী মিডিয়া বা এর প্রভাবিত তথ্য মাধ্যমগুলোর যে একটা নীরব ভূমিকা কাজ করছে তাকি এখন আমরা অস্বীকার করতে পারি?

মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন পরিস্থিতির জন্য উদ্বিগ্ন। তাই তাদের পক্ষ থেকে এখন প্রশ্ন উঠেছেঃ কেন তারা এমন একটি পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে অগ্রসর হবে যা তাদের জীবন ভাবনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ধরন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক? কেন তারা ক্ষণজীবী মূল্যবোধ ও আনন্দের কাছে, তা যত চিত্তাকর্ষক ও শক্তিশালী হোক না, তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাগুলোকে নির্বিরোধ সমর্পণ করবে? এগুলো অতিব জরুরি ও সংগত প্রশ্ন।

মুসলিম কৌশল

আজকের যুগকে বলা হচ্ছে উত্তর আধুনিকতার যুগ, আবার কখনো কখনো উত্তর ঔপনিবেশিকতার যুগ। এ সব ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ ও প্রবণতা এ যুগের বহুভঙ্গিমা ও জটিলতার দিক নির্দেশক। এ যুগ আবার একইসাথে অমুসলিমদের যুগও। যুগের ধর্মীয় চরিত্র অবশ্যই নেই, কিন্তু বর্তমান যুগকে নিয়ন্ত্রিত করছে অমুসলিমরাই। বিশ্ব সংসারে মুসলমানের ভূমিকা আজ গৌণ হয়ে এসেছে।

এ যুগকে নিয়ে মুসলমানের প্রতিক্রিয়া কি? তারাই বা কি ভাবছে এ যুগকে নিয়ে? একশো দুশো বছর আগে ইউরোপীয় আধিপত্যের মুখে তারা যেমন করে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তার ধরনে আজ কি কোন রূপান্তর এসেছে? আকবর এস. আহমদ লিখেছেন ঃ

The Muslim response to Post Modernism is the same as it was a century ago : retreat accompanied by passionate expressions of faith and anger. From the Sanusi in North Africa, to the Mahdi in Sudan, to the Akhund in Swat, Muslims appeared to challenge the European imperialist and, under fire, disappeared back in to the fastness of their deserts and mountains (Post modernism and Islam)

www.pathagar.com

এই মুসলিম বুদ্ধিজীবীর কথাটা এক অর্থে ঠিক, ইউরোপীয় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক আগ্রাসনের মুখে সে সময় মুসলমানরা পাহাড়ে, মরুভূমিতে যেয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। ইউরোপীয়দের নাগালের বাইরে যেয়ে নিজেরা বাঁচতে চেয়েছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রসম রেওয়াজকেও রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এটা করতে যেয়ে তারা কখনো কখনো এমনভাবে অতীতের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন যে ভাবটা এমন বর্তমান বলে কিছুই নেই। কিন্তু সেদিনের তুলনায় আজকের মধ্যে একটা গুণগত তফাৎ আছে। মুসলমানরা সেদিন পর্বতে মরুভূমিতে যেয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন ঠিক, কিন্তু আজকে সেটা সম্ভব নয়। পশ্চিমের কারিগরী সমৃদ্ধির কাছে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তও আজ করতলধৃত। পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই। উপগ্রহ প্রযুক্তি আজ মরুভূমিতে কোন উস্ট্র চলাচল করছে সেটিও অনুসরণ করতে পারে। লেসার নিয়ন্ত্রিত মিসাইল এখন দুর্গম আফগান পার্বত্য এলাকার যে কোন গৃহে অবতরণ করতে পারে। ভিসি আর, সিডি এখন আর বিলাস নয়, মরুভূমির তাঁবুতেও যেমন এটি পাওয়া যায়, তেমনি পার্বত্য গ্রামগুলোতেও এটি প্রায় সুলভ হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি আজ মুসলিম সমাজকে ভাঙছে তার মূল্যবোধকেও গুড়ো গুড়ো করে দিচ্ছে। মধ্যবিত্ত মুসলিম জীবনের নিরাপদ অনায়াস সাধ্য জীবন এবং সময়হীনতার অনন্ত অনুভূতি তছনছ করে ফেলছে। মিসরের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক নাগীব মাহফুজ তার ট্রিওলজী উপন্যাস The Cairo Triology তে মধ্যবিত্তের এই ভেঙে পড়া, তছনছ হয়ে যাওয়ার চিত্র একেছেন অপূর্ব শিল্প শৈলীতে। আর আকবর এস. আহমদ লিখেছেন ঃ

But this cocooned, privileged timelessness is now shattered; it is irretrievably lost with the invasion of the Western media. By the late 1980s, television (CNN, the BBC), the Western media's storm troopers, were preparing to to broadcast directly, via satellite, to the Muslim world. Neither Cairo, nor Marrakesh nor Kualalampur are inviolate (Postmodernism and Islam)

তাহলে মুসলমানরা এখন কি করবে? উত্তর আধুনিক যুগ এসে তাদের দুয়ারে হানা দিচ্ছে। পালিয়েও তাদের রক্ষা নেই, আত্মসমর্পণেও মুক্তি নেই। দরজা খোলার আগে তাদের এ যুগের শক্তি ও প্রকৃতি বোঝা চাই এবং আরও জানা চাই এ যুগের প্রতিনিধিত্ব আসলে কারা করছে। এর মধ্যে এমন সব ব্যক্তিরা আছেন যাদেরকে আজ মুসলমানরা আদৌ পছন্দ করে না। এর মধ্যে অবশ্যই শিল্পী ম্যাডোনা, লেখক সালমান রুশদী ও প্রেসিডেন্ট বুশের কথা বলা যায়। মুসলমানদের এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ কেন এই সব ব্যক্তিত্ব আজকের যুগের

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্ব করছে? তাদের উপর পশ্চিমের আঘাত এমন সময় এসে পড়েছে যখন মুসলমানরা সবচেয়ে দুর্বল, তাদের নেতৃত্ব দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রশাসকরা অযোগ্য, চিন্তাবিদরা অস্বচ্ছ ও দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ। সব দিক বিবেচনা করে এ কথা স্পষ্ট করে বলা যায় মুসলমানের জীবন ও কর্মকাণ্ড থেকে ইসলাম বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, তাদের জীবনের মৌলকেন্দ্রে ইসলামের স্থান নেই।

এই যদি হয় অবস্থা তাহলে এখন মুসলমানদের কর্মকৌশল কি হবে? ওহাবী কিংবা সানুসীরা যেভাবে ইউরোপীয় আধুনিকতা কিংবা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নিজেদের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, ঐ প্রতিক্রিয়া ও কৌশলতো আজকের দিনে খাটবে না। পুরনো পদ্ধতি ও পুরনো কৌশল আজকের দিনে সংকটাবর্তে পড়া মুসলমানের কোন কাজে আসবে না। আমরা যদি এই অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত যুগের প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে ব্যর্থ হই তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবো না।

আজকে আমাদের ঐক্যের সমস্যা, সংহতির সমস্যা, চিন্তার সমস্যা, বুদ্ধিজীবিতার সমস্যা। সবার উপর রয়েছে আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস। এই অচলায়তন থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদেরকে আবার ইসলামের কাছে ফিরে আসতে হবে। ইসলামের আলোকে আমাদের নীতিসমূহকে আবার পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। ইসলামী পরিভাষায় একেই বলে ইজতিহাদ। একজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম নেতা আগা খানের কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি আলেম নন, ধর্মনেতা হিসেবে তার একটা পরিচিতি থাকলেও সেটি মুসলমানদের মধ্যে কখনোই সার্বজনীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তবু তার অনুভূতিগুলো তার কওমের জন্য গভীর ভাবনার উৎসারক বলেই মনে করা যেতে পারে। স্পেনে মুসলমানদের বিপর্যয় যেমন তাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে, আজকের মুসলমানদের হতোদ্যম চিত্ততাও তার মনোঃকষ্টের কারণ বৈকি। তিনি বলেছেন ঃ

Those who wish to introduce the concept that you can only practice your faith as it was practised hundreds of years ago to me, are introducing a time dimension which is not a part of our faith. Therefore what we have to be doing, I think is to be asking as Muslims how do we apply the ethics of our faith today? This is a matter for Muslims to think about and it is a very delicate issue whether it is in science, in medicine, in economics. (Akbar S. Ahmed : The quiet revolutionary, in The Guardian, 8 Aug. 1991)

আশা করি এ সব কথার সাথে কারো মতান্তর হবার সম্ভাবনা কম।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আগেই বলেছি এখনকার যুগ হচ্ছে বহুভঙ্গিমতা, জটিলতা ও বিচিত্রতার যুগ। সত্যের সাথে মিথ্যা, আলোর সাথে অন্ধকার, সরলতার সাথে ঋজুতা একই সাথে একাকার হয়ে আছে। আজ যাকে প্রিয় বলে কাছে ডেকে নিচ্ছেন, সেই আগামীকাল আপনাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আজ যাকে বিশ্বাস করছেন কাল সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এ যুগের চরিত্র সত্যিই দুর্বোধ্য। যত বেশি সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, সহাবস্থানের কথা বলা হচ্ছে যেন তত অসহিষ্ণুতা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে।

সালমান রুশদীর সাটানিক ভার্সেস এর কথা চিন্তা করুন। পুরো পৃথিবীটা যেন একে কেন্দ্র করে দুভাগ হয়ে গেল। মুহূর্তে এতকালের অনেক স্টেরিওটাইপ বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো, অন্যদিকে নতুন নতুন প্যারাডক্সের জন্ম হলো। আমরা দেখলাম অনেক গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্মযাজক (যাদেরকে আমরা প্রায়শ ইসলাম বিরোধী ভেবে থাকি) মুসলমানের পক্ষে এগিয়ে এলেন অন্যদিকে অনেক উদার নৈতিক বুদ্ধিজীবী (যাদেরকে ধারণা করা হয় সেকুলার, ধর্ম সম্পর্কে নিস্পৃহ ও নির্মোহ) তাদের আচরণ ও মতামতে মধ্যযুগের ইনকুইজিসনের যাজকদেরও (Inquisition priests) এক রকম ছাড়িয়ে গেলেন।

আবার সাদ্দাম হোসেনের কথা ভাবা যাক। গত শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে তিনি মূলত পরিচিত ছিলেন একজন স্ট্যালিনবাদী ডিক্টেটর হিসেবে। মুসলিম দুনিয়ায় যে কয়জন নিষ্ঠুর কমিউনিস্ট শাসক এসেছেন সাদ্দাম হোসেন তাদেরই একজন। ইসলাম বিরোধিতা, অসংখ্য আলেম-ওলামাকে হত্যার মত গর্হিত অপরাধে তিনি জড়িত। আশ্চর্যের বিষয় হলো সেই সাদ্দাম হোসেনই আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার দেশবাসীকে জিহাদের ডাক দিয়েছেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা বাধ্য হয়েই হোক তিনি এখন ইসলামের আশ্রয় নিয়েছেন। এবং পুরো মুসলিম দুনিয়া তার এ নতুন ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছে বা উপায়ন্তর না দেখে জানাতে বাধ্য হচ্ছে।

মোট কথা কোন কিছুরই শক্ত সীমারেখা আর থাকছে না। একজন মানুষের মধ্যেই বহুবিচিত্রতা ও বহুরূপিতা এসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এটি এ বহুমাত্রিক যুগের বৈশিষ্ট্য।

আগামী দিনগুলোতে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে নানা ফ্রন্টে যুদ্ধ হবে। এর একদিকে থাকবে উদারনৈতিকতা, যুক্তিমানতা, সাম্যাবস্থা, অন্যদিকে এসে দাঁড়াবে বিদ্বেষ ও সংস্কার। এক পক্ষে থাকবে সহিষ্ণুতা, বোঝাপড়া ও সহাবস্থানের নীতি, বিপরীতে দাঁড়াবে অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণার ব্যাধি এবং এটাও সত্য কে কোথায় কোন ফ্রন্টে দাঁড়িয়ে যাবে তাও অস্পষ্ট।

www.pathagar.com

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি সবচেয়ে যুদ্ধবিরোধী যুক্তিনিষ্ঠ লেখাগুলো এসেছে পাশ্চাত্য থেকেই। Edward Pearce, Victoria Brittain, John Pilger ও Martin Woollacott এর ভূমিকার কথা কে না জানে।

এবার ইরাক যুদ্ধের কালেও যুদ্ধ বিরোধী বড় বড় সমাবেশগুলো হয়েছে মূলত পাশ্চাত্যেই। রবার্ট ফিস্কের মতো বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিককেও আমরা দেখেছি যার প্রতিবেদন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

তবে এটা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উপসাগরীয় যুদ্ধ, আফগানিস্তান যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিককালের ইরাক যুদ্ধ পুরো বিশ্ব ব্যবস্থাকেই ওলট পালট করে দিয়েছে। বিশেষ করে কমিউনিজমের পতনের পর যারা End of History'র তত্ত্ব নিয়ে এসেছিলেন, যারা বলেছিলেন পৃথিবীর মুক্তি ও সম্ভাবনার কথা, তারা ঠিক বলেননি। সাম্প্রতিক কালের ইরাক যুদ্ধ প্রমাণ করেছে পৃথিবীর নিয়ামক শক্তিগুলো নতুন করে এক বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চলেছে। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর জীবনাশংকা, একই সাথে আধুনিক যুদ্ধের বিভীষিকা, রাসায়নিক যুদ্ধ, পারমাণবিক যুদ্ধ সবই যেন এখন আগ্রাসী মুখ করে অপেক্ষা করছে। পুরো পাশ্চাত্য আজ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক আধিপত্যে পৃথিবীকে পেচিয়ে ধরতে চাইছে। ঐতিহ্যবাহী সভ্যতাগুলো কোথাও এই আধিপত্যকামিতাকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে, কেউ কেউ মানিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াধীন আছে। একমাত্র ইসলামই পাশ্চাত্যের অগ্রযাত্রার মুখে বাধা হয়ে উঠেছে এবং আগামী দিনে সভ্যতার যে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠতে যাচ্ছে সেখানে ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ বা আজকের পাশ্চাত্যই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলে আসছে।

এটা শুধু সভ্যতার দ্বন্দ্ব নয়, এমনকি ধর্মগত ও জাতিগত রেষারেষির বহিঃপ্রকাশ নয়, এটা 'দুটো ভিন্নতাধর্মী দর্শন ও জীবনবোধের মধ্যেও দ্বন্দ্ব। একটির আস্থা ধর্মহীন বস্তুতান্ত্রিকতায় (Secular Nationalism), অন্যটির বিশ্বাস ধর্মের মূল্যবোধে। একটি বিশ্বাসকে (Faith) অস্বীকার করেছে, অন্যটি বিশ্বাসকেই জীবনের মৌলকেন্দ্রে স্থান দিয়েছে। তাই এটি শুধু পাশ্চাত্য ও ইসলামের দ্বন্দ্ব নয়, দুটি বিপরীতমুখী বিশ্বাসের দ্বন্দ্বও।

একুশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছে ইসলামকে আজ এক নতুন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে। কি করে মুসলমানরা আজকের যুগে তাদের জীবনে কুরআনী মূল্যবোধ আদল ও ইহসান, ইলম ও সবরকে শুধু ফাঁকাবুলিতে পরিণত না করে যথার্থ পরিচর্যা করতে পারবে? কি করে তারা তাদের আত্মপরিচয়কে বিকিয়ে না দিয়ে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হবে? এটা একটা মহাপরীক্ষা (Apocalyptic test)। মুসলমানরা এখন একটা সংকটাবর্তে (cross roads) দাঁড়িয়ে আছে। তারা যদি একদিকের পথ নেয় সেক্ষেত্রে তারা তাদের যোগ্যতা

www.pathagar.com

ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারবে। অন্য দিকের পথে গেলে নিজেদের মেধা ও শক্তির ক্ষয় ঘটবে মাত্র। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, অসূয়া ও গৃহযুদ্ধে তারা হারিয়ে যাবে। একদিকে আশা ও সম্ভাবনা, অন্যদিকে অনৈক্য ও বিশৃংখলা।

পশ্চিম আজ মিডিয়াসহ তার অনিবার্য ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে ধেয়ে আসছে। মুসলমানদের আজ তাই সময়ক্ষেপণের সুযোগ নেই। সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার এই উপযুক্ত সময়। লোভ, লালসা, বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভোগবাদের নৈরাজ্যে পেচিয়ে ধরা এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন এখন জরুরি হয়ে উঠেছে। মানবতাকে ত্রাণ করার জন্য আজ তাই ইসলামের অনিবার্য অভ্যুত্থান সম্ভাবনা প্রবলতর হয়ে দেখা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

মেকলের ভূত ও ঔপনিবেশিক মানসিকতা

১

মেকলে চেয়েছিলেন দেশি সাহেব তৈরি করতে। সাহেব তৈরি করতে হলে তো আগে মন-মগজের পরিবর্তন চাই। তাই তিনি প্রথমেই হাত দিয়েছিলেন এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায়। কারণ তিনি জানতেন যতো বেশি বেশি করে ইংরেজের শিক্ষা ও দর্শনটা এইসব নেটিভদের গলধঃকরণ করিয়ে দেয়া যাবে ততোই তাদের বিপ্লবী ভাব নিস্তেজ হয়ে পড়বে, ইংরেজের সামনে অবনত হয়ে পড়াই হবে তাদের নিয়তি। আজ মেকলে নেই, আর সেই ইংরেজ উপনিবেশের রমরমাও নেই একালে। কিন্তু মেকলের ভূত আমাদের পিছু ছাড়েনি। মেকলের সাহেব তৈরির কারখানা ইংরেজের রাজনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা শুধু টিকিয়ে রাখিনি, একে ফলবান ও বীর্যবন্ত করে রাখতে আমাদের শ্রম ও মেধার সমানে অপচয় করে চলেছি। মেকলে বেঁচে বর্তে থাকলে তার কারখানার এই উৎপাদন সাফল্যে আজ তিনিও রীতিমত হকচকিত হয়ে উঠতেন।

আজও এখানে আমাদের সবার দু'পয়সা হলে কিংবা মধ্যবিত্তের সন্তানরা কিছু লেখাপড়া শিখে রুজি করলে আমাদের সাহেব সুবো সাজতে ইচ্ছে হয়, ইংরেজিতে কথা বলতে ইচ্ছে করে, ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে আসতে না পারলে আত্মার শান্তি হয় না।

বেশ কিছুদিন হলো আমাদের আচ্ছন্ন করেছে আর এক ঘোড়া রোগ। এতকাল দেখে এসেছি যাদের গাটের জোর একটু বেশি তাদের ছেলে-মেয়েদের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রীজ, হার্ভাড ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। কারণ ওখানকার সার্টিফিকেট পকেটে থাকলে জাতে উঠতে সুবিধা বেশি। এখন পয়সাওয়ালারা তাদের ছেলের বৌরা সন্তান সম্ভবা হলে বিলেত-আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে পাঠিয়ে দেয়। ওখানেই বাচ্চা হয়, যাতে ওখানকার গ্রীনকার্ড ধরতে সুবিধা হয়। আগে সার্টিফিকেট পেলেই চলতো, এখন ওখানে পাড়ি জমাতে না পারলেই যেন জীবনটা বৃথা।

আমাদের চোখের সামনে একটা উদাহরণ দেই। আজকাল তো ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় নাম না জানা সব ইংরেজি স্কুল। ভাবটা এমন এসব স্কুলে সন্তানদের না পড়াতে পারলে ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। এই স্কুলগুলো কি গড়ে উঠেছে বিশ্বায়নের তাগিদে, সংকীর্ণ দেশ ছাড়িয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে না নেহাৎই নব্য এক উপনিবেশবাদের চাপে, সে বিতর্কের সমাধান হওয়া আজ জরুরি। যে দেশের মানুষ কিনা ভাষার আব্রু আর ইজ্জত রক্ষার জন্য দুর্দান্ত এক লড়াই

www.pathagar.com

করলো তারাই কিনা আজ ইংরেজির প্রকরণ কলা আর বিষয় ভাবনা আত্মস্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

মেকলের সময় কথা উঠেছিল পাশ্চাত্য না প্রাচ্য শিক্ষা। অনেকের ধারণা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে আমাদের আলেম সমাজ ভুল করেছিলেন। ভুল কি শুদ্ধ সে বিতর্কে না গিয়ে এটুকু আমরা বলতে পারি ইংরেজরা যখন আমাদের দেশে আধিপত্য কায়েম করতে আসে তখন কিন্তু এখানকার অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থার নীতি ইউরোপের চেয়ে বহুগুণ শ্রেয় ছিল। সাহেব ঐতিহাসিকরা এই সময়টাকে সব রকমের অগতি, অবনতি আর অন্ধযুগ হিসেবে বর্ণনা করে তাদের অভিসন্ধিমূলক ইচ্ছাকে গোপন করে রাখতে পারেননি। ভাবটা এমন ইংরেজরা না এলে আমাদের উদ্ধারের আর কেউ ছিল না। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীই আজ মনে করেন নিজের শক্তিতে বিবর্তিত হলে আমাদের সমাজ যে উন্নত ও যুগোপযোগী হতে পারতো না এমন অবিশ্বাসের কারণ নেই। কিন্তু ইতিহাসের চাকা যেহেতু ঘোরানো যাবে না, তাই কি হতো আর কি না হতো তা ভেবে আর কতদূর লাভ। আজকের একবিংশ শতাব্দীতে প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতা এতদূর এগিয়ে যাওয়ার পর মেকলের কায়কারবারকে দান না অভিশাপ সেটা বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। এ কালে ইংরেজির দরকার আছে সত্যি, কিন্তু ইংরেজির সংস্কৃতিও কি আমাদের গ্রহণ করতে হবে? ভাষার সাথেই সংস্কৃতির যোগ। ভাষা টান দিলে সংস্কৃতিও আসে। আধুনিক জীবনের সাথে তাল মিলানোর জন্য না হয় ভার্নাকুলার হিসেবে ইংরেজি গ্রহণ করলাম, কিন্তু সেই গ্রহণের মধ্যে সংস্কৃতির যে ফাঁকটা আছে তা ধরতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব সম্মান নিয়ে টিকতে পারবে না। আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আদর্শের অনুজ্ঞা দিয়েই আমাদের আত্মোদ্ধারের পথ খুঁজতে হবে। মেকলেকে ছাড়া আমাদের চলে কিনা তা আমাদের রাজনীতিক-নীতি নির্ধারকদের ভেবে দেখতে হবে।

মেকলেও জানতেন উপনিবেশ চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু উপনিবেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক ব্যবস্থা উপনিবেশিত হয়ে গেলে তার ফল হবে সুদূর প্রসারী এটা তিনি ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন। মেকলে যে দেশি সাহেব তৈরির কারখানা বানিয়ে গেলেন তাই হবে ইংরেজের অগ্রবাহিনী। এখন থেকে আর সাম্রাজ্যবাদকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে দেশ দখলের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই। এই অগ্রবাহিনীই সাম্রাজ্যবাদের হয়ে কাজটা এগিয়ে দেবে। লক্ষ্য করুন তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, ইরানের রেজা শাহ পাহলভী কিংবা আজকালকার হামিদ কারজাইদের। কেউ তো বলতে পারবেন না এরা তুর্কী, ইরানী কিংবা আফগানী নন? কিন্তু কাজটা তারা দেশের জন্য করেননি, করেছেন সাম্রাজ্যবাদের হয়ে। মেকলে এ রকমটাই চেয়েছিলেন। উপনিবেশের স্থায়িত্ব

www.pathagar.com

তিনি চেয়েছিলেন অবশ্যই, কিন্তু উপনিবেশের ভিতরেই যে আর একটি উপনিবেশের কথা তিনি ভেবে রেখেছিলেন তার স্বরূপ আমরা কি আজও পুরোপুরি সনাক্ত করতে পেরেছি?

২

মেকলের কৌশল সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক চৈতন্যের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের সাংস্কৃতিক চরিত্র দুষিত, বিকৃত, উল্টা-পাল্টা করে দিয়েছে। আমাদের আত্মপরিচয়কে করে তুলেছে সংশয়াপন্ন। মেকলের বরাতে পশ্চিমের চিন্তা ও দর্শন আমাদের মনে মগজে এমন জবরদস্ত ছাপ ফেলে দিয়েছে যে এখন আমরা রীতিমতো আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকেও তাকাতে ভয় পাই। পাছে কেউ প্রতিক্রিয়াশীল বলে গাল দেয়। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার এই বর্ণবাদী ও একপেশে সংজ্ঞা নির্ধারণের সাফল্যও এসেছে মেকলের নীতি ও দর্শনের পথ ধরে। তার দেশী সাহেবরা আধুনিকতার পাঠ নিতে গিয়ে ভালোমত আয়ত্ত করেছে আজকের দিনে ধর্মের কিংবা ইসলামের কোন কার্যকারিতা নেই। আধুনিক হতে হলে সব রকমের ইতিহাস ও ইসলামের সাথে যোগ ছিন্ন করে পশ্চিমের নীতি, দর্শন ও সভ্যতার আধিপত্য কবুল করে নিতে হবে।

একদিকে আমাদের আধুনিকতাবাদী রাজনীতিবিদ, অন্যদিকে প্রগতিশীল শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা দেশী সাহেব হতে গিয়ে নিজের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি যেমন ছুঁড়ে ফেলেছেন, তেমনি ইসলামের বিরুদ্ধে এরা পশ্চিমেরই এক একজন বরকন্দাজ সেজে আদাজল খেয়ে লেগেছেন। এদের চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ কোনভাবেই আজ ইসলাম কেন্দ্রিক নয়, এমনকি মুসলিম সমাজের মূল্যায়নেও তারা ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রথা-পদ্ধতিকে বিবেচনায় নিতে প্রস্তুত নয়।

এশিয়ার মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এ রকম কয়েকজন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বেশ নাম করেছেন। এদের একদিকে আছেন হামজা আলভী, একবাল আহমদ, তারিক আলী, সালমান রুশদী, ফুয়াদ আজামী অন্যদিকে শহীদ বার্কি ও রানা কাব্বানী। কারণে-অকারণে পশ্চিমের মিডিয়া এদের গুরুত্ব দেয়, এদের ইমেজ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পশ্চিমের নীতি নির্ধারকরা এদেরকে মুসলিম দুনিয়ার মুখপত্র হিসেবে কবুল করে, কারণ জানে এরা তাদেরই খয়ের খাঁ। পশ্চিমে আশ্রিত এইসব cultural Mutant-দের (সাংস্কৃতিকভাবে পরিবর্তিত) বাংলাদেশী বিকল্প দু'একজনের নাম বলতে পারি ঃ আহমদ শরীফ, তসলিমা নাসরীন, হুমায়ুন আজাদ। ইসলামকে পুরোপুরি খারিজ করেননি, কিন্তু রাষ্ট্র ও গণজীবন থেকে বিশ্লিষ্ট করে ইসলামকে

www.pathagar.com

নখদন্তবিহীন নপুংশক একটি ব্যবস্থা হিসেবে কামনা করেছেন আমাদের অনেক গুণী বুদ্ধিজীবীরা। গত শতকের ত্রিশের দশকে ঢাকার শিখা গোষ্ঠীর লেখক, বুদ্ধিজীবী কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখ ও তাদের অনুবর্তীরা এ ধারার চিন্তা-ভাবনা পরম যত্নে লালন করেছেন।

অনেক ক্ষেত্রেই এরা নামকাওয়াস্তে মুসলমান, ইসলাম সম্পর্কে এদের ধারণা অপ্রতুল। ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু ধারণা তাদের আছে তা তারা পশ্চিমের মিডিয়া ও সাহেব লেখকদের কাছ থেকেই পেয়েছেন। পশ্চিমের ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা লালন করাই হচ্ছে তাদের একমাত্র কাজ। অনেক সময় এটিও স্পষ্ট নয় তারা ইসলাম আদৌ ত্যাগ করেছেন কিনা। ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য তাদেরকে ব্যবহার করছে অথচ তারা নিশ্চিত নন ব্যবহার শেষে তাদের কদর একই রকম থাকবে কি না? একটা উদাহরণ দেই। সিরিয়ার প্রখ্যাত প্রগতিশীল মুসলিম লেখিকা রানা কাব্বানী পাশ্চাত্যে বসে একসময় ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক লেখালেখি করে বিখ্যাত হয়ে যান। পাশ্চাত্য মিডিয়া তাকে লুফে নেয়। তিনি হয়ে যান রীতিমত সেলিব্রেটি। অবস্থা এমন হয়ে যায় যে তার বই Europe's Myths of the Orient-এর কভার পেজে সালমান রুশদী ১৯৮৬ তে তার প্রশংসামূলক পরিচয় লিখে দেন। ১৯৮৯-৯০ তে যখন রুশদীর সাটানিক ভার্সেস নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ চলছে তখন কাব্বানীর হুশ হয়। ইসলামের নেতিবাচক চরিত্রায়নে রুশদীর অভিসন্ধিমূলক কাজের তিনি প্রতিবাদ করেন। আর যায় কোথায়। পশ্চিমা মিডিয়া তাকে ছেকে ধরে। যেন মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো অবস্থা। কাব্বানীর কেম্ব্রিজের শিক্ষা, মধ্যপ্রাচ্যের অভিজাত পারিবারিক সম্পর্ক কোন কিছুই কাজে লাগে না। তাকে মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বলে গাল দেয়া হয়। তার পুরনো বন্ধুরা তার এই নতুন ভূমিকায় ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে। কাব্বানী পুরোপুরি একঘরে হয়ে পড়েন। তাকে ক্লাব ছাড়তে হয়, বার ত্যাগ করতে হয়। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ You were either with us or damned for ever. এর সাথে আজকের প্রেসিডেন্ট বুশের দম্ভোক্তির কথা স্মরণ করুন। এই হচ্ছে আধুনিকতাবাদী পাশ্চাত্যের বিচার বিবেচনার নমুনা।

৩

মেকলে যে নাটকের শুরু করে গিয়েছিলেন এখন মনে হচ্ছে এইসব আধুনিকতাবাদী সাহিত্যসেবী ও বুদ্ধিজীবীরা সেই নাটকের শেষ দৃশ্যের পাত্র-পাত্রী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আছেন পুরনো মার্ক্সবাদী ও সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনায় উজ্জীবিত। যদিও এদের ব্যক্তিগত জীবনাচার, পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা সমাজতন্ত্রী চিন্তা-ভাবনার সাথে ঠিক কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিবেচনা

www.pathagar.com

সাপেক্ষ। বিলাতে অবস্থানকারী পাকিস্তানী লেখক শাব্বির আখতার এদের বলেছেন Champagne Socialists. সালমান রুশদীর মতো বামপন্থী হানিফ কোরেশী, তারিক আলী প্রমুখ পশ্চিমে বসে কিছু পরিচিতি পেয়েছেন তাদের ইসলাম বিদ্বেষের সুবাদে। যদিও মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে।

কিছুদিন আগে পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত তারিক আলী বিলাতে বসে Iranian Nights নামে একটা নাটক লেখেন। এ নাটকে ইসলামের চরিত্রায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত কদর্যতার সাথে। ইসলামকে যতো ভয়ানক ও নেতিবাচকভাবে সম্ভব এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। উন্মাদ মোল্লাহ, মাদক চোরাচালানী ও ব্যবসা, নানা রকম যৌন অনাচার প্রভৃতির সাথে ইসলামকে এখানে সুনির্দিষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সালমান রুশদী ও তার বন্ধু-বান্ধব এ নাটকটির প্রচারণার জন্য বেশ কিছু প্রোগ্রাম করেন, যদিও তা ফ্লপ করে। এবার বিলাতের মুসলমানরাও সতর্ক হন। তারা এবার রুশদীর সাটানিক ভার্সেস-এর মতো এ নাটকটির কপি রাস্তায় এনে পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাননি। তারিক আলীর বরাত খারাপ, ফলে মিডিয়ার নজর যথাযথভাবে তিনি কাড়তে পারেননি। তার রুশদী হওয়ার স্বপ্নও পুরোপুরি সফল হয়নি। বোধহয় মুসলমানরা অতীত থেকে কিছু কিছু শিক্ষা নিচ্ছেন। বিলাতের তারিক আলী এবং আমাদের এই ঢাকার হুমায়ুন আজাদদের লেখালেখি, চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাসে চেতনাগত কোন তফাৎ নেই। তারিক আলীর Iranian Nights এবং আজাদের পাক সারজমীন শাদবাদের মূল সুর একই। এদের সকলের সাধারণ প্রতিপক্ষ হচ্ছে ইসলাম এবং এটির বিরুদ্ধে লড়াই জারী রেখে সাম্রাজ্যবাদের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠাই হচ্ছে এদের একমাত্র কাজ। সাহিত্য ও শিল্পগত বিচারে এদের লেখালেখির মূল্য যৎসামান্যও নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মিডিয়ার কাছে এদের কদর বড় বেশি। মিডিয়ার জোরেই এরা সেলিব্রেটি।

সত্যিকার অর্থে মুসলিম দেশগুলোতে মার্ক্সবাদ ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ ইসলামের নিজের ভেতরেই সমাজ বিপ্লব ঘটানোর মতো যোগ্যতা, সামর্থ্য ও উপকরণ রয়েছে। নাসেরের প্যান-আরব সমাজতন্ত্র, গাদ্দাফীর গ্রীন রেভ্যুলেশন-গ্রীন বুক ধরনের সমাজতন্ত্র, ইরাক ও সিরিয়ার বাথ পার্টি ধাচের সমাজতন্ত্র, আমাদের দেশের বাকশাল মার্কা সমাজতন্ত্র, এর প্রত্যেকটির পরীক্ষা-নীরিক্ষার পরিণতি আমাদের চোখের সামনে আছে। এরপরেও মুসলিম সমাজে পশ্চিমাভাবাপন্ন কিছু মার্ক্সবাদী আছেন যাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো যৌনতার স্বাধীনতা, শরাব পানের স্বাধীনতা এবং সুবিধাবাদিতার নগ্ন প্রতিযোগিতা। প্রকৃত বিচারে মার্ক্সবাদী আদর্শের প্রতি এক ধরনের বুড়ো আঙ্গুল তারা দেখিয়ে চলেছেন। যৌবনের সমাজতন্ত্রী আবেগ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে

www.pathagar.com

এলে এরাই দ্রুত পারিবারিক বৃত্তে প্রবেশ করেন এবং নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, জমিদারী দেখাশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের অধীনে কর্মরত শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ ভুলেও তাদের মার্ক্সবাদী অতীত নিয়ে সন্দেহ করতে পারে না।

আসলে মার্ক্স নিজে দরিদ্রের প্রতি যে আবেগ দেখিয়েছেন তাও কিন্তু বর্ণবাদী ভেদরেখা অতিক্রম করতে পারেনি। তার এই আবেগ কিন্তু শ্বেতাঙ্গ দরিদ্রদের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল। এশিয়ানদের সম্পর্কে তার মতামত রীতিমত বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত এবং সমাজতাত্ত্বিকভাবেও সেই বিবেচনা নির্ভুল নয়। তার বন্ধু এঙ্গেলসের মতোই অবচেতনভাবে তিনিও ছিলেন বর্ণবাদী। এশিয়ার মার্ক্সবাদীরা এই সত্যকে ধামাচাপা দিতে চান, এটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার বড় নমুনা।

কমিউনিজমের পতনের পর মার্ক্সবাদী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যসেবীরা কিছুটা হকচকিত হয়ে পড়লেও এদের দুর্বীনিত বিশ্বাস ও আচরণে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি। অনেকেই তাদের কেবলাহ্ পরিবর্তন করেছেন এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের দেয়া সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিতে দ্রুত তাদের দলে ভিড়ে গেছেন। কিন্তু এদের পুরনো মজ্জাগত ইসলাম বিদ্বেষে এতটুকুও ভাটা পড়েনি।

৪

মেকলের নীতি যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক চৈতন্যকে দুষিত করেছে তেমনি আমাদের জাতিক চেতনাকেও উন্মূল ও সংশয়ী করে দিয়েছে। আমাদের এখানে বহুদিন হলো আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি আমরা মুসলমান না বাঙালি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো আরব দুনিয়া জুড়ে এক অবিমৃষ্যকারী ও আত্মবিনাশী চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে তারা মুসলমান না আরব। একই রকম ঘটনা আমরা তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের উত্থানের পর লক্ষ্য করেছি মুসলমান ও ইউরোপিয়ান হওয়ার টানা পোড়েনের মধ্যে। রেজা শাহ্ পাহলভীতো সোজাসুজি বলতেন তিনি হচ্ছেন আর্য।

জাতিকতা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলিম সমাজে এই দ্বিধা, সংশয় ও সন্দেহের জন্ম কলোনির কালে। কলোনির প্রভুদের শিক্ষা ও দর্শন আমাদের চিন্তা ও মনন বহুখণ্ডে এমনভাবে খণ্ডিত করে ফেলেছে যে আমাদের আধুনিকতাবাদীরা আর ইসলাম কিংবা মুসলিম পরিচয়ে নিজেদের উন্মোচন করতে চান না। এদের অনেকেরই ধারণা এই যে আমরা ইসলাম ধর্মটা গ্রহণ করেছি এটা একটা বাইরের প্রয়োজনে। এই প্রয়োজন থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আমাদের মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত হবে। কেউ কেউ আর একটু বাড়িয়ে বলতে চান আমরা যে ইসলাম ধর্ম পেয়েছি তা অনেকটাই লৌকিক ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব। এর বাইরে গভীরতর কোন ধর্ম জিজ্ঞাসায় আমাদের পৌঁছুনো দরকার। আধুনিকতাবাদীদের এইসব

www.pathagar.com

তাত্ত্বিক মারপ্যাচ ও জটিলতা সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্য একটাই ঃ ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন উৎসের কাছে আমাদের আদর্শিক প্রেরণার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া।

আমাদের এখানে কোন কোন সংস্কৃতিসেবী আছেন যারা তারস্বরে বলে বেড়ান আমাদের বিপদে, শংকায়, অস্বস্তিতে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন পরম আশ্রয়। কেউ কেউ তো এমন কথাও বলেন রবীন্দ্র সংগীত শ্রবণ হচ্ছে ইবাদতের মতো। একটা অদ্ভুত বিস্ময় কাজ করে যখন দেখি আমাদের হীনমন্যতা কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একজন মুসলমানের বিপদের আশ্রয় কি রবীন্দ্রনাথ হতে পারেন? এ তার মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী। এই অপচার, অপবিশ্বাস, অপসংস্কৃতি লালন করে কেউ মুসলমান থাকতে পারেন না। অথচ সে কাজটিই এখন আমাদের করতে বলা হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির নামে।

এ দেশে যারা বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিকতার দাবি নিয়ে সোচ্চার তারা এ দেশের ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার নিয়ে মাথা ঘামান না। ইসলামের বাইরের অন্যকোন অতীত, অন্যকোন উত্তরাধিকার নিয়ে তারা অতিশয় ব্যস্ত। এদের ঝোঁক এমন এক বাংলাদেশের দিকে যেখানে ইসলামী মন মানস, সংস্কৃতি, জীবন ভাবনা ও উত্তরাধিকার অনুপস্থিত। ইসলামের কথা শুনলেই এরা উত্তেজিত হন। এই সব 'হারিকিরি' করতে উদ্যত বুদ্ধিজীবীরা আমাদের জাতিকতার ধারণাকে ইতোমধ্যে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছেন এবং আমাদের জনগণকে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। মেকলের বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই।

আমাদের এখানকার বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মতো এক সময় পুরো মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে পল্লবিত হয় আরব জাতীয়তাবাদের ধারণা। এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে একদিকে আরবী ভাষা, অন্যদিকে আরবী মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার এক অন্ধ বিশ্বাস। এইসব ধর্মনিরপেক্ষ আরব জাতিকতার অনুসারীরা ইমরুল কায়েসের কথা বলেন, ইসলাম পূর্ব পৌত্তলিক আরবের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার নিয়ে গৌরববোধ করেন। ইমরুল কায়েস প্রতিভাবান কবি ছিলেন। কিন্তু তার কবিতা পৌত্তলিকতা ও অশ্লীলতার দায়মুক্ত নয়। এই কারণে তা ইসলাম অনুমোদন করতে পারে না।

আরব জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন ইসলাম হচ্ছে আরবী মননশীলতার আবিষ্কার। অদ্ভুত যুক্তি বটে। এ কথা মানতে হলে তো এই যে আমরা যুগ যুগ ধরে ইসলামকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মান্য করে আসছি তার ব্যতিক্রম ঘটাতে হবে।

মনে রাখা দরকার এক সময় ইসলামের কারণেই আরবরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল, পরিণতিতে তারা একটি শক্তিশালী সভ্যতারও জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু আরবরা যখন ইসলাম ছেড়েছে তখন থেকে দুর্গতি-দুর্দশা তাদের উপর ভর

www.pathagar.com

করেছে। আরব জাতীয়তাবাদ ঐক্যের কথা বললেও কার্যত এটি আরবদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। এটি পরিণত হয়েছে সিরিয়, মিসরীয়, লিবিয় প্রভৃতি নানা রকম জাতীয়তাবাদে। নীতি, আদর্শ, চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়েও তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। পরস্পরের দিকে মুখিয়ে থাকাই যেন এখন তাদের কাজ।

মুসলিম সমাজের ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। এই আদর্শগত ঐক্যের পরিবর্তে নানারকম জাতীয়তাবাদ, স্থানিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনা, পশ্চিমী মূল্যবোধ আজকাল এর স্থান দখল করেছে। ফলে যে সংহতি চেতনা একদিন মুসলিম সমাজকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতো তা কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর এই দুর্বলতর পটভূমিতে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোর উপর সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণও বাড়ছে। এর ফলে তাবৎ পৃথিবী জুড়ে মুসলিম সমাজগুলোর মধ্যে বিরাজ করছে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা, এর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চলছে চরম বিকৃতি আর অর্থনৈতিক জীবনে সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থা। চিন্তা ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের দেউলিয়াপনা উৎকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো ইসলামকে ভিত্তি করে মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি মনোজাগতিক বুনিয়াদকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের নানা বাঁকে একটি সমাজের মধ্যে আদর্শিক বিচ্যুতির কারণে এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে নানা রকম ক্ষয় ও পতন আসতে পারে। সেই পতনের বিরুদ্ধে অন্যের কাছ থেকে ধার করা আদর্শে নয়, নিজের আদর্শের মৌলিকত্বের দাবিতে নতুন করে সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই নতুন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছে মুসলমানদের উপর।

তারা কি এই মহান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন?

www.pathagar.com